জগদীশচন্দ্র বসু



কিশোর রচনা সমগ্র



জগদীশচন্দ্র বসু

কিশোর রচনা সমগ্র

সংকলন ও সম্পাদনা

দিবাকর সেন

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রকাশক : রবীন বল
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : অলোক শঙ্কর মৈত্র

নতুন মুদ্রণ
1989

মূল্য : ৩০.

জগদীশ চন্দ্র বসু ১নং অছি পরিষদের পক্ষে
অধ্যাপক দেববত বসু
ও অধ্যাপক সুনন্দ বসুর
সৌজন্যে প্রকাশিত

আচার্যভবনের সৌজন্যে প্রাপ্ত
আলোকচিত্রগুলি তুলেছেন
কল্যাণ চক্রবর্তী

মুদ্রাকর :
মনোরঞ্জন পান
নিউ জয়কালী প্রেস
৮/এ, দীনবন্ধু লেন
কলিকাতা-৬

BOSE INSTITUTE

Director
S. C. Bhattacharyya
Ph. D (Dacca & Cantab).
Sc. D (Cantab).
F. N. A., F. A. Sc.

Gram : Bostute ;
Telex No. : 021-2469
Phone : 35-2402/3 ;
Director : 35-7073
93/1 Acharya Prafulla Chandra Road
Calcutta-700 009

আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুকে ভারতে বিজ্ঞানচর্চার জনক বলে সকলেই স্বীকার করেন। তাঁর সাহিত্য কীর্তিও কিন্তু অসাধারণ। অনবদ্য প্রবন্ধকার হিসেবে তিনি ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর সমগোত্রীয়। তাঁর বহু প্রবন্ধ বিজ্ঞানভিত্তিক। গভীরে প্রবেশ করলে বিজ্ঞান, দর্শন ও কবিতার মতো সুন্দর হয়ে ওঠে। জগদীশ চন্দ্র বসু প্রবন্ধকার হিসেবে সেই পর্যায়ে পেঁছিলেন। তাঁর কিছু পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু আরও বহু প্রবন্ধ নানা পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। সেগুলির খবর আমরা অনেকেই জানি না। তারই কিছু শ্রী দিবাকর সেন "জগদীশ চন্দ্র বসু'র কিশোর রচনা সমগ্র" নামে সম্পাদনা করেছেন। এই সংগ্রহের জন্য তাঁকে বহু পরিশ্রম করতে হয়েছে। যাঁরা বাংলা ভাষাকে ভালবাসেন তাঁরা সকলেই শ্রী দিবাকর সেনকে ধন্যবাদ জানাবেন। রচনাগুলি বিশেষ করে কিশোরদের জন্য। কিন্তু পড়ে বয়স্করাও সমান আনন্দ পাবেন। প্রবন্ধগুলি সব দিক থেকেই অপূর্ব ও অনবদ্য। যিনি প্রথাগতভাবে অসাধারণ বিজ্ঞানী ছিলেন তাঁর সাহিত্য প্রতিভাও যে এমন অনন্য সাধারণ ছিল তা ভাবলেও আশ্চর্য বোধ হয়। ভাষার ঔজ্জ্বল্যে, ভাবের গভীরতায় এবং প্রকাশভঙ্গীর সৌন্দর্যে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু বাংলাসাহিত্যে একটি স্থায়ী আসন দখল করে নিয়েছেন। এরকম একটি রচনা সংগ্রহ বহু আগেই প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। জগদীশ চন্দ্রের দ্বারা লিখিত সমস্ত প্রবন্ধই পুস্তকাকারে প্রকাশ হওয়া উচিত। বাঙালীরা সেই কাজটি এখনও প্রকাশ করেন নি। করলে এটি আমাদের জাতীয় সম্পদ হয়ে থাকবে। শ্রী দিবাকর সেনকে ধন্যবাদ যে তিনি এই কাজটি শুরু করেছেন।

শশাঙ্ক চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
অধিকর্তা, বসুবিজ্ঞান মন্দির

আচার্য ভবন, ৯৩ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড

আধুনিক ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণার জনক আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর কাছে জীবনের প্রধান ধর্মই ছিল কর্ম। আমাদের দেশের আজকের বিজ্ঞান গবেষণা ও বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষা সবই আচার্য জগদীশ চন্দ্রের আশ্চর্য সংগ্রামের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফলশ্রুতি। যদিও জগদীশ চন্দ্র বলতেন, ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত করা তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য নয়। এদেশে বিজ্ঞানের পুনর্জাগরণই তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য। কারণ তাঁর গবেষণার একটি মূল উৎস ছিল স্বদেশের বৈজ্ঞানিক ভাবধারা— যে ভাবধারা ভারতীয় বিজ্ঞান চরক, শুশ্রুত এবং আর্যভট্টের জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত, যে বিজ্ঞান প্রথম পথ দেখিয়েছিল বিজ্ঞানের ব্যবহারিক কার্যক্ষমতাকে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র একসময়ে বলেছিলেন, প্রাচীন ভারতবর্ষের বিজ্ঞানচর্চার অগ্রগতি বহুযুগ আগেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কারণ এদেশে তখন যাঁরা লেখাপড়া শিখতেন তাঁরা কখনোই হাতে কলমে কোনো কাজ করতেন না। আর যাঁরা হাতের কাজ করতেন তাঁরা লেখাপড়া জানতেন না। ফলে উভয়ের যথার্থ সমন্বয়ের অভাবে ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চা ক্রমশ লুপ্ত হয়েছিল। জগদীশ চন্দ্র ছিলেন একাধারে বিজ্ঞানী ও যন্ত্রবিদ। তিনিই প্রথম যিনি আধুনিক ভারতবর্ষে দু'য়ের সমন্বয় সাধন করেছিলেন।

বহুকাল আগে লায়েল প্রমাণ করেছিলেন পৃথিবীর ক্রমবিকাশ। কেণ্ট ও ল্যাপলাস প্রমাণ করেন জ্যোতিষ্কমণ্ডলের ক্রমবিকাশ। ডারউইন আবিষ্কার করে-ছিলেন প্রাণীজগতের বিবর্তন। জগদীশ চন্দ্র একাধারে আবিষ্কার করেন আধুনিক "মাইক্রোওয়েভ" ও সেই সংক্রান্ত গবেষণার আশ্চর্য চাবিকাঠি। অন্যদিকে প্রমাণ করেন জড়বস্তু থেকে জীবনের বিবর্তন। আর এইসব গবেষণায় জগদীশ চন্দ্র বিশ্বে অগ্রণী হয়ে আছেন।

জগদীশ চন্দ্রের পিতা ভগবানচন্দ্র বসুর শিশুশিক্ষার ব্যাপারে নিজস্ব একটি দৃঢ় মতবাদ ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে প্রত্যেকটি শিশুর

পরিচয় প্রয়োজন ও মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা শুরু করা দরকার। তাই তিনি জগদীশ চন্দ্রকে গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি করে দিয়েছিলেন। এখানে জগদীশ চন্দ্রের সহপাঠীদের অধিকাংশই ছিল গ্রামের চাষী ও জেলের সন্তান। এ প্রসঙ্গে পরবর্তি-কালে জগদীশ চন্দ্র বলেছিলেন, "....তথায় আমি মাতৃভাষায় শিক্ষা করিয়াছিলাম, নিজে চিন্তা করিতে শিখিয়াছিলাম।..."

এ বিষয়ে অন্যত্র তিনি বলেছিলেন, "...তাহাদের (সহপাঠীদের) নিকট আমি পশুপক্ষী ও জলজন্তুর জীবনবৃত্তান্ত স্তব্ধ হইয়া শুনিতাম। সম্ভবতঃ প্রকৃতির কার্য অনুসন্ধানে অনুরাগ এইসব ঘটনা হইতেই আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল।..."

মনে হয় এসবেরই ফলশ্রুতিতে জগদীশ চন্দ্র বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর এই বহুমুখী প্রতিভার মধ্যে সাহিত্য-রচনার প্রতিভাও বিশেষ স্থান দাবী করে। যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁরই অনুপ্রেরণায় সেকালে শিশুদের জন্য "মুকুল" নামে সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি নিজে শিশু ও কিশোর পাঠ্য বহু প্রবন্ধ, ভ্রমণ-কাহিনী ও গল্প রচনা করেন। তাঁর এই সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাব কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না। তাঁর পরিবারের অনেকেই সাহিত্যপিপাসু ছিলেন। জগদীশ চন্দ্রের ভগ্নীরা প্রায় সবাই "মুকুল" পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিশেষ করে ভগ্নী লাবণ্যপ্রভা বসু নিয়মিত কিশোর পাঠ্য প্রবন্ধ লিখতেন।

বর্তমান সংকলনটি জগদীশ চন্দ্রের নানা স্বাদের সাহিত্য রচনার একটি কিশোর পাঠ্য গ্রন্থ। আশাকরি সংকলনটি বাংলা কিশোর সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন হয়ে থাকবে এবং এই গ্রন্থের মাধ্যমে কিশোররা সাবলীল ও সরল মানসিকতার প্রেরণা লাভ করবে।

দেবব্রত বসু
সুনন্দ বসু

সম্পাদকের কথা

আধুনিক ভারতের বিজ্ঞানচর্চার প্রাণপুরুষ আচার্য জগদীশ চন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভার একটি অন্যতম প্রতিভা তাঁর সাহিত্যে রচনা। তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে ইংরেজী ভাষায় লিখিত প্রবন্ধের সংখ্যাই বেশি। বাংলা রচনা অপেক্ষাকৃত কম। জগদীশ চন্দ্রের বাংলা প্রবন্ধ ও গল্পগুলির অধিকাংশই প্রকাশিত হয়েছিল, প্রবাসী, মুকুল, সঞ্জীবনী, দাসী, মোসলেম ভারত সাহিত্য, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায়। তাঁর বাংলা রচনাগুলির মধ্যে বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্রের সৌন্দর্যপূজারী শিল্পীমনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর অধিকাংশ রচনাতেই বিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শনের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। রচনাগুলিতে জগদীশ চন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি ও বাংলাসাহিত্যের প্রতি গভীর মমত্ববোধও পরিস্ফুট। সুন্দর প্রকাশভঙ্গীর মাধ্যমে বিজ্ঞানের কঠিন বিষয়বস্তুও জগদীশচন্দ্রের রচনায় প্রাঞ্জল ও সাহিত্যগুণান্বিত হয়ে উঠেছে।

আচার্য জগদীশচন্দ্রের প্রথম বাংলা রচনা কোনটি এ সম্পর্কে হদিস দিতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "আমার যতদূর মনে পড়ে তিনি ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় একটি বাঙলা প্রবন্ধ লেখেন।......" পরবর্তিকালে উক্ত প্রবন্ধটির আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে কেউ আলোকপাত করলে কৃতজ্ঞ থাকব।

আচার্য জগদীশ চন্দ্রের প্রথম বাংলা গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৩২৮ সালে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধগুলি থেকে কুড়িটি প্রবন্ধের একটি সঙ্কলন 'অব্যক্ত' নামে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির মুখবন্ধে জগদীশ চন্দ্র লিখেছেন, "ভিতরে ও বাহিরের উত্তেজনায়, জীব কখনও কলরব কখনও আর্তনাদ করিয়া থাকে। মানুষ মাতৃক্রোড়ে যে ভাষা শিক্ষা করে সে ভাষাতেই সে আপনার সুখদুঃখ জ্ঞাপন করে। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমার বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তাহার পর বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ও জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, এবং সেই উপলক্ষে বিবিধ মামলা মোকদ্দমায় জড়িত হইয়াছি। এ বিষয়ের আদালত বিদেশে, যেখানে বাদ-প্রতিবাদ কেবল ইংয়োরোপীয় ভাষাতেই গৃহীত হইয়া থাকে। এদেশেও প্রিভি-কাউন্সিলের রায় না পাওয়া পর্যন্ত কোনো মোকদ্দমায় চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় না।

জাতীয় জীবনের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অপমান আর কি হইতে পারে? ইহার

প্রতিকারে জন্য এদেশে বৈজ্ঞানিক আদালত স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছি। ফল কি হয় এ জীবনে দেখিব না ; প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান মন্দিরের ভবিষ্যৎ বিধাতার হস্তে।

বন্ধুবর্গের অনুরোধে বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিলাম। চতুর্দিক ব্যাপিয়া যে অব্যক্ত জীবন প্রসারিত তাহার দু'একটি কাহিনী বর্ণিত হইল।"......

'অব্যক্ত' গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পরেই জগদীশ চন্দ্র অন্তরঙ্গ সুহৃদ রবীন্দ্রনাথকে গ্রন্থটি পাঠিয়ে লিখেছিলেন (৩রা অগ্রহায়ণ ১৩২৮), 'সুখে-দুঃখে কত বৎসরের স্মৃতি তোমার সহিত জড়িত। অনেক সময় সে সব কথা মনে পড়ে। আজ জোনাকির আলো রবির প্রখর আলোর নিকট পাঠাইলাম।' উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'তোমার 'অব্যক্ত'র অনেক লেখাই আমার পূর্ব-পরিচিত এবং এগুলি পড়িয়া বারবার ভাবিয়াছি যে যদিও বিজ্ঞানবাণীকেই তুমি সুয়োরানী করিয়াছ তবু সাহিত্য সরস্বতী যে পদের দাবী করিতে পারিত, কেবল তোমার অসাবধানেই সে অনাদৃত হইয়া আছে।'

আচার্য জগদীশ চন্দ্রের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'প্রবন্ধাবলী'। প্রকাশিত হয় ১৩৪০ সালে। এটি প্রকাশ করেন শকুন্তলা শাস্ত্রী। গ্রন্থটির আখ্যাপত্রে যুগ্মরচয়িতা নাম রয়েছে—বিজ্ঞানাচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু ও লেডী বসু।

এই সঙ্কলনের অনেক লেখাই শ্রীমতী অবলা বসুর নামে প্রকাশিত হলেও, আচার্যভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপির সূত্রে প্রতীয়মান হয় যে, অবলা বসুর নামে প্রকাশিত অনেক রচনাই আচার্য জগদীশ চন্দ্র পরিমার্জনা করেছিলেন, এবং প্রয়োজনে পুনর্মিলন করেছিলেন।

প্রবন্ধাবলী ও সঙ্কলিত দশটি প্রবন্ধের উপজীব্য বিষয় ভ্রমণকাহিনীকে ঘিরে। বাকিগুলি নানা স্বাদের রচনা। 'প্রবন্ধাবলী' গ্রন্থটি এখন দুষ্প্রাপ্য।

প্রবন্ধাবলীতে সঙ্কলিত অধিকাংশ রচনাই প্রকাশিত হয়েছিল 'মুকুল'পত্রিকায়। আচার্য জগদীশ চন্দ্রের ছোটদের লেখার সূত্রপাতও সম্ভবত ঘটেছিল এই 'মুকুল' পত্রিকাতে। এই মুকুল পত্রিকার অন্যতমা সংগঠক ও উৎসাহী লেখিকা ছিলেন জগদীশ চন্দ্রের ভগিণী লাবণ্যপ্রভা বসু। মুকুল পত্রিকার উন্নতিকল্পে লাবণ্যপ্রভা যে, কি পরিমাণ উৎসাহী ছিলেন, অবলা বসুকে

লেখা তাঁর একটি চিঠি থেকেই সহজে তা ধারণা করা যেতে পারে। সম্প্রতি, অপ্রকাশিত এই চিঠিটির সন্ধান পাওয়া গেছে—অধ্যাপক দেবব্রত বসু ও সুনন্দ বসুর সৌজন্যে। ১৮৯৬ সালের ২৫শে নভেম্বর লাবণ্যপ্রভা বসু লিখেছেন, 'তুমি নানাস্থান দেখিতেছ ও নানা লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়া উপকার পাইতেছ শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। আশাকরি তোমার এই সকল অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই কাজে লাগাইতে পারিবে। মুকুলের জন্য তুমি প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাও না কেন? আশা করি তুমি এবার কিছু পাঠাইবে।'

সেকালের সেরা শিশু পত্রিকা 'মুকুল'-এর সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। সহকারী সম্পাদকরূপে কাজ করেছেন শিশু সাহিত্য রচনার অন্যতম পথিকৃৎ যোগীন্দ্রনাথ সরকার। মুকুলের উন্নতি কল্পে আরও অনেক লেখক লেখিকাই সে আমলে সমবেত হয়েছিলেন। তবে পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ ও উন্নতির জন্য ভগিনী লাবণ্যপ্রভার মতোই বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্রের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি শুধু নিজে লিখেই ক্ষান্ত হন নি, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখ লেখকেরা প্রধানত তাঁরই উৎসাহে মুকুল প্রকাশে এগিয়ে এসেছিলেন। কিশোর সাহিত্যের প্রতি জগদীশ চন্দ্রের গভীর মমতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, '......জগদীশবাবু বালক বালিকাগণের শিক্ষাকার্যে বিশেষ আগ্রহশীল। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও আমি তাঁহারই উৎসাহে শিশুদের জন্য 'মুকুল' নামক মাসিক পত্র প্রকাশের উদ্যোগ করি। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ আছে।......'

'কিশোর রচনা সমগ্র'—গ্রন্থে 'অব্যক্ত' গ্রন্থের কিশোর মনের উপযোগী প্রায় অধিকাংশ রচনাই সঙ্কলিত হয়েছে। 'প্রবন্ধাবলী'র গ্রন্থের সব প্রবন্ধই সঙ্কলিত হয়েছে। এবং সঙ্কলিত হয়েছে আরও অনেক প্রবন্ধ ও বক্তৃতা যা এ যাবৎকাল পর্যন্ত গ্রন্থাকারে আগে প্রকাশিত হয় নি। ১৯৩৫ সালে জগদীশ চন্দ্র সজনীকান্ত দাস ও কেদার নাথ চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটির নাম— জড়জগৎ, উদ্ভিদজগৎ ও প্রাণীজগৎ। রচনাটি কিশোর পাঠ্য হলেও অন্যান্য প্রবন্ধের সঙ্গে বহুলাংশে সাদৃশ্য থাকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

বর্তমান সঙ্কলনে জগদীশ চন্দ্রের রচনাগুলিকে কয়েকটি পর্যায়ে পরিবেশন করা হয়েছে। যেমন, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, বিবিধ প্রসঙ্গ, গল্প, ভ্রমণবিষয়ক রচনা ও বিবিধ রচনা এবং জগদীশ চন্দ্রের নির্বাচিত বক্তৃতাবলী। সঙ্কলনের শেষাংশে যুক্ত হয়েছে পরিশিষ্ট। পরিশিষ্টে জগদীশচন্দ্রের নির্বাসিত পত্রগুচ্ছের সঙ্গে জগদীশ চন্দ্রের কয়েকটি রচনার আদিরূপ সঙ্কলিত হয়েছে। পরিশিষ্টে সংযোজিত কুমুদিনীর 'নিশিজাগরণ' রচনাটি চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের অনুবাদ হলেও সুখপাঠ্য। তাই এটিকে সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত করার লোভ সম্বরণ করতে পারি নি।

এই গ্রন্থ সম্পাদনার কাজে বসু বিজ্ঞানমন্দিরের অধ্যক্ষ, অছি পরিষদের পক্ষে অধ্যাপক দেবব্রত বসু ও অধ্যাপক সুনন্দ বসু নানাভাবে উৎসাহিত ও সাহায্য করেছেন। বসু বিজ্ঞানমন্দিরের গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী ইলা বিশ্বাস ও অন্যান্য সহকর্মীদের কাছে অনেক সাহায্য পেয়েছি।

পুস্তক মুদ্রণের সময় প্রুফ রিডিং ও অন্যান্য টেক্‌নিক্যাল বিষয়ে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছেন পক্ষিবিজ্ঞানী শ্রী অজয় হোম। বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক শ্রী সমরজিৎ করের কাছে কৃতজ্ঞ নানা কারণেই।

আজকের এই বিজ্ঞান প্রগতির যুগে জগদীশচন্দ্রের 'কিশোর রচনা সমগ্র' শুধু আজকের দিনের ছেলেমেয়েদেরই নয়, অনেক বয়স্ক পাঠকের কৌতূহলও নিবৃত্ত করবে। জগদীশ চন্দ্রের মূল রচনার সঙ্গে কিছু কিছু পাদটীকা যোগ করেছি নেহাৎ সম্পাদকীয় কর্তব্য হিসেবেই। মূল রচনার রস স্বাদনের জন্যই কোথাও বা এ পাদটীকা একটু দীর্ঘ হয়েছে।

উপযুক্ত সময়ের ব্যবধানে আচার্য জগদীশ চন্দ্রের সমগ্র বাংলা রচনার সঙ্কলন ও সম্পাদনার ইচ্ছা আছে। বর্তমান সঙ্কলনের ত্রুটি বিচ্যুতির কিছু নির্দেশ পেলে অনিবার্যভাবেই তা পরবর্তী সঙ্কলনের কাজে সহায়ক হবে বলে বিশ্বাস করি।

৯৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

দিবাকর সেন
বসু বিজ্ঞান মন্দির

সূচীপত্র

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ

গল্প

বিবিধ প্রসঙ্গ

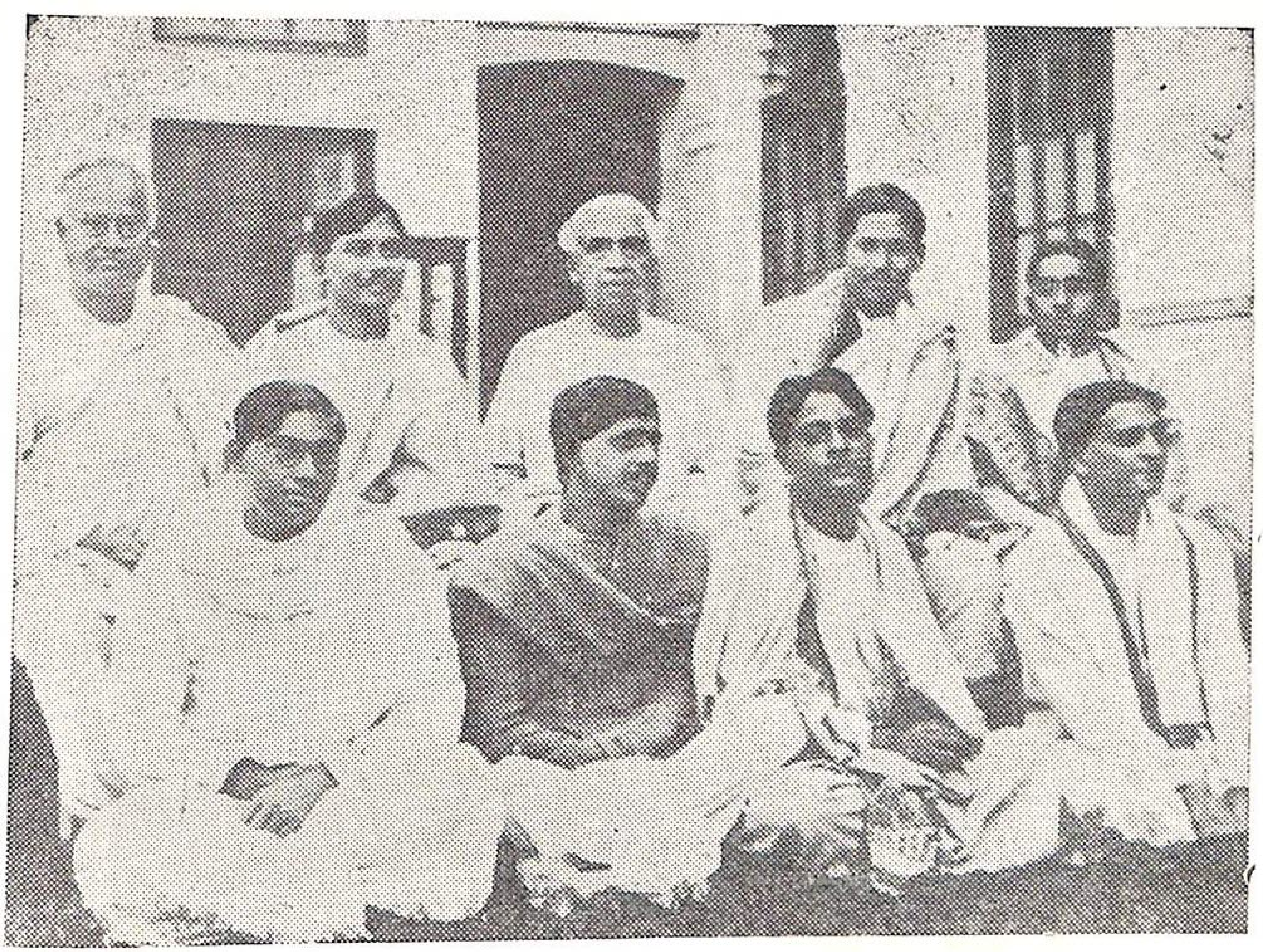
ভ্রমণবিষক রচনা



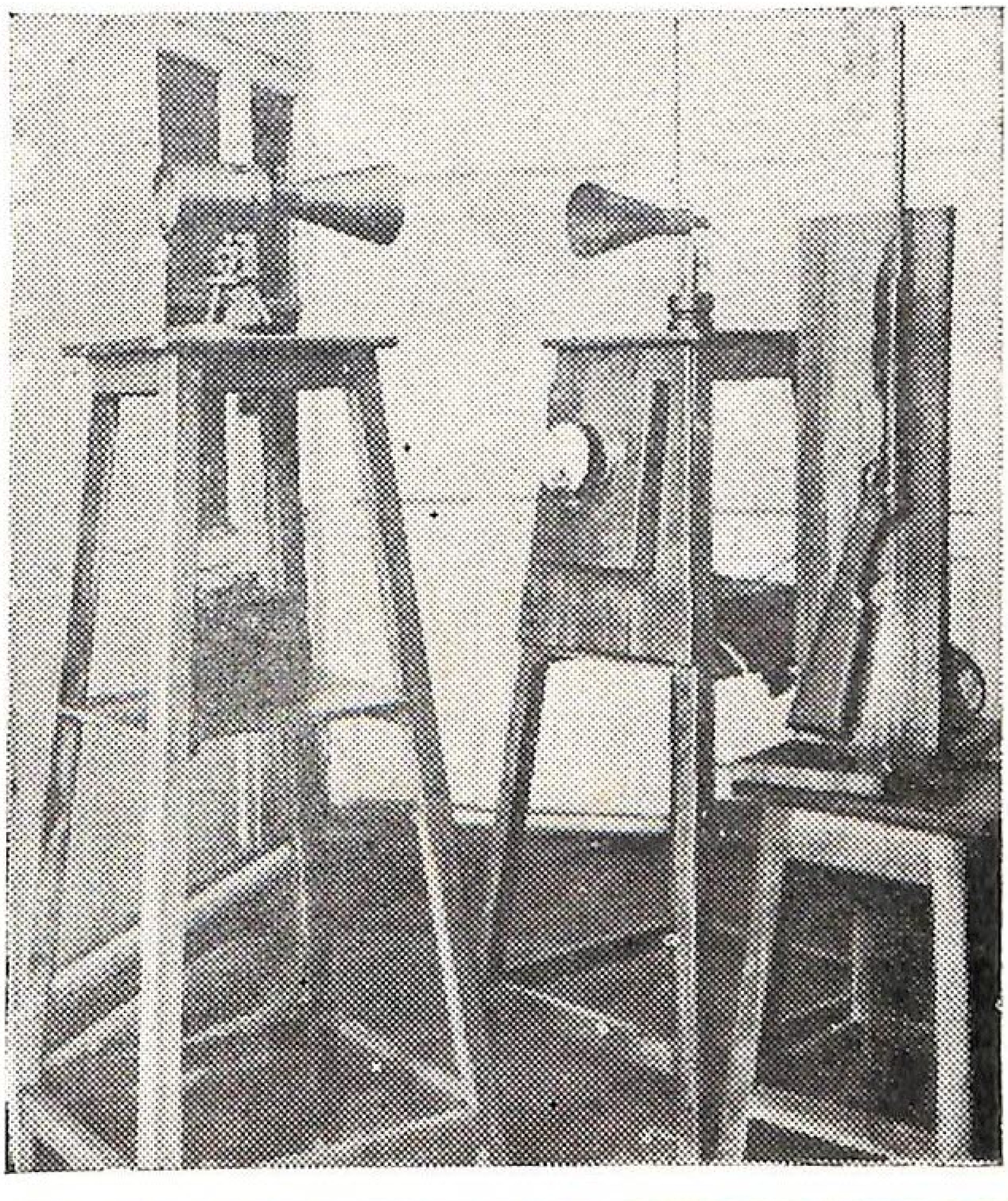
আচার্য জগদীশচন্দ্রের একটি দুর্লভ আলোকচিত্র



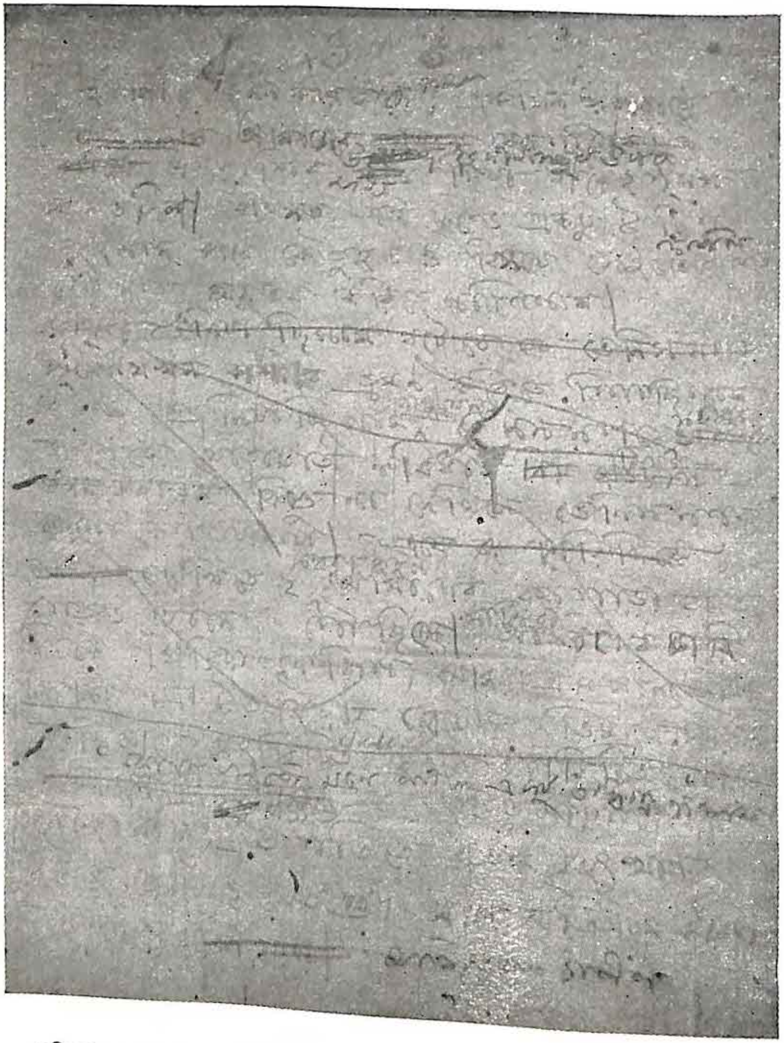
আচার্য জগদীশচন্দ্রের অন্তরঙ্গ সুহৃদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



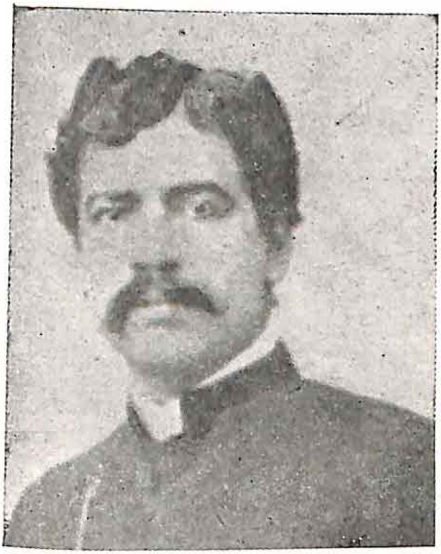
পিছনে বাঁদিক থেকে: এন. সি. নাগ, জে. সি. ঘোষ, আচার্য জগদীশচন্দ্র, মেঘনাদ সাহা ও এস্. দত্ত
সামনে বাঁদিক থেকে: এস. আর. সেন, জে. এন. মুখার্জী, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, দেবেন্দ্রমোহন বসু



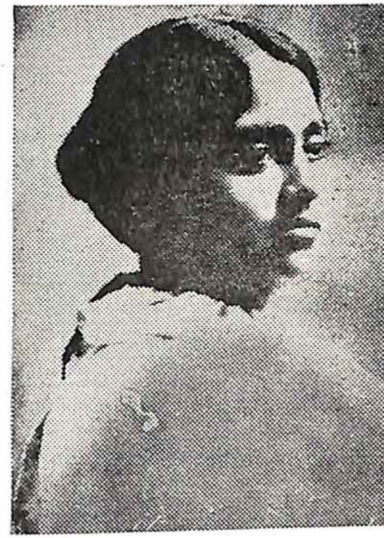
রেডিও ডায়ানামিক্যাল কনট্রোল অ্যাপারেটাস। এই যন্ত্র দিয়ে (মাইক্রোওয়েভের সাহায্যে) জগদীশচন্দ্র বিনা সংযোগে মার্কনির আগে বার্তা প্রেরণ ও গোলা নিক্ষেপ করেছিলেন।



ছবিতে দেখা যাচ্ছে 'ভেনিস' প্রবন্ধটি প্রাথমিকভাবে অবলা বসু রচনা করলেও জগদীশচন্দ্র রচনাটিকে আদ্যোপান্ত সংশোধন ও পরিমার্জনা করেছেন।



আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

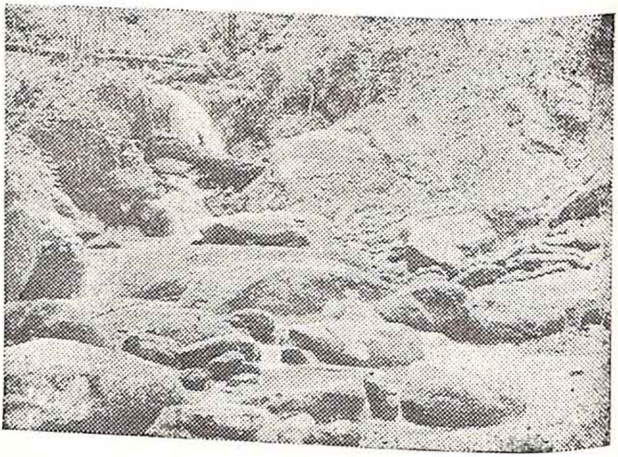


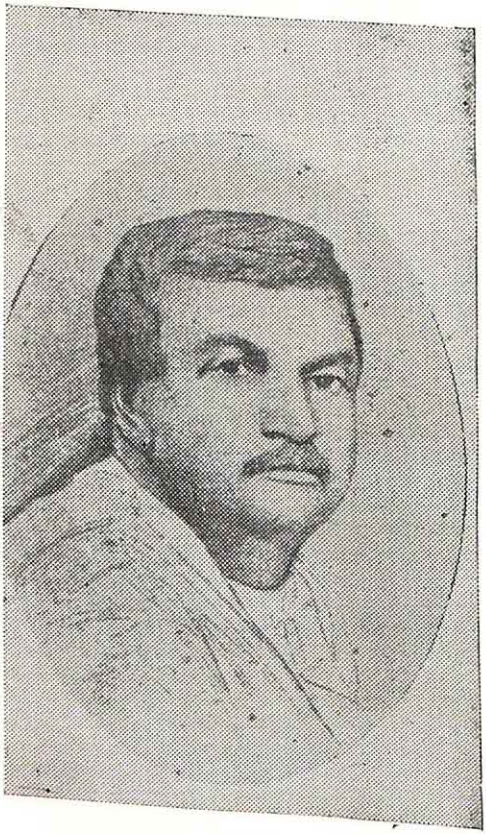
আচার্যপত্নী অবলা বসু



ছবিটি আচার্য জগদীশচন্দ্র ও অবলা বসুর প্রথম জীবনের ছবিচর্চার একটি অন্যতম নিদর্শন। ছবিটি জগদীশচন্দ্রের অ্যালবামে রক্ষিত ছিল। চিত্রে জগদীশচন্দ্র পছন্দসই ফার্ণগাছের পাতার সংগে একটি রঙ্গীন পাখী কাঁচির সাহায্যে কেটে বসিয়ে সুন্দর চিত্র রচনা করেছেন।

দীর্ঘ অবকাশে জগদীশচন্দ্র দেশের নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতেন। সঙ্গে থাকতো ১০" × ১২" প্লেট ক্যামেরা। ফটোতোলার পর পত্নী অবলাদেবীর সহায়তায় তিনি ফটো ডেভেলাপ, এনলার্জ প্রিন্ট করার ইত্যাদি কাজ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই করে ফেলতেন। ছবিটি আচার্য জগদীশচন্দ্রের হাতে তোলা একটি নিসর্গ দৃশ্য।



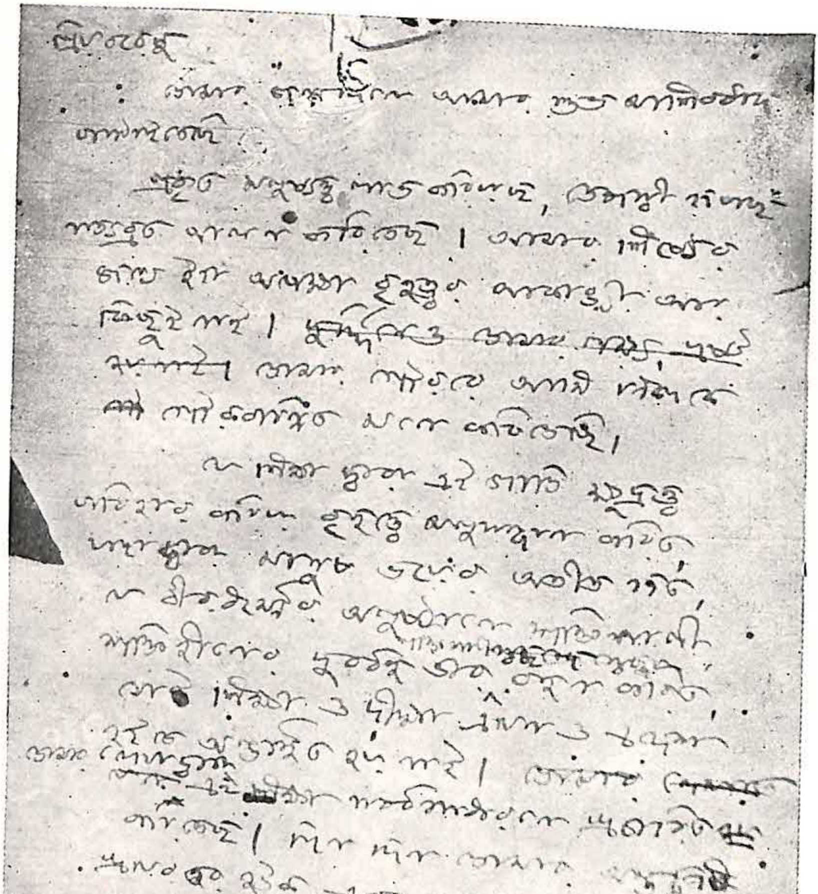




জগদীশচন্দ্রের বাবা ভগবানচন্দ্র বসু ও মাতা বামাসুন্দরী দেবী



বিদ্যাসাগর বাণীভবনের ছাত্রীদের প্রতি আচার্য জগদীশচন্দ্র বক্তৃতাপ্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত 'ভারতমাতা'-র এই চিত্রটি বর্ণনা করেন।



'প্রবাসী' পত্রিকার পঁচিশ বৎসর পূর্তিতে আচার্য জগদীশচন্দ্রের শুভেচ্ছা বাণী। (অপ্রকাশিত)

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ

গাছের কথা

গাছেরা কি কিছু বলে? অনেকে বলিবেন, এ আবার কেমন প্রশ্ন? গাছ কি কোনো দিন কথা কহিয়া থাকে? মানুষেই কি সব কথা ফুটিয়া বলে? আর যাহা ফুটিয়া বলে না, তাহা কি কথা নয়? আমাদের একটি খোকা আছে, সে সব কথা ফুটিয়া বলিতে পারে না; আবার ফুটিয়া যে দুই চারটি কথা বলে, তাহাও এমন আধো আধো ও ভাঙা ভাঙা যে, অপরের সাধ্য নাই তাহার অর্থ বুঝিতে পারে। কিন্তু আমরা আমাদের খোকার সকল কথার অর্থ বুঝিতে পারি। কেবল তাহা নয়। আমাদের খোকা অনেক কথা ফুটিয়া বলে না; চক্ষু, মুখ ও হাত নাড়া, মাথা নাড়া প্রভৃতির দ্বারা আকার ইঙ্গিতে অনেক কথা বলে, আমরা তাহাও বুঝিতে পারি, অন্যে বুঝিতে পারে না। একদিন পার্শ্বের বাড়ি হইতে একটি পায়রা উড়িয়া আসিয়া আমাদের বাড়িতে বসিল; বসিয়া গলা ফুলাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল। পায়রার সঙ্গে খোকার নূতন পরিচয়; খোকা তাহার অনুকরণে ডাকিতে আরম্ভ করিল। 'পায়রা কি রকম ভাবে ডাকে?' বলিলেই ডাকিয়া দেখায়; তদ্ভিন্ন সুখে দুঃখে, চলিতে বসিতে, আপনার মনেও ডাকে। নূতন বিদ্যাটা শিখিয়া তাহার আনন্দের সীমা নাই।

একদিন বাড়ি আসিয়া দেখি, খোকার বড়ো জ্বর হইয়াছে; মাথার বেদনায় চক্ষু মুদিয়া বিছানায় পড়িয়া আছে। যে দুরন্ত শিশু সমস্ত দিন বাড়ি অস্থির করিয়া তুলিত, সে আজ একবার চক্ষু খুলিয়াও চাহিতেছে না। আমি তাহার বিছানার পাশে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলাম। আমার হাতের স্পর্শে খোকা আমাকে চিনিল, এবং অতি কষ্টে চক্ষু খুলিয়া আমার দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। তার পর পায়রার ডাক ডাকিল। ঐ ডাকের ভিতর আমি অনেক কথা শুনিলাম। আমি বুঝিতে পারিলাম, খোকা বলিতেছে, 'খোকাকে দেখিতে আসিয়াছ? খোকা তোমাকে বড়ো ভালোবাসে।' আরও অনেক কথা বুঝিলাম, যাহা আমিও কোন কথার দ্বারা বুঝাইতে পারি না।

যদি বল, পায়রার ডাকের ভিতর এত কথা কি করিয়া শুনিলে? তাহার উত্তর এই, খোকাকে ভালোবাসি বলিয়া। তোমরা দেখিয়াছ, ছেলের মুখ দেখিয়া মা বুঝিতে পারেন ছেলে কি চায়। অনেক সময় কথারও আবশ্যক হয় না। ভালোবাসিয়া দেখিলেই অনেক গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

আগে যখন একা মাঠে কিংবা পাহাড়ে বেড়াইতে যাইতাম, তখন সব খালি-খালি লাগিত। তার পর গাছ, পাখি, কীট-পতঙ্গদিগকে ভালোবাসিতে শিখিয়াছি, সে অবধি

তাদের অনেক কথা বুঝিতে পারি, আগে যাহা যাহা পারিতাম না। এই যে গাছগুলি কোনো কথা বলে না, ইহাদের যে আবার একটা জীবন আছে, আমাদের মতো আহার করে, দিন দিন বাড়ে, আগে এ সব কিছুই জানিতাম না। এখন বুঝিতে পারিতেছি। এখন ইহাদের মধ্যেও আমাদের মতো অভাব, দুঃখ-কষ্ট দেখিতে পাই। জীবনধারণ করিবার জন্য ইহাদিগকেও সর্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয়। কষ্টে পড়িয়া ইহাদের মধ্যেও কেহ কেহ চুরি ডাকাতি করে। মানুষের মধ্যে যেরূপ সদ্‌গুণ আছে, ইহাদের মধ্যেও তাহার কিছু কিছু দেখা যায়। বৃক্ষদের মধ্যে একে অন্যকে সাহায্য করিতে দেখা যায়, ইহাদের মধ্যে একের সহিত অপরের বন্ধুতা হয়। তার পর মানুষের সর্বোচ্চ গুণ যে স্বার্থত্যাগ, গাছে তাহাও দেখা যায়। মা নিজের জীবন দিয়া সন্তানের জীবন রক্ষা করেন। সন্তানের জন্য নিজের জীবন-দান উদ্ভিদেও সচরাচর দেখা যায়। গাছের জীবন মানুষের জীবনের ছায়ামাত্র। ক্রমে এ সব কথা তোমাদিগকে বলিব।

তোমরা শুষ্ক গাছের ডাল সকলেই দেখিয়াছ। মনে কর, কোনো গাছের তলাতে বসিয়াছ। ঘন সবুজ পাতায় গাছটি ঢাকা, ছায়াতে তুমি বসিয়াছ। গাছের নীচে এক পার্শ্বে একখানি শুষ্ক ডাল পড়িয়া আছে। এক সময় এই ডালে কত পাতা ছিল, এখন সব শুকাইয়া গিয়াছে, আর ডালের গোড়ায় উই ধরিয়াছে। আর কিছুকাল পরে ইহার চিহ্নও থাকিবে না। আচ্ছা, বলো তো, এই গাছ আর এই মরা ডালে কি প্রভেদ? গাছটি বাড়িতেছে, আর মরা ডালটা ক্ষয় হইয়া যাইতেছে; একে জীবন আছে, আর অন্যটিতে জীবন নাই। যাহা জীবিত তাহা ক্রমশ বাড়িতে থাকে। জীবিতের আর একটি লক্ষণ এই যে, তাহার গতি আছে, অর্থাৎ তাহারা নড়ে চড়ে। গাছের গতি হঠাৎ দেখা যায় না। লতা কেমন করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া গাছকে জড়াইয়া ধরে, দেখিয়াছ?

জীবিত বস্তুতে গতি দেখা যায়; জীবিত বস্তু বাড়িয়া থাকে। কেবল ডিমে জীবনের কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। ডিমে জীবন ঘুমাইয়া থাকে। উত্তাপ পাইলে ডিম হইতে পাখির ছানা জন্মলাভ করে। বীজগুলি যেন গাছের ডিম; বীজের মধ্যেও এরূপ গাছের শিশু ঘুমাইয়া থাকে। মাটি, উত্তাপ ও জল পাইলে বীজ হইতে বৃক্ষশিশুর জন্ম হয়।

বীজের উপর এক কঠিন ঢাকনা; তাহার মধ্যে বৃক্ষ-শিশু নিরাপদে নিদ্রা যায়। বীজের আকার নানাপ্রকার, কোনোটি অতি ছোটো, কোনোটি বড়ো। বীজ দেখিয়া গাছ কত বড়ো হইবে বলা যায় না। অতি প্রকাণ্ড বটগাছ, সরিষা অপেক্ষা ছোটো বীজ হইতে জন্মে। কে মনে করিতে পারে, এত বড়ো গাছটা এই ক্ষুদ্র সরিষার মধ্যে লুকাইয়া আছে? তোমরা হয়তো কৃষকদিগকে ধানের বীজ ক্ষেত্রে ছড়াইতে দেখিয়াছ। কিন্তু যত গাছপালা, বন-জঙ্গল দেখ, তাহার অনেকের বীজ মানুষ ছড়ায় নাই। নানা উপায়ে গাছের বীজ ছড়াইয়া যায়। পাখিরা ফল খাইয়া দূর দেশে বীজ লইয়া যায়। এই প্রকারে জনমানবশূন্য দ্বীপে গাছ জন্মিয়া থাকে। ইহা ছাড়া অনেক বীজ বাতাসে উড়িয়া অনেক দূর দেশে ছড়াইয়া পড়ে। শিমুল গাছ অনেকে দেখিয়াছ। শিমুল-ফল যখন রৌদ্রে ফাটিয়া যায় তখন তাহার মধ্য হইতে বীজ তুলার সঙ্গে উড়িতে থাকে।

ছেলেবেলায় আমরা এই সকল বীজ ধরিবার জন্য ছুটিতাম ; হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেলেই বাতাস তুলার সহিত বীজকে অনেক উপরে লইয়া যাইত। এই প্রকারে দিন-রাত্রি দেশ-দেশান্তরে বীজ ছড়াইয়া পড়িতেছে।

প্রত্যেক বীজ হইতে গাছ জন্মে কি না, কেহ বলিতে পারে না। হয়তো কঠিন পাথরের উপর বীজ পড়িল, সেখানে তার অঙ্কুর বাহির হইতে পারিল না। অঙ্কুর বাহির হইবার জন্য উত্তাপ, জল ও মাটি চাই।

যেখানেই বীজ পড়ুক না কেন, বৃক্ষ-শিশু অনেক দিন পর্যন্ত বীজের মধ্যে নিরাপদে ঘুমাইয়া থাকে। বাড়িবার উপযুক্ত স্থানে যতদিন না পড়ে, ততদিন বাহিরের কঠিন ঢাক্‌না গাছের শিশুটিকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করে।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বীজ পাকিয়া থাকে। আম, লিচুর বীজ বৈশাখ মাসে পাকে ; ধান, যব ইত্যাদি আশ্বিন কার্তিক মাসে পাকিয়া থাকে। মনে কর, একটি গাছের বীজ আশ্বিন মাসে পাকিয়াছে। আশ্বিন মাসের শেষে বড়ো ঝড় হয়। ঝড়ে পাতা ও ছোটো ছোটো ডাল ছিঁড়িয়া চারি দিকে পড়িতে থাকে। এইরূপে বীজগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। প্রবল বাতাসের বেগে কোথায় উড়িয়া যায়, কে বলিতে পারে ? মনে কর, একটি বীজ সমস্ত দিন-রাত্রি মাটিতে লুটাইতে লুটাইতে একখানা ভাঙা ইট কিংবা মাটির ডেলার নীচে আশ্রয় লইল। কোথায় ছিল, কোথায় আসিয়া পড়িল। ক্রমে ধুলা ও মাটিতে বীজটি ঢাকা পড়িল। এখন বীজটি মানুষের চক্ষুর আড়াল হইল। আমাদের দৃষ্টি হইতে দূরে গেল বটে, কিন্তু বিধাতার দৃষ্টির বাহিরে যায় নাই। পৃথিবী মাতার ন্যায় তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। বৃক্ষ-শিশুটি মাটিতে ঢাকা পড়িয়া বাহিরের শীত ও ঝড় হইতে রক্ষা পাইল। এইরূপে নিরাপদে বৃক্ষ-শিশুটি ঘুমাইয়া রহিল।

["গাছের কথা" ও পরের প্রবন্ধ "উদ্ভিদের জন্মমৃত্যু" মুকুল পত্রিকায় ১৩০২ সালের আষাঢ় ও ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। সম্ভবত গাছের কথা (১) ও গাছের কথা (২) নামে। অব্যক্তে প্রকাশকালে প্রবন্ধ দুটি সামান্য পরিমার্জিত হয়। শকুন্তলাদেবী ১৩৪০ সালে "প্রবন্ধাবলী" নামে যে সংকলন প্রকাশ করেছিলেন তাতে এই দুটি প্রবন্ধ যথাক্রমে গাছের কথা (১) ও গাছের কথা (২) বলে প্রকাশ করেন। শকুন্তলাদেবী সম্ভবত মুকুল পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ দুটিকেই বেছে নেন। তাই অনুমান করা যেতে পারে প্রবন্ধ দুটি মুকুলে প্রকাশকালে গাছের কথা (১) ও গাছের কথা (২) নামে প্রকাশিত হয়েছিল।]

উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু

মৃত্তিকার নীচে অনেক দিন বীজ লুকাইয়া থাকে। মাসের পর মাস এইরূপে কাটিয়া গেল। শীতের পর বসন্ত আসিল। তার পর বর্ষার আরম্ভে দুই-এক দিন বৃষ্টি হইল। এখন আর লুকাইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। বাহির হইতে কে যেন শিশুকে ডাকিয়া বলিতেছে, 'আর ঘুমাইয়ো না, উপরে উঠিয়া আইস, সূর্যের আলো দেখিবে।' আস্তে আস্তে বীজের ঢাকনাটি খসিয়া পড়িল, দুইটি কোমল পাতার মধ্য হইতে অঙ্কুর বাহির হইল। অঙ্কুরের এক অংশ নীচের দিকে গিয়া দৃঢ়রূপে মাটি ধরিয়া রহিল, আর এক অংশ মাটি ভেদ করিয়া উপরে উঠিল। তোমরা কি অঙ্কুর উঠিতে দেখিয়াছ? মনে হয় শিশুটি যেন ছোটো মাথা তুলিয়া আশ্চর্যের সহিত নূতন দেশ দেখিতেছে।

গাছের অঙ্কুর বাহির হইলে যে অংশ মাটির ভিতর প্রবেশ করে, তাহার নাম মূল। আর যে অংশ উপরের দিকে বাড়িতে থাকে, তাহাকে বলে কাণ্ড। সকল গাছেই 'মূল' আর 'কাণ্ড' এই দুই ভাগ দেখিবে। এই এক আশ্চর্যের কথা, গাছকে যেরূপেই রাখ, মূল নীচের দিকে ও কাণ্ড উপরের দিকে যাইবে। একটি টবে গাছ ছিল। পরীক্ষা করিবার জন্য কয়েক দিন ধরিয়া টবটিকে উল্টা করিয়া ঝুলাইয়া রাখিলাম। গাছের মাথা নীচের দিকে ঝুলিয়া রহিল, আর শিকড় উপরের দিকে রহিল। দুই-এক দিন পরে দেখিতে পাইলাম যে, গাছ যেন টের পাইয়াছে। তাহার সব ডালগুলি বাঁকা হইয়া উপরের দিকে উঠিল ও মূলটি ঘুরিয়া নীচের দিকে নামিয়া গেল। তোমরা অনেকে শীতকালে অনেক বার মূলা কাটিয়া শয়তা করিয়া থাকিবে। দেখিয়াছ, প্রথমে শয়তার পাতাগুলি ও ফুল নীচের দিকে থাকে। কিছুদিন পরে দেখিতে পাওয়া যায়, পাতা ও ফুলগুলি উপর দিকে উঠিয়াছে।

আমরা যেরূপ আহার করি, গাছও সেইরূপ আহার করে। আমাদের দাঁত আছে, আমরা কঠিন জিনিস খাইতে পারি। ছোটো ছোটো শিশুদের দাঁত নাই; তাহারা কেবল দুধ খায়। গাছেরও দাঁত নাই, সুতরাং তাহারা কেবল জলীয় দ্রব্য কিংবা বাতাস হইতে আহার গ্রহণ করিতে পারে। মূল দ্বারা মাটি হইতে গাছ রস শোষণ করে। চিনিতে জল ঢালিলে চিনি গলিয়া যায়। মাটিতে জল ঢালিলে মাটির ভিতরের অনেক জিনিস গলিয়া যায়। গাছ সেই সব জিনিস আহার করে। গাছের গোড়ায় জল না দিলে গাছের আহার বন্ধ হইয়া যায়, ও গাছ মরিয়া যায়।

অণুবীক্ষণ দিয়া অতি ক্ষুদ্র পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। গাছের ডাল কিংবা মূল এই যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, গাছের মধ্যে হাজার হাজার নল আছে। এইসব নল দ্বারা মাটি হইতে গাছের শরীরে রস প্রবেশ করে।

এ ছাড়া গাছের পাতা বাতাস হইতে আহার সংগ্রহ করে। পাতার মধ্যে অনেকগুলি ছোটো ছোটো মুখ আছে। অণুবীক্ষণ দিয়া এই সব মুখে ছোটো ছোটো ঠোঁট দেখা যায়। যখন আহার করিবার আবশ্যক হয় না তখন ঠোঁট দুইটি বুজিয়া যায়। আমরা যখন শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করি তখন প্রশ্বাসের সঙ্গে এক প্রকার বিষাক্ত বায়ু বাহির হইয়া যায় ; তাহাকে অঙ্গারক বায়ু বলে। ইহা যদি পৃথিবীতে জমিতে থাকে তবে সকল জীবজন্তু অল্পদিনের মধ্যে এই বিষাক্ত বায়ু গ্রহণ করিয়া মরিয়া যাইতে পারে। বিধাতার করুণার কথা ভাবিয়া দেখ। যাহা জীবজন্তুর পক্ষে বিষ, গাছ তাহাই আহার করিয়া বাতাস পরিষ্কার করিয়া দেয়। গাছের পাতার উপর যখন সূর্যের আলোক পড়ে, তখন পাতাগুলি সূর্যের তেজের সাহায্যে অঙ্গারক বায়ু হইতে অঙ্গার বাহির করিয়া লয়। এই অঙ্গার গাছের শরীরে প্রবেশ করিয়া গাছকে বাড়াইতে থাকে। গাছেরা আলো চায়, আলো না হইলে ইহারা বাঁচিতে পারে না। গাছের সর্বপ্রধান চেষ্টা, কি করিয়া একটু আলো পাইবে। যদি জানালার কাছে টবে গাছ রাখ, তবে দেখিবে, সমস্ত ডালগুলি অন্ধকার দিক্ ছাড়িয়া আলোর দিকে যাইতেছে। বনে যাইয়া দেখিবে, গাছগুলি তাড়াতাড়ি মাথা তুলিয়া কে আগে আলোক পাইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতেছে। লতাগুলি ছায়াতে পড়িয়া থাকিলে আলোর অভাবে মরিয়া যাইবে, এইজন্য তাহারা গাছ জড়াইয়া ধরিয়া উপরের দিকে উঠিতে থাকে।

এখন বুঝিতে পারিতেছ, আলোই জীবনের মূল। সূর্যের কিরণ শরীরে ধারণ করিয়াই গাছ বাড়িতে থাকে। গাছের শরীরে সূর্যের কিরণ আবদ্ধ হইয়া আছে। কাঠে আগুন ধরাইয়া দিলে যে আলো ও তাপ বাহির হয়, তাহা সূর্যেরই তেজ। গাছ ও তাহার শস্য আলো ধরিবার ফাঁদ। জন্তুরা গাছ খাইয়া প্রাণ ধারণ করে ; গাছে যে সূর্যের তেজ আছে তাহা এই প্রকারে আবার জন্তুর শরীরে প্রবেশ করে। শস্য আহার না করিলে আমরাও বাঁচিতে পারিতাম না। ভাবিয়া দেখিতে গেলে, আমরাও আলো আহার করিয়া বাঁচিয়া আছি।

কোনো কোনো গাছ এক বৎসরের পরেই মরিয়া যায়। সব গাছই মরিবার পূর্বে সন্তান রাখিয়া যাইতে ব্যগ্র হয়। বীজগুলিই গাছের সন্তান। বীজ রক্ষা করিবার জন্য ফুলের পাপড়ি দিয়া গাছ একটি ক্ষুদ্র ঘর প্রস্তুত করে। গাছ যখন ফুলে ঢাকিয়া থাকে, তখন কেমন সুন্দর দেখায়। মনে হয়, গাছ যেন হাসিতেছে। ফুলের ন্যায় সুন্দর জিনিস আর কি আছে? গাছ তো মাটি হইতে আহার লয়, আর বাতাস হইতে অঙ্গার আহরণ করে। এই সামান্য জিনিস দিয়া কি করিয়া এরূপ সুন্দর ফুল হইল? গল্পে শুনিয়াছি, স্পর্শমণি নামে এক প্রকার মণি আছে, তাহা ছোঁয়াইলে লোহা সোনা হইয়া যায়। আমার মনে হয়, মাতার স্নেহই সেই মণি। সন্তানের উপর ভালোবাসাটাই যেন ফুলে ফুটিয়া উঠে। ভালোবাসার স্পর্শেই যেন মাটি এবং অঙ্গার ফুল হইয়া যায়।

গাছে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে দেখিলে আমাদের মনে কত আনন্দ হয়! বোধ হয়

গাছেরও যেন কত আনন্দ! আনন্দের দিনে আমরা দশজনকে নিমন্ত্রণ করি। ফুল ফুটিলে গাছও তাহার বন্ধু-বান্ধবদিগকে ডাকিয়া আনে। গাছ যেন ডাকিয়া বলে 'কোথায় আমার বন্ধু-বান্ধব, আজ আমার বাড়িতে এসো। যদি পথ ভুলিয়া যাও, বাড়ি যদি চিনিতে না পার, সেজন্য নানা রঙের ফুলের নিশান তুলিয়া দিয়াছি। এই রঙিন পাপড়িগুলি দূর হইতে দেখিতে পাইবে।' মৌমাছি ও প্রজাপতির সহিত গাছের চিরকাল বন্ধুতা। তাহারা দলে দলে ফুল দেখিতে আসে। কোনো কোনো পতঙ্গ দিনের বেলায় পাখির ভয়ে বাহির হইতে পারে না। পাখি তাহাদিগকে দেখিলেই খাইয়া ফেলে। কাজেই রাত্রি না হইলে তাহারা বাহির হইতে পারে না। সন্ধ্যা হইলেই তাহাদিগকে আনিবার জন্য ফুল চারি দিকে সুগন্ধ বিস্তার করে।

গাছ ফুলের মধ্যে মধু সঞ্চয় করিয়া রাখে। মৌমাছি ও প্রজাপতি সেই মধু পান করিয়া যায়। মৌমাছি আসে বলিয়া গাছেরও উপকার হয়। ফুলে তোমরা রেণু দেখিয়া থাকিবে। মৌমাছিরা এক ফুলের রেণু অন্য ফুলে লইয়া যায়। রেণু ভিন্ন বীজ পাকিতে পারে না।

এইরূপে ফুলের মধ্যে বীজ পাকিয়া থাকে। শরীরের রস দিয়া গাছ বীজগুলিকে লালনপালন করিতে থাকে। নিজের জীবনের জন্য এখন আর মায়া করে না। তিল তিল করিয়া সন্তানের জন্য সমস্ত বিলাইয়া দেয়। যে শরীর কিছু দিন পূর্বে সতেজ ছিল, এখন তাহা একেবারে শুকাইয়া যাইতে থাকে। শরীরের ভার বহন করিবারও আর শক্তি থাকে না। আগে বাতাস হু-হু করিয়া পাতা নড়াইয়া চলিয়া যাইত। পাতাগুলি বাতাসের সঙ্গে খেলা করিত; ছোটো ডালগুলি তালে তালে নাচিত। এখন শুষ্ক গাছটি বাতাসের ভর সহিতে পারে না। বাতাসের এক-একটি ঝাপটা লাগিলে গাছটি থর-থর করিয়া কাঁপিতে থাকে। একটি একটি করিয়া ডালগুলি ভাঙিয়া পড়িতে থাকে। শেষে একদিন হঠাৎ গোড়া ভাঙিয়া গাছ মাটিতে পড়িয়া যায়।

এইরূপে সন্তানের জন্য নিজের জীবন দিয়া গাছ মরিয়া যায়।

মন্ত্রের সাধন

প্রশান্ত মহাসাগরে অনেকগুলি দ্বীপ দেখা যায়। এই দ্বীপগুলি অতি ক্ষুদ্র প্রবাল-কীটের দেহ পঞ্জরে নির্মিত হইয়াছে। বহু সহস্র বৎসরে অগণ্য কীট নিজ নিজ দেহ দ্বারা এই দ্বীপগুলি নির্মাণ করিয়াছে।

আজকাল বিজ্ঞানের দ্বারা যে সব অসাধ্য সাধন হইতেছে, তাহাও বহুলোকের ক্ষুদ্র চেষ্টার ফলে। মানুষ পূর্বে একান্ত অসহায় ছিল। বুদ্ধি, চেষ্টা ও সহিষ্ণুতার বলে আজ সে পৃথিবীর রাজা হইয়াছে। কত কষ্ট ও কত চেষ্টার পর মনুষ্য বর্তমান উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা আমরা মনেও করিতে পারি না। কে প্রথমে আগুন জ্বালাইতে শিখাইল, কে প্রথমে ধাতুর ব্যবহার শিক্ষা দিল, কে লেখার প্রথা আবিষ্কার করিল, তাহা আমরা কিছুই জানি না। এইমাত্র জানি যে, প্রথমে যাঁহারা কোনো নূতন প্রথা প্রচলন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহারা পদে পদে অনেক বাধা পাইয়াছিলেন। অনেক সময় তাঁহাদিগকে অনেক নির্যাতনও সহ্য করিতে হইয়াছিল। এত কষ্টের পরেও অনেকে তাঁহাদের চেষ্টা সফল দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। আপাততঃ মনে হয়, তাঁহাদের চেষ্টা একেবারে বৃথা গিয়াছে। কিন্তু কোনো চেষ্টাই একেবারে বিফল হয় না। আজ যাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র মনে হয়, দুইদিন পরে তাহা হইতেই মহৎ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রবাল-দ্বীপ যেরূপ একটু একটু করিয়া আয়তনে বর্ধিত হয়, জ্ঞানরাজ্যও সেইরূপ তিল তিল করিয়া বাড়িতেছে। এ সম্বন্ধে দুই একটি ঘটনা বলিতেছি।

একশত বৎসর পূর্বে ইটালি দেশে গ্যাল্‌ভানি নামে একজন অধ্যাপক দেখিতে পাইলেন যে, লোহা ও তামার তার দিয়া একটা মরা ব্যাঙকে স্পর্শ করিলে ব্যাঙটা নড়িয়া উঠে। তিনি অনেক বৎসর ধরিয়া এই ঘটনাটির অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এরূপ সামান্য বিষয় লইয়া এত সময় অপব্যয় করিতে দেখিয়া, লোকে তাঁহাকে উপহাস করিত। তাঁহার নাম হইল, 'ব্যাঙ-নাচানো' অধ্যাপক। বন্ধুরা আসিয়া বলিতে লাগিলেন, 'মরা ব্যাঙ যেন নড়িল, কিন্তু ইহাতে লাভ কি ?'

কি লাভ ?— সেই সৎসামান্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া বিদ্যুতের বিবিধ গুণ সম্বন্ধে নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়া হইতে আরম্ভ হইল। এই একশত বৎসরের মধ্যে বিদ্যুৎ-শক্তির দ্বারা পৃথিবীর ইতিহাস যেন পরিবর্তিত হইয়াছে। বিদ্যুৎ দ্বারা পথ-ঘাট আলোকিত হইতেছে, গাড়ি চলিতেছে। মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্তের সংবাদ অন্য প্রান্তে পেঁৗছিতেছে। সমস্ত পৃথিবীটি যেন আমাদের ঘরের কোণে আসিয়াছে— দূর আর দূর নাই। আমাদের স্বর বাড়ির এক দিক হইতে অন্য দিকে পেঁৗছিত না। এখন বিদ্যুতের বলে সহস্র ক্রোশ দূরের বন্ধুর সহিত কথাবার্তা বলিতেছি। এমন-কি,

এই শক্তির সাহায্যে দূর দেশে কি হইতেছে, তাহা পর্যন্ত দেখিতে পাইব। আমাদের দৃষ্টি ও আমাদের স্বর আর কোনো বাধা মানিবে না।

মনুষ্য এ পর্যন্ত পৃথিবী এবং সমুদ্রের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে ; কিন্তু বহুদিন আকাশ জয় করিতে পারে নাই। ব্যোমযানে শূন্যে উঠা যায় বটে, কিন্তু বাতাসের প্রতিকূলে বেলুন চলিতে পারে না। আর এক অসুবিধা এই যে, বেলুন হইতে অল্প সময়ের মধ্যেই গ্যাস বাহির হইয়া যায়, এজন্য বেলুন অধিকক্ষণ শূন্যে থাকিতে পারে না।

রেশমের আবরণ হইতে গ্যাস বাহির হইয়া যায় বলিয়া, বেলুন অধিকক্ষণ আকাশে থাকিতে পারে না। সোয়ার্জ নামে একজন জার্মান এই জন্য আলুমিনিয়াম ধাতুর এক বেলুন প্রস্তুত করেন। আলুমিনিয়াম কাগজের ন্যায় হালকা, অথচ ইহা ভেদ করিয়া গ্যাস বাহির হইতে পারে না। বেলুন যে ধাতু-নির্মিত হইতে পারে, ইহা কেহ বিশ্বাস করিল না। সোয়ার্জ তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ব্যয় করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। বহু বৎসর নিষ্ফল চেষ্টার পর অবশেষে বেলুন নির্মিত হইল। বেলুন যাহাতে ইচ্ছানুক্রমে বাতাসের প্রতিকূলে যাইতে পারে সেজন্য একটি ক্ষুদ্র এঞ্জিন প্রস্তুত করিলেন। জাহাজে জলের নীচে স্ক্রু থাকে, এঞ্জিনে স্ক্রু ঘুরাইলে জল কাটিয়া জাহাজ চলিতে থাকে, সেইরূপ বাতাস কাটিয়া চলিবার জন্য একটি স্ক্রু নির্মাণ করিলেন। কিন্তু বেলুন নির্মিত হইবার অল্প পরেই সোয়ার্জের অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। যাহার জন্য সমস্ত সম্পত্তি ও জীবন পণ করিয়াছিলেন তিনি তাহার পরীক্ষা করিতে পারিলেন না, এতদিনের চেষ্টা নিষ্ফল হইতে চলিল।

সোয়ার্জের সহধর্মিণী তখন জার্মান গবর্নমেণ্টের নিকট বেলুন পরীক্ষা করিবার জন্য আবেদন করিলেন। জার্মান গবর্নমেণ্ট যুদ্ধে বোমযান ব্যবহার করিবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন, কিন্তু সোয়ার্জের বেলুন যে কখনও আকাশে উঠিতে পারিবে কেহ তাহা বিশ্বাস করিত না। কেবল বিধবার দুঃখ কাহিনী শুনিয়া গবর্নমেণ্ট দয়া করিয়া বেলুনটা পরীক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ বিভাগের কতিপয় অধ্যক্ষকে নিযুক্ত করিলেন। নির্দিষ্ট দিবসে বেলুন দেখিবার জন্য বহু লোক আসিল। পরীক্ষকেরা আসিয়া দেখিলেন, বেলুনটি অতি প্রকাণ্ড এবং ধাতুনির্মিত বলিয়া রেশমের বেলুন অপেক্ষা অনেক ভারী। তারপর বেলুন চালাইবার জন্য এঞ্জিন ও অনেক কল বেলুনে সংযুক্ত রহিয়াছে। এরূপ প্রকাণ্ড জিনিস কি কখনও আকাশে উঠিতে পারে! পরীক্ষকেরা একে অন্যের সহিত বলাবলি করিতে লাগিলেন। এই অদ্ভুত কল কোনোদিনও পৃথিবী ছাড়িয়া উঠিতে পারিবে না। লোকটা মরিয়া গিয়াছে, আর তাহার বিধবা অনেক আশা করিয়া দেখাইতে আসিয়াছে ; সুতরাং অন্ততঃ নামমাত্র পরীক্ষা করিতে হইবে। তবে বেলুনের সহিত অতগুলি কল ও জঞ্জাল রহিয়াছে, ওগুলি কাটিয়া বেলুনটিকে একটু পাতলা করিলে হয়তো ২।৪ হাত উঠিতে পারিবে। হায়! তাহাদিগকে বুঝাইবার কেহ ছিল না ; বেলুন যিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, পৃথিবীতে তাঁহার স্বর আর শুনা যাইবে না! যেসব কল অনাবশ্যক বলিয়া কাটিয়া ফেলা হইল তাহা

আবিষ্কার করিতে অনেক বৎসর লাগিয়াছিল। ঐ সব কল দ্বারা বেলুনটিকে ইচ্ছানুসারে দক্ষিণে, বামে, ঊর্ধ্বে ও অধোদিকে চালিত করা যাইত।

ইহার পর আর এক বাধা পড়িল। সোয়ার্জের অবর্তমানে বেলুন কে চালাইবে? অপরে কি করিয়া কলের ব্যবহার বুঝিবে? সে যাহা হউক, দর্শকদিগের মধ্যে একজন এঞ্জিনিয়ার সাধ্যমত কল চালাইতে সম্মত হইলেন। অদূরে বিধবা কলের প্রত্যেক স্পন্দন গণিতেছিলেন। বেলুন পৃথিবী হইতে উঠিতে পারিবে কি? মৃত ব্যক্তির আশা ভরসা হয় এইবারে পূর্ণ হইবে, নতুবা একেবারে নির্মূল হইবে। কল চালানো হইল, অমনি বেলুন পৃথিবী ছাড়িয়া মহাবেগে শূন্যে উঠিল। তখন বাতাস বহিতেছিল, কিন্তু প্রতিকূল বাতাস কাটিয়া বেলুন ছুটিল। এতদিনে সোয়ার্জের চেষ্টা সফল হইল। কিন্তু লোকেরা যে সব কল অনাবশ্যক মনে করিয়াছিলেন, স্বল্পকালের মধ্যেই তাহার আবশ্যকতা প্রমাণিত হইল। বেলুন আকাশে উঠিল বটে, কিন্তু তাহা সামলাইবার কল না থাকাতে অল্পক্ষণ পরেই ভূমিতে পতিত হইয়া চূর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু এই দুর্দশাতে সকলে বুঝিতে পারিলেন যে, সোয়ার্জ যে অভিপ্রায়ে বেলুন নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহা কোনোদিন হয়তো সফল হইবে। দশ বৎসরের মধ্যেই তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। জেপেলিন যে ব্যোমযান নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহা যুদ্ধে ভীষণ অস্ত্র হইয়াছিল। যুদ্ধের পর এই ব্যোমযান আটলাণ্টিক মহাসাগর অনায়াসে পার হইয়াছে এবং তাহার পর হইতে ইয়োরোপ ও আমেরিকার ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়াছে।

ব্যোমযান গ্যাস ভরিয়া লঘু করিতে হয়, সুতরাং আকারে অতি বৃহৎ এবং নির্মাণ করা বহু ব্যয়সাপেক্ষ। পাখিরা কি সহজেই উড়িয়া বেড়ায়! মানুষ কি কখনও পাখির মতো উড়িতে পারিবে? বড়ো বড়ো পাখিগুলি কেমন দুই-চারিবার পাখা নাড়িয়া শূন্যে উঠে, তাহার পর পাখা বিস্তার করিয়া চক্রাকারে আকাশে ঘুরিতে থাকে। ঘুরিতে ঘুরিতে আকাশে মিলিয়া যায়।

তোমাদের কি কখনো পাখির মতো উড়িবার ইচ্ছা হয় নাই? জর্মানি দেশে লিলিয়েন্থাল মনে করিলেন, আমরা কেন পাখির মতো আকাশ ভ্রমণ করিতে পারিব না? তাহার পর পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি জানিতেন, এই বিদ্যা সাধন করিতে অনেক দিন লাগিবে। শিশু যেরূপ একটু একটু করিয়া অনেক চেষ্টায় হাঁটিতে শিখে, তাঁহাকেও সেইরূপ করিয়া উড়িতে শিখিতে হইবে। কিন্তু শিশু যেরূপ পড়িয়া গেলে আবার উঠিতে চেষ্টা করে, আকাশ হইতে পড়িয়া গেলে আর তো উঠিবার সাধ্য থাকিবে না, মৃত্যু নিশ্চয়। এত বিপদ জানিয়াও তিনি পরীক্ষা হইতে বিরত হইলেন না। অনেক পরীক্ষার পর নানাপ্রকার পাখা প্রস্তুত করিলেন এবং সেগুলি বাহুতে বাঁধিয়া পাহাড় হইতে ঝাঁপ দিয়া, পাখায় ভর করিয়া নীচে নামিতে লাগিলেন। একবার তাঁহার মনে হইল, যে দুইখানা পাখার পরিবর্তে যদি অধিক সংখ্যক পাখা ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে হয়তো উড়িবার বেশি সুবিধা হইতে পারে। চেষ্টা করিয়া দেখিলেন তাহাই ঠিক।

ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত অতি সাবধানে তিনি এই সব পরীক্ষা করিতেছিলেন। জীবনের

অধিকাংশ সময় কাটিয়া গিয়াছে, এজন্য তাঁহার কার্য শেষ করিতে তিনি অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। এখন যে কল প্রস্তুত করিলেন, তাড়াতাড়িতে তাহা পূর্বের মতো দৃঢ় হইল না। তিনি সেই অসম্পূর্ণ কল লইয়াই উড়িতে চেষ্টা করিলেন। এবার অতি সহজেই বাতাস কাটিয়া যাইতেছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে হঠাৎ বাতাসের ঝাপটা আসিয়া উপরের একখানা পাখা ভাঙিয়া দিল।

এই দুর্ঘটনায় তিনি প্রাণ হারাইলেন। কিন্তু তিনি পরীক্ষা দ্বারা যেসব নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিলেন তাহা পৃথিবীর সম্পত্তি হইয়া রহিল। তাঁহার আবিষ্কৃত তত্ত্বের সাহায্যে পরে উড়িবার কল নির্মাণ করা সম্ভব হইয়াছে। মার্কিন দেশে অধ্যাপক ল্যাঙলি পাখা সংযুক্ত উড়িবার-কল প্রস্তুত করিলেন ; তাহাতে অতি হালকা একখানা এঞ্জিন সংযুক্ত ছিল। পরীক্ষার দিন অনেক লোক দেখিতে আসিয়াছিল। কিন্তু কর্মকারের শৈথিল্যবশতঃ একটি স্ক্রু ঢিলা হইয়াছিল। এঞ্জিন চালাইবার পর কল আকাশে উঠিয়া চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল। এমন সময় ঢিলা স্ক্রুটি খুলিয়া গেল এবং কলটি নদীগর্ভে পতিত হইল। এই বিফলতার দুঃখে ল্যাঙলি ভগ্নহৃদয়ে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

যাঁহারা ভীরু তাঁহারাই বহু ব্যর্থ সাধনা ও মৃত্যুভয়ে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন। বীর পুরুষেরাই নির্ভীক চিত্তে মৃত্যুভয়ের অতীত হইতে সমর্থ হন। ল্যাঙলির মৃত্যুর পর তাঁহারই স্বদেশী উইলবার রাইট উড়িবার-কল লইয়া পুনরায় পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। উড়িবার সময় একবার কল থামিয়া যায় এবং আকাশ হইতে পতিত হইয়া রাইটের একখানা পা ভাঙিয়া যায়। ইহাতেও ভীত না হইয়া পুনরায় পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন এবং সেই চেষ্টার ফলে মানুষ গগনবিহারী হইয়া নীলাকাশে তাহার সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

[প্রবন্ধটি ১৩০৫ সালে মুকুল পত্রিকায় দুটি কিস্তিতে মন্ত্রের সাধন (১) ও মন্ত্রের সাধন (২) নামে প্রকাশিত হয়। "অব্যক্তে" প্রকাশকালে পরিমার্জিতরূপে "মন্ত্রের সাধন" নামে একটি প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য "অব্যক্তে" প্রকাশকালে জগদীশচন্দ্র অনেক লেখাই পরিমার্জিতরূপে প্রকাশ করেন।]

অদৃশ্য আলোক

সেতারের তার অঙ্গুলিতাড়নে ঝংকার দিয়া উঠে। দেখা যায়, তার কাঁপিতেছে। সেই কম্পনে বায়ুরাশিতে অদৃশ্য ঢেউ উৎপন্ন হয় এবং তাহার আঘাতে কর্ণেন্দ্রিয়ে সুর উপলব্ধি হয়। এইরূপে তিনের সাহায্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সংবাদ প্রেরিত ও উপলব্ধ হইয়া থাকে— প্রথমতঃ শব্দের উৎস ঐ কম্পিত তার, দ্বিতীয়তঃ পরিবাহক বায়ু এবং তৃতীয়তঃ শব্দবোধক কর্ণেন্দ্রিয়।

সেতারের তার যতই ছোটো করা যায়, সুর ততই উচ্চ হইতে উচ্চতর সপ্তমে উঠিয়া থাকে। এইরূপে বায়ুস্পন্দন প্রতি সেকেণ্ডে ৩০,০০০ বার হইলে অসহ্য উচ্চ সুর শোনা যায়। তার আরও খাটো করিলে সুর আর শুনিতে পাই না। তার তখনও কম্পিত হইতেছে, কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয় সেই অতি উচ্চ সুর উপলব্ধি করিতে পারে না। শ্রবণ করিবার উপরের দিকে যেরূপ এক সীমা আছে, নীচের দিকেও সেইরূপ। স্থূল তার কিংবা ইস্পাত আঘাত করিলে অতি ধীর স্পন্দন দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কোনো শব্দ শোনা যায় না। কম্পন-সংখ্যা ১৬ হইতে ৩০,০০০ পর্যন্ত হইলে তাহা শ্রুত হয়; অর্থাৎ আমাদের শ্রবণশক্তি একাদশ সপ্তকের মধ্যে আবদ্ধ। কর্ণেন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতা হেতু অনেক সুর আমাদের নিকট অশব্দ।

বায়ুরাশির কম্পনে যেরূপ শব্দ উৎপন্ন হয়, আকাশ স্পন্দনেও সেইরূপ আলো উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্রবণেন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতা হেতু একাদশ সপ্তক সুর শুনিতে পাই। কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতা আরও অধিক; আকাশের অগণিত সুরের মধ্যে এক সপ্তক সুরমাত্র দেখিতে পাই। আকাশস্পন্দন প্রতি সেকেণ্ডে চারি শত লক্ষ কোটি বার হইলে চক্ষু তাহা রক্তিম আলো বলিয়া উপলব্ধি করে; কম্পন-সংখ্যা দ্বিগুণিত হইলে বেগুনী রঙ দেখিতে পাই। পীত, সবুজ ও নীলালোক এই এক সপ্তকের অন্তর্ভুক্ত। কম্পন-সংখ্যা চারি শত লক্ষ কোটির ঊর্ধ্বে উঠিলে চক্ষু পরাস্ত হয় এবং দৃশ্য তখন অদৃশ্যে মিলাইয়া যায়।

আকাশ-স্পন্দনেই আলোর উৎপত্তি, তাহা দৃশ্যই হউক অথবা অদৃশ্যই হউক। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই অদৃশ্য রশ্মি কি করিয়া ধরা যাইতে পারে, আর এই রশ্মি যে আলো তাহার প্রমাণ কি? এ বিষয়ের পরীক্ষা বর্ণনা করিব। জার্মান অধ্যাপক হার্টজ সর্বপ্রথমে বৈদ্যুতিক উপায়ে আকাশে ঊর্মি উৎপাদন করিয়াছিলেন। তবে তাঁহার ঢেউগুলি অতি বৃহদাকার বলিয়া সরল রেখায় ধাবিত না হইয়া বক্র হইয়া যাইত। দৃশ্য আলোক-রশ্মির সম্মুখে একখানি ধাতুফলক ধরিলে পশ্চাতে ছায়া পড়ে; কিন্তু আকাশের বৃহদাকার ঢেউগুলি ঘুরিয়া বাধার পশ্চাতে পৌঁছিয়া থাকে। জলের বৃহৎ

উর্মির সম্মুখে উপলখণ্ড ধরিলে এইরূপ হইতে দেখা যায়। দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোর প্রকৃতি যে একই তাহা সূক্ষ্মরূপে প্রমাণ করিতে হইলে অদৃশ্য আলোর উর্মি খর্ব করা আবশ্যক। আমি যে কল নির্মাণ করিয়াছিলাম তাহা হইতে উৎপন্ন আকাশোর্মির দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির ছয় ভাগের এক ভাগ মাত্র। এই কলে একটি ক্ষুদ্র লণ্ঠনের ভিতরে তড়িতোর্মি উৎপন্ন হয়। এক দিকে একটি খোলা নল ; তাহার মধ্য দিয়া অদৃশ্য আলো বাহির হয়। এই আলো আমরা দেখিতে পাই না, হয়তো অন্য কোনো জীবে দেখিতে পায়। পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, এই আলোকে উদ্ভিদ্ উত্তেজিত হইয়া থাকে।

অদৃশ্য আলো দেখিবার জন্য কৃত্রিম চক্ষু নির্মাণ করা আবশ্যক। আমাদের চক্ষুর পশ্চাতে স্নায়ু নির্মিত একখানি পর্দা আছে ; তাহার উপর আলো পতিত হইলে স্নায়ুসূত্র দিয়া উত্তেজনা-প্রবাহ মস্তিষ্কের বিশেষ অংশকে আলোড়িত করে এবং সেই আলোড়ন আলো বলিয়া অনুভব করি। কৃত্রিম চক্ষুর গঠন খানিকটা ঐরূপ। দুইখানি ধাতুখণ্ড পরস্পরের সহিত স্পর্শ করিয়া আছে। সংযোগস্থলে অদৃশ্য আলো পতিত হইলে সহসা আণবিক পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে এবং তাহার ফলে বিদ্যুৎস্রোত বহিয়া চুম্বকের কাঁটা নাড়িয়া দেয়। বোবা যেরূপ হাত নাড়িয়া সংকেত করে, অদৃশ্য আলো দেখিতে পাইলে কৃত্রিম চক্ষুও সেইরূপ কাঁটা নাড়িয়া আলোর উপলব্ধি জ্ঞাপন করে।

আলোর সাধারণ প্রকৃতি

এখন দেখা যাউক, দৃশ্য এবং অদৃশ্য আলোকের প্রকৃতি একবিধ অথবা বিভিন্ন। দৃশ্য আলোকের প্রকৃতি এই যে—

(১) ইহা সরল রেখায় ধাবিত হয়।

(২) ধাতুনির্মিত দর্পণে পতিত হইলে আলো প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে। রশ্মি প্রতিফলিত হইবারও একটা বিশেষ নিয়ম আছে।

(৩) আলোর আঘাতে আণবিক পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। সেইজন্য আলো-আহত পদার্থের স্বাভাবিক গুণ পরিবর্তিত হয়। ফোটোগ্রাফের প্লেটে যে ছবি পড়ে তাহাতে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে এবং ডেভেলাপার ঢালিলে ছবি ফুটিয়া উঠে।

(৪) সব আলোর রঙ এক নহে ; কোনো আলো লাল, কোনোটা পীত, কোনোটা সবুজ এবং কোনোটা নীল। বিভিন্ন পদার্থ নানা রঙের পক্ষে স্বচ্ছ কিংবা অস্বচ্ছ।

(৫) আলো বায়ু হইতে অন্য কোনো স্বচ্ছ পদার্থের উপর পতিত হইলে বক্রীভূত হয়। আলোর রশ্মি ত্রিকোণ কাচের উপর ফেলিলে ইহা স্পষ্টত দেখা যায়। কাচ-বর্তুলের ভিতর দিয়া আলো অক্ষীণভাবে দূরে প্রেরণ করা যাইতে পারে।

(৬) আলোর ঢেউয়ে সচরাচর কোনো শৃঙ্খলা নাই ; উহা সর্বমুখী ; অর্থাৎ কখনও ঊর্ধ্বাধঃ কখনও বা দক্ষিণে বামে স্পন্দিত হয়। স্ফটিকজাতীয় পদার্থ দ্বারা

আলোক-রশ্মির স্পন্দন শৃঙ্খলিত করা যাইতে পারে ; তখন স্পন্দন বহুমুখী না হইয়া একমুখী হয়। একমুখী আলোর বিশেষ ধর্ম পরে বলিব।

দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোর প্রকৃতি যে একই রূপ, এক্ষণে সেই পরীক্ষা বর্ণনা করিব।

প্রথমতঃ, অদৃশ্য আলোক যে সোজা পথে চলে তাহার প্রমাণ এই যে, বিদ্যুতোর্মি বাহির হইবার জন্য লণ্ঠনে যে নল আছে সেই নলের সম্মুখে সোজা লাইনে কৃত্রিম চক্ষু ধরিলে কাঁটা নড়িয়া উঠে। চক্ষুটিকে এক পাশে ধরিলে কোনো উত্তেজনার চিহ্ন দেখা যায় না।

দর্পণে যেরূপ দৃশ্য আলো প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে এবং সেই প্রত্যাবর্তন যে নিয়মাধীন, অদৃশ্য আলোকও সেইরূপে এবং সেই নিয়মে প্রতিহত হইয়া প্রত্যাবর্তন করে।

দৃশ্য আলোর আঘাতে আণবিক পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। অদৃশ্য আলোকও যে আণবিক পরিবর্তন ঘটায় তাহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

আলোর বিবিধ বর্ণ

পূর্বে বলিয়াছি যে, দৃশ্য আলোক নানা বর্ণের। অনুভূতির দ্বারা বর্ণের বিভিন্নতা সহজেই ধরিতে পারি ; কিন্তু বর্ণের বিভিন্নতা অনেকেই ধরিতে পারেন না। তাঁহারা বর্ণ সম্বন্ধে অন্ধ। বর্ণের বিভিন্নতা অন্য উপায়ে ধরা যাইতে পারে ; সে বিষয় পরে বলিব। এইখানে বলা আবশ্যক যে, মানুষের দৃষ্টি-সীমার ক্রমবিকাশ হইতেছে। বহু পূর্বপুরুষদের বর্ণজ্ঞান সংকীর্ণ ছিল, তাহা অন্ততঃ এক দিকে প্রসারিত হইয়াছে। আর অন্য দিকেও কোনোদিন প্রসারিত হইবে। তাহা হইলে এখন যাহা অদৃশ্য তখন তাহা দৃশ্যের মধ্যে আসিবে।

সে যাহা হউক, অদৃশ্য আলোর রঙ সম্বন্ধে কয়েকটি অদ্ভুত পরীক্ষা বর্ণনা করিব। জানালার কাচের কোনো বিশেষ রঙ নাই, সূর্যের আলো উহার ভিতর দিয়া অবাধে চলিয়া যায়। সুতরাং দৃশ্য আলোর পক্ষে কাচ স্বচ্ছ, জলও স্বচ্ছ। কিন্তু ইট-পাটকেল অস্বচ্ছ, আলকাতরা তদপেক্ষা অস্বচ্ছ। দৃশ্য আলোকের কথা বলিলাম। অদৃশ্য আলোকের সম্মুখে জানালার কাচ ধরিলে তাহার ভিতর দিয়া এইরূপ আলো সহজেই চলিয়া যায়। কিন্তু জলের গেলাস সম্মুখে ধরিলে অদৃশ্য আলো একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। কিমাশ্চর্যমতঃপরম্ ! তদপেক্ষাও আশ্চর্যের বিষয় আছে। ইট-পাটকেল, যাহা অস্বচ্ছ বলিয়া মনে করিতাম তাহা অদৃশ্য আলোকের পক্ষে স্বচ্ছ। আর আলকাতরা ? ইহা জানালার কাচ অপেক্ষাও স্বচ্ছ ! কোথায় এক অদ্ভুত দেশের কথা পড়িয়াছিলাম ; সে দেশে জলাশয় হইতে মৎস্যেরা ডাঙায় ছিপ ফেলিয়া মানুষ শিকার করে। অদৃশ্য আলোকের কার্যও যেন অনেকটা সেইরূপ অদ্ভুত হইবে।

কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। দৃশ্য আলোকেও এরূপ আশ্চর্য ঘটনা দেখিয়াছি ; তাহাতে অভ্যস্ত বলিয়া বিস্মিত হই না। সম্মুখের সাদা কাগজের উপর দুইটি বিভিন্ন

আলো-রেখা পতিত হইয়াছে ; একটি লাল আর একটি সবুজ। মাঝখানে জানালার কাচ ধরিলে উভয় আলোই অবাধে ভেদ করিয়া যায়। এবার মাঝখানে লাল কাচ ধরিলাম ; লাল আলো অবাধে যাইতেছে, কিন্তু সবুজ আলো বন্ধ হইল। সবুজ কাচ ধরিলে সবুজ আলো বাধা পাইবে না ; কিন্তু লাল আলো বন্ধ হইবে। ইহার কারণ এই যে, (১) সব আলো এক বর্ণের নহে ; (২) কোনো পদার্থ এক আলোর পক্ষে স্বচ্ছ হইতে পারে, কিন্তু অন্য আলোর পক্ষে অস্বচ্ছ। যদি বর্ণজ্ঞান না থাকিত তাহা হইলেও একই পদার্থের ভিতর দিয়া এক আলো যাইতেছে এবং অন্য আলো যাইতেছে না দেখিয়া নিশ্চয়রূপে বলিতে পারিতাম যে, দুইটি আলো বিভিন্ন বর্ণের। আলকাতরা দৃশ্য আলোর পক্ষে অস্বচ্ছ এবং অদৃশ্য আলোর পক্ষে স্বচ্ছ, ইহা জানিয়া অদৃশ্য আলোক যে অন্য বর্ণের তাহা প্রমাণিত হয়। আমাদের দৃষ্টিশক্তি প্রসারিত হইলে ইন্দ্রধনু অপেক্ষাও কল্পনাতীত অনেক নূতন বর্ণের অস্তিত্ব দেখিতে পাইতাম। তাহাতেও কি আমাদের বর্ণের তৃষ্ণা মিটিত ?

মৃত্তিকা-বর্তুল ও কাঁচ-বর্তুল

পূর্বে বলিয়াছি যে, আলো এক স্বচ্ছ বস্তু হইতে অন্য স্বচ্ছ বস্তুর উপর পতিত হইলে বক্রীভূত হয়। ত্রিকোণ কাচ কিংবা ত্রিকোণ ইষ্টকখণ্ড দ্বারা দৃশ্য ও অদৃশ্য আলো যে একই নিয়মের অধীন, তাহা প্রমাণ করা যায়। কাচ-বর্তুল সাহায্যে দৃশ্য আলোক যেরূপ বহুদূরে অক্ষীণভাবে প্রেরণ করা যাইতে পারে, অদৃশ্য আলোকও সেইরূপে প্রেরণ করা যায়। তবে এজন্য বহুমূল্য কাচ-বর্তুল নিষ্প্রয়োজন, ইট-পাটকেল দিয়াও এইরূপ বর্তুল নির্মিত হইতে পারে। প্রেসিডেন্সি কলেজের সম্মুখে যে ইষ্টকনির্মিত গোল স্তম্ভ আছে তাহা দিয়া অদৃশ্য আলো দূরে প্রেরণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। দৃশ্য আলো সংহত করিবার পক্ষে হীরকখণ্ডের অদ্ভুত ক্ষমতা। বস্তুবিশেষের আলো সংহত করিবার ক্ষমতা যেরূপ অধিক, আলো বিকিরণ করিবার ক্ষমতাও সেই পরিমাণে বহুল হইয়া থাকে। এই কারণেই হীরকের এত মূল্য। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, চীনা-বাসনের অদৃশ্য আলোক সংহত করিবার ক্ষমতা হীরক অপেক্ষাও অনেকগুণ অধিক। সুতরাং যদি কোনোদিন আমাদের দৃষ্টিশক্তি প্রসারিত হইয়া রক্তিম বর্ণের সীমা পার হয় তবে হীরক তুচ্ছ হইবে এবং চীনা বাসনের মূল্য অসম্ভবরূপে বাড়িবে। প্রথমবার বিলাত যাইবার সময় অভ্যস্ত কুসংস্কার হেতু চীনাবাসন স্পর্শ করিতে ঘৃণা হইত। বিলাতে সম্ভ্রান্ত ভবনে নিমন্ত্রিত হইয়া দেখিলাম যে, দেওয়ালে বহুবিধ চীনা-বাসন সাজানো রহিয়াছে। ইহার এমন কি মূল্য যে, এত যত্ন ? প্রথমে বুঝিতে পারি নাই, এখন বুঝিয়াছি ইংরেজ ব্যবসাদার। অদৃশ্য আলো দৃশ্য হইলে চীনা-বাসন অমূল্য হইয়া যাইবে। তখন তাহার তুলনায় হীরক কোথায় লাগে ! সেদিন শৌখিন রমণী-গণ হীরকমালা প্রত্যাখ্যান করিয়া পেয়ালাপিরিচের মালা সগর্বে পরিধান করিবেন এবং অচীনধারিণী নারীদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিবেন।

সর্বমুখী এবং একমুখী আলো

প্রদীপের অথবা সূর্যের আলো সর্বমুখী ; অর্থাৎ স্পন্দন একবার ঊর্ধ্বাধঃ অন্যবার দক্ষিণে বামে হইয়া থাকে। লঙ্কাদ্বীপের টুর্মালিন স্ফটিকের ভিতর দিয়া আলো প্রেরণ করিলে আলো একমুখী হইয়া যায়। দুইখানি টুর্মালিন সমান্তরালভাবে ধরিলে আলো দুইয়ের ভিতর দিয়া ভেদ করিয়া চলিয়া যায় ; কিন্তু একখানি অন্যখানির উপর আড়ভাবে ধরিলে আলো উভয়ের ভিতর দিয়া যাইতে পারে না।

অদৃশ্য আলোকেও এইরূপে একমুখী করা যাইতে পারে। কিরূপে তাহা হয় বুঝাইতে হইলে নীতি-কথার বক ও শৃগালের গল্প স্মরণ করা আবশ্যক। বক শৃগালকে নিমন্ত্রণ করিয়া পানীয় দ্রব্য গ্রহণ করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিল। লম্বা বোতলে পানীয় দ্রব্য রক্ষিত ছিল। বক লম্বা ঠোঁট দিয়া অনায়াসে পান করিল ; কিন্তু শৃগাল কেবলমাত্র সৃক্কনী লেহন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। পরের দিন শৃগাল ইহার প্রতিশোধ লইয়াছিল। পানীয় দ্রব্য থালাতে দেওয়া হইয়াছিল। বক ঠোঁট কাৎ করিয়াও কোনো প্রকারেই পানীয় শোষণ করিতে সমর্থ হয় নাই। বোতল ও থালার দ্বারা যেরূপে লম্বা ঠোঁট এবং চেপ্টা মুখের বিভিন্নতা বুঝা যায়, সেইরূপ একমুখী আলোকের পার্থক্য ধরা যাইতে পারে, তাহা লম্বা কিংবা চেপ্টা— ঊর্ধ্বাধঃ অথবা এ-পাশ ও-পাশ।

বক-কচ্ছপ সংবাদ

মনে কর, দুই দল জন্তু মাঠে চরিতেছে— লম্বা জানোয়ার বক ও চেপ্টা জীব কচ্ছপ। সর্বমুখী অদৃশ্য আলোকও এইরূপ দুই প্রকারের স্পন্দনসঞ্জাত। দুই প্রকারের জীবদিগকে বাছিবার সহজ উপায়, সম্মুখে লোহার গরাদ খাড়াভাবে রাখিয়া দেওয়া। জন্তুদিগকে তাড়া করিলে লম্বা বক সহজেই পার হইয়া যাইবে ; কিন্তু চেপ্টা কচ্ছপ গরাদের এ-পাশে থাকিবে। প্রথম বাধা পার হইবার পর বকবৃন্দের সম্মুখে যদি দ্বিতীয় গরাদ সমান্তরালভাবে ধরা যায়, তাহা হইলেও বক তাহা দিয়া গলিয়া যাইবে। কিন্তু দ্বিতীয় গরাদখানাকে যদি আড়ভাবে ধরা যায়, তাহা হইলে বক আটকাইয়া থাকিবে। এইরূপে একটি গরাদ অদৃশ্য আলোর সম্মুখে ধরিলে আলো একমুখী হইবে। দ্বিতীয় গরাদ সমান্তরালভাবে ধরিলে আলো উহার ভিতর দিয়াও যাইবে, তখন দ্বিতীয় গরাদটা আলোর পক্ষে স্বচ্ছ হইবে। কিন্তু দ্বিতীয় গরাদটা আড়ভাবে ধরিলে আলো যাইতে পারিবে না, তখন গরাদটা অস্বচ্ছ বলিয়া মনে হইবে। যদি আলো একমুখী হয় তাহা হইলে কোনো কোনো বস্তু একভাবে ধরিলে অস্বচ্ছ হইবে ; কিন্তু ৯০° ডিগ্রি ঘুরাইয়া ধরিলে তাহার ভিতর দিয়া আলো যাইতে পারিবে।

পুস্তকের পাতাগুলি গরাদের মতো সজ্জিত। বিলাতে রয়্যাল ইন্‌স্টিটিউসনে বক্তৃতা করিবার সময় টেবিলের উপর একখানা রেলের টাইম-টেব্‌ল্, অর্থাৎ ব্রাড্‌শ ছিল, তাহাতে ১০ হাজার ট্রেনের সময়, রেল-ভাড়া এবং অন্যান্য বিষয় ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রিত ছিল। উহা এরূপ জটিল যে, কাহারও সাধ্য নাই ইহা হইতে জ্ঞাতব্য বিষয় বাহির করিতে পারে। আমি পুস্তকের তমসাচ্ছন্নতা কিছু না মনে করিয়া পরীক্ষার সময়

দেখাইয়াছিলাম যে, বইখানাকে এরূপ করিয়া ধরিলে ইহার ভিতর দিয়া আলো যাইতে পারে না ; কিন্তু ৯০ ডিগ্রি ঘুরাইয়া ধরিলে পুস্তকখানা একেবারে স্বচ্ছ হইয়া যায়। পরীক্ষা দেখাইবামাত্র হাসির রোলে হল্ প্রতিধ্বনিত হইল। প্রথম প্রথম রহস্য বুঝিতে পারি নাই। পরে বুঝিয়াছিলাম। লর্ড রেলী আসিয়া বলিলেন যে, ব্রাড্শর ভিতর দিয়া এ পর্যন্ত কেহ আলোক দেখিতে পায় নাই। কি করিয়া ধরিলে আলো দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা শিখাইলে জগৎবাসী আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিবে। আমার বৈজ্ঞানিক লেখা পড়িয়া কেহ কেহ স্তম্ভিত হইবেন, দন্তস্ফুট অথবা চক্ষুস্ফুট করিতে সমর্থ হইবেন না। তাহা হইলে বইখানাকে ৯০° ডিগ্রি ঘুরাইয়া ধরিলেই সব তথ্য একবারে বিশদ হইবে।

আলো একমুখী করিবার অন্য এক উপায় আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। যদিও এলোমেলোভাবে আকাশ-স্পন্দন রমণীর কেশগুচ্ছে প্রবেশ করে, তথাপি বাহির হইবার সময় একবারে শৃংখলিত হইয়া থাকে। বিলাতের নরসুন্দরদের দোকান হইতে বহু জাতির কেশগুচ্ছ সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে ফরাসী মহিলার নিবিড় কৃষ্ণকুন্তল বিশেষ কার্যকরী। এ বিষয়ে জার্মান মহিলার স্বর্ণাভ কুন্তল অনেকাংশে হীন। প্যারিসে যখন এই পরীক্ষা দেখাই তখন সমবেত ফরাসী পণ্ডিতমণ্ডলী এই নূতন তত্ত্ব দেখিয়া উল্লাসিত হইয়াছিলেন। ইহাতে বৈরী জাতির উপর তাহাদের প্রাধান্য প্রমাণিত হইয়াছে, ইহার কোনো সন্দেহই রহিল না। বলা বাহুল্য, বার্লিনে এই পরীক্ষা প্রদর্শনে বিরত হইয়াছিলাম।

যে সব পরীক্ষা বর্ণনা করিলাম তাহা হইতে দেখা যায় যে, দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোর প্রস্তুতি একই, আমাদের দৃষ্টিশক্তির অসম্পূর্ণ, হেতু উহাদিগকে বিভিন্ন বলিয়া মনে করি।

তারহীন সংবাদ

অদৃশ্য আলোক ইট-পাটকেল, ঘর-বাড়ি ভেদ করিয়া অনায়াসেই চলিয়া যায়। সুতরাং ইহার সাহায্যে বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ করা যাইতে পারে। ১৮৯৫ সালে কলিকাতা টাউন হলে এ সম্বন্ধে বিবিধ পরীক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলাম। বাংলার লেফ্টেন্যান্ট গবর্নর স্যার উইলিয়াম ম্যাকেঞ্জি উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যুৎ-ঊর্মি তাঁহার বিশাল দেহ এবং আরও দুইটি রুদ্ধ কক্ষ ভেদ করিয়া তৃতীয় কক্ষে নানাপ্রকার তোল-পাড় করিয়াছিল। একটা লোহার গোলা নিক্ষেপ করিল, পিস্তল আওয়াজ করিল এবং বারুদ স্তূপ উড়াইয়া দিল। ১৯০৭ সালে মার্কনি তারহীন সংবাদ প্রেরণ করিবার পেটেন্ট গ্রহণ করেন। তাঁহার অত্যদ্ভুত অধ্যবসায় ও বিজ্ঞানের ব্যবহারিক উন্নতি-সাধনে কৃতিত্বের দ্বারা পৃথিবীতে এক নূতন যুগ প্রবর্তিত হইয়াছে। পৃথিবীর ব্যবধান একেবারে ঘুচিয়াছে। পূর্বে দূর দেশে কেবল টেলিগ্রাফের সংবাদ প্রেরিত হইত, এখন বিনা তারে সর্বত্র সংবাদ পৌঁছিয়া থাকে।

কেবল তাহাই নহে। মনুষ্যের কণ্ঠস্বরও বিনা তারে আকাশতরঙ্গ সাহায্যে সুদূরে শ্রুত হইতেছে। সেই স্বর সকলে শুনিতে পায় না, শুনিতে হইলে কর্ণ আকাশের

স্বরের সহিত মিলাইয়া লইতে হয়। এইরূপে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত অহোরাত্র কথাবার্তা চলিতেছে। কান পাতিয়া তবে একবার শোনো। 'কোথা হইতে খবর পাঠাইতেছ?' উত্তর—'সমুদ্র-গর্ভে', তিন শত হাত নীচে ডুবিয়া আছি। টর্পিডো দিয়া তিনখানা রণতরী ডুবাইয়াছি, আর দুইখানার প্রতীক্ষায় আছি।' আবার এ কি? একেবারে লক্ষ লক্ষ কামানের গর্জন শোনা যাইতেছে, অগ্ন্যুৎপাতে যেন মেদিনী বিদীর্ণ হইল। পরে জানিলাম মহাসাম্রাজ্য চূর্ণ হইয়াছে, কল্য হইতে পৃথিবীর ইতিহাস অন্যরকম হইবে। এই ভীষণ নিনাদের মধ্যেও মনুষ্য-কণ্ঠের কত মর্মবেদনাধ্বনি, কত মিনতি, কত জিজ্ঞাসা ও কত রকমের উত্তর শোনা যায়। ইহার মধ্যে কে একজন অবুঝের মতো বার বার একই নাম ধরিয়া ডাকিতেছে—'কোথায় তুমি—কোথায় তুমি?' কোনো উত্তর আসিল না— সে আর এই পৃথিবীতে নাই।

এইরূপ দূরদূরান্ত বাহিয়া আকাশের স্বর ধ্বনিত হইতেছে। মনে কর, কোনো অদৃশ্য অঙ্গুলি বৈদ্যুতিক অর্গ্যানের বিবিধ স্টপ আঘাত করিতেছে। বাম দিকের স্টপে আঘাত করাতে এক সেকেণ্ডে একটি স্পন্দন হইল। অমনি শূন্যমার্গে বিদ্যুৎ-ঊর্মি ধাবিত হইল। কি প্রকাণ্ড সেই সহস্র ক্রোশব্যাপী ঢেউ! উহা অনায়াসে হিমাচল উল্লঙ্ঘন করিয়া এক সেকেণ্ডে পৃথিবী দশবার প্রদক্ষিণ করিল। এবার অদৃশ্য অঙ্গুলি দ্বিতীয় স্টপ আঘাত করিল। এইবার প্রতি সেকেণ্ডে আকাশ দশবার স্পন্দিত হইল। এইরূপে আকাশের স্বর ঊর্ধ্ব হইতে ঊর্ধ্বতরে উঠিবে; স্পন্দনসংখ্যা এক হইতে দশ, শত, সহস্র, লক্ষ, কোটি গুণ বৃদ্ধি পাইবে। আকাশ-সাগরে নিমজ্জমান রহিয়া আমরা অগণিত ঊর্মি দ্বারা আহত হইব, কিন্তু ইহাতেও কোনো ইন্দ্রিয় জাগরিত হইবে না। আকাশ-স্পন্দন আরও ঊর্ধ্বে উঠুক তখন কিয়ৎক্ষণের জন্য তাপ অনুভূত হইবে। তাহার পর চক্ষু উত্তেজিত হইয়া রক্তিম, পীতাদি আলোক দেখিতে পাইবে। এই দৃশ্য আলোক এক সপ্তক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। স্বর আরও উচ্চে উঠিলে দৃষ্টিশক্তি পুনরায় পরাস্ত হইবে, অনুভূতি শক্তি আর জাগিবে না, ক্ষণিক আলোকের পরই অভেদ্য অন্ধকার।

তবে তো আমরা এই অসীমের মধ্যে একেবারে দিশাহারা, কতটুকুই বা দেখিতে পাই? একান্তই অকিঞ্চিৎকর! অসীম জ্যোতির মধ্যে অন্ধবৎ ঘুরিতেছি এবং ভগ্ন দিক্-শলাকা লইয়া পাহাড় লঙ্ঘন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। হে অনন্ত পথের যাত্রী, কি সম্বল তোমার?

সম্বল কিছুই নাই, আছে কেবল অন্ধ বিশ্বাস; যে বিশ্বাসবলে প্রবাল সমুদ্রগর্ভে দেহাস্থি দিয়া মহাদ্বীপ রচনা করিতেছে। জ্ঞান-সাম্রাজ্য এইরূপ অস্থিপাতে তিল তিল করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে। আঁধার লইয়া আরম্ভ, আঁধারেই শেষ, মাঝে দুই একটি ক্ষীণ আলো-রেখা দেখা যাইতেছে। মানুষের অধ্যবসায়-বলে ঘন কুয়াশা অপসারিত হইবে এবং একদিন বিশ্বজগৎ জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিবে।

[১৩২৮ সালের "মোসলেম ভারত" পত্রিকায় প্রকাশিত। অব্যক্তের শতবার্ষিকী সংস্করণের পাদটীকায় উল্লেখ রয়েছে, "সম্ভবত রচনাটি বহু পূর্বের"।]

ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে

আমাদের বাড়ির নিম্নেই গঙ্গা প্রবাহিত। বাল্যকাল হইতেই নদীর সহিত আমার সখ্য জন্মিয়াছিল। বৎসরের এক সময়ে কূল প্লাবন করিয়া জলস্রোত বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইত ; আবার হেমন্তের শেষে ক্ষীণ কলেবর ধারণ করিত। প্রতিদিন জোয়ার ভাঁটায় বারিপ্রবাহের পরিবর্তন লক্ষ্য করিতাম। নদীকে আমার একটি গতিপরিবর্তনশীল জীব বলিয়া মনে হইত। সন্ধ্যা হইলেই একাকী নদীতীরে আসিয়া বসিতাম। ছোটো ছোটো তরঙ্গগুলি তীরভূমিতে আছড়াইয়া পড়িয়া কুলুকুলু গীত গাহিয়া অবিশ্রান্ত চলিয়া যাইত। যখন অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আসিত এবং বাহিরের কোলাহল একে একে নীরব হইয়া যাইত তখন নদীর সেই কুলুকুলু ধ্বনির মধ্যে কত কথাই শুনিতে পাইতাম! কখনও মনে হইত, এই যে অজস্র জলধারা প্রতিদিন চলিয়া যাইতেছে ইহা তো কখনও ফিরে না ; তবে এই অনন্ত স্রোত কোথা হইতে আসিতেছে? ইহার কি শেষ নাই? নদীকে জিজ্ঞাসা করিতাম 'তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?' নদী উত্তর করিত 'মহাদেবের জটা হইতে।' তখন ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে উদিত হইত।

তাহার পর বড়ো হইয়া নদীর উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক ব্যাখ্যা শুনিয়াছি ; কিন্তু যখনই শ্রান্তমনে নদীতীরে বসিয়াছি তখনই সেই চিরাভ্যস্ত কুলুকুলু ধ্বনির মধ্যে সেই পূর্ব কথা শুনিতাম 'মহাদেবের জটা হইতে'।

একবার এই নদীতীরে আমার এক প্রিয়জনের পার্থিব অবশেষ চিতানলে ভস্মীভূত হইতে দেখিলাম। আমার সেই আজন্ম পরিচিত, বাৎসল্যের বাসমন্দির সহসা শূন্যে পরিণত হইল। সেই স্নেহের এক গভীর বিশাল প্রবাহ কোন্ অজ্ঞান ও অজ্ঞেয় দেশে বহিয়া চলিয়া গেল? যে যাই, সে তো আর ফিরে না ; তবে কি সে অনন্তকালের জন্য লুপ্ত হয়? মৃত্যুতেই কি জীবনের পরিসমাপ্তি! যে যায় সে কোথা যায়? আমার প্রিয়জন আজ কোথায়?

তখন নদীর কলধ্বনির মধ্যে শুনিতে পাইলাম, "মহাদেবের পদতলে।"

চতুর্দিক অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল, কুলুকুলু শব্দের মধ্যে শুনিতে পাইলাম, "আমরা যথা হইতে আসি, আবার তথায় ফিরিয়া যাই। দীর্ঘ প্রবাসের পর উৎসে মিলিত হইতে যাইতেছি।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথা হইতে আসিয়াছ, নদী?" নদী সেই পুরাতন স্বরে উত্তর করিল, "মহাদেবের জটা হইতে।"

একদিন আমি বলিলাম, "নদী, আজ বহুকাল অবধি তোমার সহিত আমর সখ্য।

পুরাতনের মধ্যে কেবল তুমি! বাল্যকাল হইতে এ পর্যন্ত তুমি আমার জীবন বেষ্টন করিয়া আছ, আমার জীবনের এক অংশ হইয়া গিয়াছ; তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ, জানি না। আমি তোমার প্রবাহ অবলম্বন করিয়া তোমার উৎপত্তিস্থান দেখিয়া আসিব।"

শুনিয়াছিলাম, উত্তর পশ্চিমে যে তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ দেখা যায় তথা হইতে জাহ্নবীর উৎপত্তি হইয়াছে। আমি সেই শৃঙ্গ লক্ষ্য করিয়া বহু গ্রাম, জনপদ ও বিজন অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলাম। যাইতে যাইতে কূর্মাচল নামক পুরাণপ্রথিত দেশে উপস্থিত হইলাম। তথা হইতে সরযূ নদীর উৎপত্তিস্থান দর্শন করিয়া দানবপুরে আসিলাম। তাহার পর পুনরায় বহুল গিরিগহন লঙ্ঘনপূর্বক উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

একদিন অতীব বন্ধুর পার্বত্য পথে চলিতে পরিশ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িলাম। আমার চতুর্দিকে পর্বতমালা, তাহাদের পার্শ্বদেশে নিবিড় অরণ্যানী; এক অভ্রভেদী শৃঙ্গ তাহার বিরাট দেহদ্বারা পশ্চাতের দৃশ্য অন্তরাল করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান। আমার পথ-প্রদর্শক বলিল, "এই শৃঙ্গে উঠিলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। নিম্নে যে রজতসূত্রের ন্যায় রেখা দেখা যাইতেছে উহাই বহুদেশ অতিক্রম করিয়া তোমাদের দেশে অতি বেগবতী, কূলপ্লাবিনী স্রোতস্বতী মূর্তি ধারণ করিয়াছে। সম্মুখস্থ শিখরে আরোহণ করিলেই দেখিতে পাইবে, এই সূক্ষ্ম সূত্রের আরম্ভ কোথায়।"

এই কথা শুনিয়া আমি সমুদয় পথশ্রম বিস্মৃত হইয়া নব উদ্যমে পর্বতে আরোহণ করিতে লাগিলাম।

আমার পথ-প্রদর্শক হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "সম্মুখে দেখো, জয় নন্দাদেবী! জয় ত্রিশূল!"

কিয়ৎক্ষণ পূর্বে পর্বতমালা আমার দৃষ্টি অবরোধ করিয়াছিল। এখন উচ্চতর শৃঙ্গে আরোহণ করিবামাত্র আমার সম্মুখের আবরণ অপসৃত হইল। দেখিলাম, অনন্ত প্রসারিত নীল নভোমণ্ডল। সেই নিবিড় নীলস্তর ভেদ করিয়া দুই শুভ্র তুষারমূর্তি শূন্যে উত্থিত হইয়াছে। একটি গরীয়সী রমণীর ন্যায়—মনে হইল যেন আমার দিকে সস্নেহ প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। যাঁহার বিশাল বক্ষে বহুজীব আশ্রয় ও বৃদ্ধি পাইতেছে, এই মূর্তি সেই মাতৃরূপিণী ধরিত্রীর বলিয়া চিনিলাম। ইহার অনতিদূরে মহাদেবের ত্রিশূল পাতালগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া মেদিনী বিদারণপূর্বক শাণিত অগ্রভাগ দ্বারা আকাশ বিদ্ধ করিতেছে। ত্রিভুবন এই মহাস্ত্রে গ্রথিত।[১]

---

১ কুমায়ুনের উত্তরে দুই তুষার শিখর দেখা যায়। একটির নাম নন্দাদেবী, অপরটি ত্রিশূল নামে খ্যাত।

এইরূপে পরস্পরের পার্শ্বে সৃষ্ট জগৎ ও সৃষ্টিকর্তার হস্তের আয়ুধ সাকাররূপে দর্শন করিলাম। এই ত্রিশূল যে স্থিতি ও প্রলয়ের চিহ্নরূপী তাহা পরে বুঝিলাম।

আমার পথ-প্রদর্শক বলল "সম্মুখে এখনও দীর্ঘ পথ রহিয়াছে। উহা অতীব দুর্গম ; দুই দিন চলিলে পর তুষার নদী দেখিতে পাইবে।"

সেই দুই দিন বহু বন ও গিরিসংকট অতিক্রম করিয়া অবশেষে তুষারক্ষেত্রে উপনীত হইলাম। নদীর ধবল সূত্রটি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া এ পর্যন্ত আসিয়াছিল, কল্লোলিনীর মৃদু গীত এতদিন কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল, সহসা যেন কোন্ ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্র প্রভাবে সে গীত নীরব হইল, নদীর তরল নীর অকস্মাৎ কঠিন নিস্তব্ধ তুষারে পরিণত হইল। ক্রমে দেখিলাম স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড ঊর্মিমালা প্রস্তরীভূত হইয়া রহিয়াছে, যেন ক্রীড়াশীল চঞ্চল তরঙ্গগুলিকে কে 'তিষ্ঠ' বলিয়া অচল করিয়া রাখিয়াছে। কোন্ মহাশিল্পী যেন সমগ্র বিশ্বের স্ফটিকখনি নিঃশেষ করিয়া এই বিশালক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের মূর্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

দুই দিকে উচ্চ পর্বতশ্রেণী, বহুদূর প্রসারিত সেই পর্বতের পাদমূল হইতে উত্তুঙ্গ ভৃগুদেশ পর্যন্ত অগণ্য উন্নত বৃক্ষ নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে। শিখরতুষারনিঃসৃত জলধারা বঙ্কিম গতিতে নিম্নস্থ উপত্যকায় পতিত হইতেছে। সম্মুখে নন্দাদেবী ও ত্রিশূল এখন আর স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। মধ্যে ঘন কুজ্ঝটিকা ; এই যবনিকা অতিক্রম করিলেই দৃষ্টি অবারিত হইবে।

তুষার-নদীর উপর দিয়া ঊর্ধ্বে আরোহণ করিতে লাগিলাম। এই নদী ধবল-গিরির উচ্চতম শৃঙ্গ হইতে আসিতেছে। আসিবার সময়ে পর্বতদেহ ভগ্ন করিয়া প্রস্তর স্তূপ বহন করিয়া আনিতেছে। সেই প্রস্তরস্তূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। অতি দুরারোহ স্তূপ হইতে স্তূপান্তরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যত ঊর্ধ্বে উঠিতেছি বায়ুস্তর ততই ক্ষীণতর হইতেছে ; সেই ক্ষীণ বায়ু দেবধূপের সৌরভে পরিপূর্ণ। ক্রমে শ্বাস-প্রশ্বাস কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল, শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল ; অবশেষে হত-চেতনপ্রায় হইয়া নন্দাদেবীর পদতলে পতিত হইলাম।

সহসা শত শত শঙ্খনাদ একত্রে কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। অর্ধোন্মীলিত নেত্রে দেখিলাম— সমগ্র পর্বত ও বনস্থলীতে পূজার আয়োজন হইয়াছে। জলপ্রপাতগুলি যেন সুবৃহৎ কমণ্ডলু-মুখ হইতে পতিত হইতেছে ; সেই সঙ্গে পারিজাত বৃক্ষ সকল স্বতঃ পুষ্পবর্ষণ করিতেছে। দূরে দিক আলোড়ন করিয়া শঙ্খধ্বনির ন্যায় গভীর ধ্বনি উঠিতেছে। ইহা শঙ্খধ্বনি, কি পতনশীল তুষার-পর্বতের বজ্রনিনাদ স্থির করিতে পারিলাম না।

কতক্ষণ পরে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে হৃদয় উচ্ছ্বসিত ও দেহ পুলকিত হইয়া উঠিল। এতক্ষণ যে কুজ্ঝটিকা নন্দাদেবী ও ত্রিশূল আচ্ছন্ন করিয়াছিল তাহা ঊর্ধ্বে উত্থিত হইয়া শূন্যমার্গ আশ্রয় করিয়াছে। নন্দাদেবীর শিরোপরি এক অতি বৃহৎ ভাস্বর জ্যোতিঃ বিরাজ করিতেছে ; তাহা একান্ত দুর্নিরীক্ষ্য। সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ হইতে নির্গত ধূমরাশি দিগ্দিগন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। তবে এই

কি মহাদেবের জটা? এই পৃথিবীরূপিনী নন্দাদেবীকে চন্দ্রাতপের ন্যায় আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। এই জটা হইতে হীরককণার তুল্য তুষারকণাগুলি নন্দাদেবীর মস্তকে উজ্জ্বল মুকুট পরাইয়া দিয়াছে। এই কঠিন হীরককণাই ত্রিশূলাগ্র শাণিত করিতেছে।

শিব ও রুদ্র! রক্ষক ও সংহারক! এখন ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। মানস-চক্ষে উৎস হইতে বারিকণার সাগরোদ্দেশে যাত্রা ও পুনরায় উৎসে প্রত্যাবর্তন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। এই মহাচক্রপ্রবাহিত স্রোতে সৃষ্টি ও প্রলয়-রূপ পরস্পরের পার্শ্বে স্থাপিত দেখিলাম।

সম্মুখে আকাশভেদী যে পর্বতশ্রেণী দেখিতেছি, হিমাণুরূপ বারিকণা উহাদের শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে। প্রবেশ করিয়া মহাবিক্রমে উহাদের দেহ বিদীর্ণ করিতেছে। চ্যুত শিখর বজ্রনিনাদে নিম্নে পতিত হইতেছে।

বারিকণারাই নিম্নে শুভ্র তুষার-শয্যা রচনা করিয়া রাখিয়াছে। ভগ্ন শৈল এই তুষার-শয্যায় শায়িত হইল। তখন কণাগুলি একে অন্যকে ডাকিয়া বলিল, "আইস, আমরা ইহার অস্থি দিয়া পৃথিবীর দেহ নূতন করিয়া নির্মাণ করি।"

কোটি কোটি ক্ষুদ্র হস্ত অসংখ্য অণুপ্রমাণ শক্তির মিলনে অনায়াসে সেই পর্বতভার বহিয়া নিম্নে চলিল। কোনো পথ ছিল না; পতিত পর্বতখণ্ডের ঘর্ষণেই পথ কাটিয়া লইল— উপত্যকা রচিত হইল। পর্বতগাত্রে ঘর্ষিত হইতে হইতে উপলস্তূপ চূর্ণীকৃত হইল।

আমি যে স্থানে বসিয়া আছি তাহার উভয়তঃ তুষার বাহিত প্রস্তরখণ্ড রাশীকৃত রহিয়াছে। ইহার নিম্নেই তুষারকণা তরলাকৃতি ধারণ করিয়া ক্ষুদ্র সারিতে পরিণত হইয়াছে। এই সরিৎ পর্বতের অস্থিচূর্ণ বহন করিয়া গিরিদেশ অতিবর্তন করিয়া বহুল সমৃদ্ধ নগর ও জনপদের মধ্য দিয়া সাগরোদ্দেশে প্রবাহিত হইতেছে।

পথে একস্থানে উভয় কূলস্থ দেশ মরুভূমি-প্রায় হইয়াছিল। নদীতট উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশ প্লাবিত করিল। পর্বতের অস্থিচূর্ণ সংযোগে মৃত্তিকার উর্বরাশক্তি বর্ধিত হইল। কঠিন পর্বতের দেহাবশেষ দ্বারা বৃক্ষলতার সজীব শ্যামদেহ নির্মিত হইল।

বারিকণাগণই বৃষ্টিরূপে পৃথিবী ধৌত করিতেছে এবং মৃত ও পরিত্যক্ত দ্রব্য বহন করিয়া সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিতেছে। তথায় মনুষ্যচক্ষুর অগোচরে নূতন রাজ্যের সৃষ্টি হইতেছে।

সমুদ্রে মিলিত বারিকণাকুল সর্বদা বিতাড়িত হইয়া বেলাভূমি ভগ্ন করিতেছে।

জলকণা কখনও ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া পাতালপুরস্থ অগ্নিকুণ্ডে আহুতি স্বরূপ হইতেছে। সেই মহাযজ্ঞোত্থিত ধূমরাশি পৃথিবী বিদারণ করিয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গাররূপে প্রকাশ পাইতেছে। সেই মহাতেজে পৃথিবী কম্পিত হইতেছে; ঊর্ধ্ব ভূমি অতলে নিমজ্জিত ও সমুদ্রতল উন্নত হইয়া নূতন মহাদেশ নির্মিত হইতেছে।

সমুদ্রে পতিত হইয়াও বারিবিন্দুগণের বিশ্রাম নাই। সূর্যের তেজে উত্তপ্ত হইয়া ঊর্ধ্বে উড্ডীন হইতেছে। ইহারাই একদিন অশনি ও ঝঞ্ঝা-বলে পর্বত-শিখরাভিমুখে

ধাবিত হইয়া তথায় বিপুল জটাজালের মধ্যে আশ্রয় লইবে ; আবার কালক্রমে বিশ্রামান্তে পর্বতপৃষ্ঠে তুহিনাকারে পতিত হইবে। এই গতির বিরাম নাই, শেষ নাই !

এখনও ভাগীরথী-তীরে বসিয়া তাঁহার কুলুকুলু ধ্বনি শ্রবণ করি। এখনও তাহাতে পূর্বের ন্যায় কথা শুনিতে পাই। এখন আর বুঝিতে ভুল হয় না।

'নদী, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ ?' ইহার উত্তরে এখন সুস্পষ্ট স্বরে শুনিতে পাই—

'মহাদেবের জটা হইতে।'

[প্রবন্ধটির রচনাকাল ইং ১৮৯৪ সাল। তারিখটি অব্যক্তের প্রথম সংস্করণে লিপিবদ্ধ আছে। ইং ১৮৯৫ সালের এপ্রিলে 'দাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত। সে সময় এই একটি প্রবন্ধই জগদীশচন্দ্রকে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছিল। ১৮৯৩ সালে জগদীশচন্দ্র আলমোড়া বেড়াতে গিয়ে তুষার নদী (Glacier) দেখতে যান। রচনাটি তারই বর্ণনা। জগদীশচন্দ্রের ১৮৯৩ সালের পকেট ডায়রীতে সে ভ্রমণের কিছু তথ্য সম্প্রতি পাওয়া গেছে। ডায়রীর যে পাতায় তিনি তথ্য সংগ্রহ শুরু করেছিলেন তার তারিখ ২৩শে মে ১৮৯৩ সাল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জগদীশচন্দ্র সঙ্গে প্লেটক্যামেরা নিয়ে গিয়েছিলেন। ডায়রীতে ফটো তোলার বেশ কিছু হিসাবও লেখা রয়েছে।

এই প্রবন্ধটি সম্পর্কে সেকালের "সাহিত্য" পত্রিকার সম্পাদক বলেছিলেন, "...লেখক কবিতার ভাষায়, গানের ঝঙ্কারে, বিজ্ঞানের গভীর তত্ত্ব গল্পের মত বর্ণনা করিয়াছেন।"

নির্বাক্ জীবন

ঘর হইতে বাহির হইলেই চারি দিক ব্যাপিয়া জীবনের উচ্ছ্বাস দেখিতে পাই। সেই জীবন একেবারে নিঃশব্দ। শীত ও গ্রীষ্ম, মলয় সমীর ও ঝটিকা, বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি, আলো ও আঁধার এই নির্বাক্ জীবন লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। কত বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ, কত প্রকারের আঘাত ও কত প্রকারের আভ্যন্তরিক সাড়া এই স্থির, এই নিশ্চলবৎ জীবন-প্রতিমার ভিতরে কত অদৃশ্য ক্রিয়া চলিতেছে! কি প্রকারে এই অপ্রকাশকে সুপ্রকাশ করিব?

গাছের প্রকৃত ইতিহাস সমুদ্ধার করিতে হইলে গাছের নিকটই যাইতে হইবে। সেই ইতিহাস অতি জটিল এবং বহু রহস্যপূর্ণ। সেই ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইলে বৃক্ষ ও যন্ত্রের সাহায্যে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মুহূর্তে মুহূর্তে তাহার ক্রিয়াকলাপ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। এই লিপি বৃক্ষের স্বলিখিত এবং স্বাক্ষরিত হওয়া চাই। ইহাতে মানুষের কোনো হাত থাকিবে না; কারণ মানুষ তাহার স্বপ্রণোদিত ভাব দ্বারা অনেক সময় প্রতারিত হয়।

এই যে তিল তিল করিয়া বৃক্ষশিশুটি বাড়িতেছে, যে বৃদ্ধি চক্ষে দেখা যায় না, মুহূর্তের মধ্যে কি প্রকারে তাহাকে পরিমাণের মধ্যে ধরিয়া দেখাইতে পারিব? সেই বৃদ্ধি বাহিরের আঘাতে কি নিয়মে পরিবর্তিত হয়? আহার দিলে কিংবা আহার বন্ধ করিলে কি পরিবর্তন হয় এবং সেই পরিবর্তন আরম্ভ হইতে কত সময় লাগে? ঔষধ সেবনে কিংবা বিষ প্রয়োগে কি পরিবর্তন উপস্থিত হয়? এক বিষ দ্বারা অন্য বিষের প্রতিকার করা যাইতে পারে কি? বিষের মাত্রা প্রয়োগে কি ফলের বৈপরীত্য ঘটে?

তাহার পর গাছ বাহিরের আঘাতে যদি কোনোরূপ সাড়া দেয় তবে সেই আঘাত অনুভব করিতে কত সময় লাগে? সেই অনুভব-কাল ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় কি পরিবর্তিত হয়? সে সময়টা কি গাছকে দিয়া লিখাইয়া লইতে পারা যায়? বাহিরের আঘাত ভিতরে কি করিয়া পেঁছে? স্নায়ুসূত্র আছে কি? যদি থাকে তবে স্নায়ুর উত্তেজনাপ্রবাহ কিরূপ বেগে ধাবিত হয়? কোন্ অনুকূল ঘটনায় সেই প্রবাহের গতি বৃদ্ধি হয়? কোন্ প্রতিকূল অবস্থায় নিবারিত অথবা নিরস্ত হয়? আমাদের স্নায়বিক ক্রিয়ার সহিত বৃক্ষের ক্রিয়ার কি সাদৃশ্য আছে? সেই গতি ও সেই গতির পরিবর্তন কোনো প্রকারে কি স্বতঃলিখিত হইতে পারে? জীবে হৃৎপিণ্ডের ন্যায় যেরূপ স্পন্দনশীল পেশী আছে, উদ্ভিদে কি তাহা আছে? স্বতঃস্পন্দনের অর্থ কি? পরিশেষে যখন মৃত্যুর প্রবল আঘাতে বৃক্ষের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়, সেই নির্বাণ-

মুহূর্তে কি ধরিতে পারা যায় এবং সেই মুহূর্তে কি বৃক্ষ কোনো একটা প্রকাণ্ড সাড়া দিয়া চিরকালের জন্য নিদ্রিত হয় ?

এই সব বিবিধ অধ্যায়ের ইতিহাস বিবিধ যন্ত্র দ্বারা অবিচ্ছিন্নভাবে লিপিবন্ধ হইলেই গাছের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার হইবে।

তরুলিপি

জীব কোনোরূপ আঘাত পাইলে চকিত হয়। সেই সংকোচনই জীবনের সাড়া। জীবনের পরিপূর্ণ অবস্থায় সাড়া বৃহৎ হয়, অবসাদের সময় ক্ষীণ হয় এবং মৃত্যুর পর সাড়ার অবসান হয়। বৃক্ষও আহত হইলে ক্ষণিকের জন্য সংকুচিত হয় ; কিন্তু সেই সংকোচন স্বল্প বলিয়া সচরাচর দেখিতে পাই না। কলের সাহায্যে সেই স্বল্প আকুঞ্চন বৃহদাকারে লিপিবন্ধ হইতে পারে। ইহার বাধা এই যে, বৃক্ষের আকুঞ্চন-শক্তি অতি ক্ষীণ এবং সাড়া লিখিত হইবার সময় লেখনীফলকের ঘর্ষণে থামিয়া যায়। এই বাধা দূর করিবার জন্য 'সমতাল' যন্ত্র আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। যদি দুই বিভিন্ন বেহালার তার একই স্বরে বাঁধা যায় তাহা হইলে একটি তার বাজাইলে অন্য তারটি সমতালে ঝংকার দিয়া থাকে। তরুলিপিযন্ত্রে লেখনী লৌহতারে নির্মিত এবং এই তারটি বাহিরের অন্য তারের সহিত এক স্বরে বাঁধা। মনে কর, দুইটি তারই প্রতি সেকেন্ডে একশত বার কম্পিত হয়। বাহিরের তার বাজাইলে লেখনীও একশত বার স্পন্দিত হইবে এবং ফলকে একশত বিন্দু অঙ্কিত করিবে। এইরূপে ফলকের সহিত ক্রমাগত ঘর্ষণের বাধা দূরীভূত হয়। ইহা ব্যতীত সাড়া-লিপিতে সময়ের সূক্ষ্মাংশ পর্যন্ত নিরূপিত হয় ; কারণ এক বিন্দু ও পরবর্তী বিন্দুর মধ্যে এক সেকেন্ডের শতাংশের ব্যবধান।

গাছ লাজুক কি অ-লাজুক

পরীক্ষার ফল বর্ণনা করিবার পূর্বে তরুজাতিকে যে লাজুক ও অ-লাজুক, সসাড় ও অসাড় বলিয়া দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে সেই কুসংস্কার দূর করা আবশ্যক। সব গাছই যে সাড়া দেয় তাহা বৈদ্যুতিক উপায়ে দেখানো যাইতে পারে। তবে কেবল লজ্জাবতী লতাই কেন পাতা নাড়িয়া সাড়া দেয়, সাধারণ গাছ কেন দেয় ইহা বুঝিতে হইলে ভাবিয়া দেখুন যে, আমাদের বাহুর এক পাশের মাংসপেশীর সংকোচন দ্বারাই হাত নাড়িয়া সাড়া দেয়। উভয় দিকের মাংসপেশীই যদি সংকুচিত হইত তবে হাত নড়িত না। সাধারণ বৃক্ষের চতুর্দিকের পেশী আহত হইয়া সমভাবে সংকুচিত হয় ; তাহার ফলে কোনো দিকেই নড়া হয় না। কিন্তু এক দিকের পেশী যদি ক্লোরোফরম্ দিয়া অসাড় করিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে সাধারণ গাছের সাড়া দিবার শক্তিও সহজেই প্রমাণিত হয়।

অনন্নুভূতি কাল নিরূপণ

জীব যখন আহত হয় ঠিক সেই মুহূর্তে সাড়া দেয় না। ভেকের পায়ে চিমটি কাটিলে সাড়া পাইতে তার ন্যূনাধিক সেকেণ্ডের শত ভাগের এক ভাগ সময় লাগে। ইংরেজি ভাষ্যে এই সময়টুকু 'লেটেণ্ট পিরিয়ড্'। 'অননুভূতি-সময়' ইহার প্রতিশব্দ-রূপে ব্যবহৃত হইল।

বাহিরের অবস্থা অনুসারে এই অননুভূতি-কালের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। মৃদু আঘাত অনুভব করিতে একটু সময় লাগে, কিন্তু প্রচণ্ড আঘাত অনুভব করিতে একটু বেশি সময়ের অপব্যয় হয় না। আর যখন শীতে জীব আড়ষ্ট থাকে তাহার অনুভূতি কাল তখন দীর্ঘ হইয়া পড়ে। আমরা যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ি তখনও অনুভূতি করিবার পূর্বকাল একান্ত দীর্ঘ হইয়া পড়ে, এমন-কি সে সময়ে কখনও কখনও একেবারেই অনুভবশক্তি লোপ পায়। গাছের অনুভূতি সম্বন্ধে এই একই প্রথা। লজ্জাবতীর তাজা অবস্থায় অননুভূতি-কাল সেকেণ্ডের শতাংশের ছয় ভাগ। উদ্যমশীল ভেকের তুলনায় কেবলমাত্র ছয় গুণ বেশি। আর একটি আশ্চর্য বিষয় এই যে, স্থূলকায় বৃক্ষ দিব্য ধীরে সুস্থে সাড়া দিয়া থাকে। কিন্তু কৃশকায়টি একেবারে সপ্তমে চড়িয়া বসে। মনুষ্যলোকেও ইহার সাদৃশ্য আছে কিনা, আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

শীতে গাছের অননুভূতি-কাল প্রায় দ্বিগুণ দীর্ঘ হইয়া পড়ে। আঘাতের পর গাছের প্রকৃতিস্থ হইতে প্রায় পনেরো মিনিট লাগে। তাহার পূর্বে আঘাত করিলে অননুভূতি-সময় প্রায় দেড় গুণ দীর্ঘ হয়। অধিক ক্লান্ত হইলে অনুভূতিশক্তির সাময়িক লোপ হয়, তখন গাছ একেবারেই সাড়া দেয় না। এ অবস্থাটি যে কিরূপ অবস্থা, আমার দীর্ঘ বক্তৃতার পর তাহা আপনারা সহজেই হৃদয়ংগম করিতে পারিবেন।

সাড়ার মাত্রা

সময়ভেদে একই আঘাতে সাড়ার প্রবলতার তারতম্য ঘটে। সকাল বেলা রাত্রির নিশ্চেষ্টতা-জনিত গাছের একটু জড়তা থাকে। আঘাতের পর আঘাতে সে জড়তা চলিয়া যায় এবং সাড়ার মাত্রা ক্রমে বাড়িতে থাকে; সেটা যেন জাগরণের অবস্থা। গরম জলে স্নান করাইয়া লইলে গাছের জড়তা শীঘ্রই দূর হয়। বিকাল বেলা এ সব উল্টা হইয়া যায়; ক্লান্তিবশতঃ সাড়া ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইতে থাকে। কিন্তু বিশ্রামের জন্য সময় দিলে সেই ক্লান্তি চলিয়া যায়। আঘাতের মাত্রা বাড়াইলে সাড়ার মাত্রাও বাড়িতে থাকে; কিন্তু তাহারও একটা সীমা আছে। এ বিষয়ে মানুষের সহিত গাছের প্রভেদ নাই। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শীতকালে ঘা খাইলে যেমন সারিতে আমাদের অনেকটা সময় লাগে, শীতকালে গাছেরও আঘাত খাইয়া প্রকৃতিস্থ হইতে অনেক বিলম্ব ঘটে। গ্রীষ্মকালে যাহা পনেরো মিনিটে সারিয়া যায় তাহা সারিতে শীতকালে আধ ঘণ্টার অধিক লাগে।

বৃক্ষে উত্তেজনাপ্রবাহ

জন্তুদেহে এক স্থানে আঘাত করিলে আঘাতের ধাক্কা স্নায়ু দ্বারা দূরে পেঁছে। স্নায়বীয় প্রবাহের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে। প্রথমতঃ, স্নায়বীয় বেগ বিধির অবস্থায় হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়। উষ্ণতায় বেগ বৃদ্ধি এবং শৈত্যে বেগ হ্রাস পায়। এতদ্ব্যতীত বিদ্যুৎপ্রবাহে স্নায়ুতে কতকগুলি বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। যতক্ষণ স্নায়ু দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিতে থাকে ততক্ষণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা ঘটে না। কিন্তু বিদ্যুৎপ্রবাহ প্রেরণ এবং বন্ধ করিবার সময় কোনো বিশেষ স্থলে উত্তেজনা এবং অন্য স্থানে অবসাদ পরিলক্ষিত হয়। বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিবার মুহূর্তে যে স্থান দিয়া বিদ্যুৎ স্নায়ুসূত্র পরিত্যাগ করে সেই স্থলেই স্নায়ু হঠাৎ উত্তেজিত হয়। এতদ্ব্যতীত যদি স্নায়ুর কোনো অংশে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালনা করা যায় তবে সেই অংশ দিয়া আর কোনো সংবাদ যাইতে পারে না। কিন্তু বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ করিলে অমনি রুদ্ধ পথ খুলিয়া যায়, স্নায়ুসূত্র পুনরায় সংবাদবাহক হয়।

যন্ত্রের সাহায্যে বৃক্ষদেহেও যে স্নায়বীয় সংবাদ প্রেরিত হয় তাহা অতি সূক্ষ্মভাবে ধরা যাইতে পারে এবং একই কলের সাহায্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সংবাদ পেঁছিতে কত সময় লাগে তাহাও নির্ণীত হয়। স্নায়বীয় বেগ বৃক্ষদেহে ভেকদেহের তুলনায় মন্থর ; কিন্তু নিম্নজাতীয় জন্তু হইতে দ্রুত। প্রাণী ও উদ্ভিদে নয় ডিগ্রি উষ্ণতায় স্নায়ুবেগ প্রায় দ্বিগুণ বর্ধিত হয়। বিদ্যুৎপ্রবাহের আরম্ভকালে বৃক্ষস্নায়ুর এক স্থান উত্তেজিত, অন্য স্থল অবসাদিত হয়। বিদ্যুৎপ্রবাহ-দ্বারা বৃক্ষের স্নায়বীয় ধাক্কা হঠাৎ বন্ধ হয়। স্নায়ু সম্বন্ধে যত প্রকার পরীক্ষা আছে, সমস্ত পরীক্ষা-দ্বারা জীব ও উদ্ভিদে যে এ সম্বন্ধে কোনো ভেদ নাই তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

স্বতঃস্পন্দন

জীবদেহে অংশ বিশেষে একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়। মানুষ এবং অন্যান্য জীবে এরূপ পেশী আছে তাহা আপনা-আপনি স্পন্দিত হয়। যত কাল জীবন থাকে তত কাল হৃদয় অহরহ স্পন্দিত হইতেছে। কোনো ঘটনাই বিনা কারণে ঘটে না। কিন্তু জীবস্পন্দন কি করিয়া স্বতঃসিদ্ধ হইল ? এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

তবে উদ্ভিদেও এইরূপ স্বতঃস্পন্দন দেখা যায়। তাহার অনুসন্ধানফলে সম্ভবত জীবস্পন্দন-রহস্যের কারণ প্রকাশিত হইবে।

শারীরতত্ত্ববিদেরা মানুষের হৃদয় জানিতে যাইয়া ভেক ও কচ্ছপের হৃদয় লইয়া খেলা করেন। হৃদয় জানা কথাটি শারীরিক অর্থে ব্যবহার করিতেছি, কবিতার অর্থে নহে। সমস্ত ব্যাঙটিকে লইয়া পরীক্ষা সুবিধাজনক নহে ; এজন্য তাঁহারা হৃদয়টিকে কাটিয়া বাহির করেন, পরীক্ষা করেন কি কি অবস্থায় হৃদয়-গতির হ্রাস-বৃদ্ধি হয়।

হৃদয় কাটিয়া বাহির করিলে তাহার স্বাভাবিক স্পন্দন বন্ধ হইবার উপক্রম হয়।

তখন সূক্ষ্ম নল দ্বারা হৃদয়ে রক্তের চাপ দিলেই স্পন্দন ক্রিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া অক্ষুণ্ণ গতিতে চলিতে থাকে। এ সময়ে উত্তাপিত করিলে হৃদয়স্পন্দন অতি দ্রুতবেগে সম্পাদিত হয়; কিন্তু ঢেউগুলি খর্বকার হয়। শৈত্যের ফল ইহার বিপরীত। নানাবিধ ভৈষজ্য দ্বারা হৃদয়ের স্বাভাবিক তাল বিভিন্ন রূপে পরিবর্তিত হয়। ইথার প্রয়োগে ক্ষণিকের জন্য হৃদয়স্পন্দন স্থগিত হয়, হাওয়া করিলে সেই অচৈতন্য অবস্থা চলিয়া যায়। ক্লোরোফরমের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত সাংঘাতিক। মাত্রাধিক্য হইলেই হৃদয়ক্রিয়া একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত বিবিধ বিষপ্রয়োগে হৃদয়স্পন্দন বন্ধ হয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে এক আশ্চর্য রহস্য এই যে, কোনো বিষে হৃদয়স্পন্দন সংকুচিত অবস্থায়, অন্য বিষে ফুল্ল অবস্থায় নিস্পন্দিত হয়। এইরূপ পরস্পরবিরোধী এক বিষ দ্বারা অন্য বিষের ক্রিয়া ক্ষয় হইতে পারে।

জীবের স্বতঃস্পন্দন সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই কয়টি প্রধান ঘটনা বর্ণনা করিলাম। গাছেও কি এই সমস্ত আশ্চর্য ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়? নানাবিধ পরীক্ষা করিয়া কোনো কোনো উদ্ভিদপেশীও যে স্পন্দনশীল তাহার বহুবিধ প্রমাণ পাইয়াছি।

বনচাঁড়ালের নৃত্য

বনচাঁড়াল গাছ দিয়া উদ্ভিদের স্পন্দনশীলতা অনায়াসে দেখা যাইতে পারে। ইহার ক্ষুদ্র পাতাগুলি আপনা-আপনি নৃত্য করে। লোকের বিশ্বাস যে, হাতের তুড়ি দিলেই নৃত্য আরম্ভ হয়। গাছের সংগীতবোধ আছে কি না বলিতে পারি না, কিন্তু বনচাঁড়ালের নৃত্যের সহিত তুড়ির কোনো সম্বন্ধ নাই। তরুস্পন্দনের সাড়ালিপি পাঠ করিয়া জন্তু ও উদ্ভিদের স্পন্দন যে একই নিয়মে নিয়মিত তাহা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারিতেছি।

প্রথমতঃ, পরীক্ষার সুবিধার জন্য বনচাঁড়ালের পত্র ছেদন করিলে স্পন্দন ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু নল দ্বারা উদ্ভিদ-রসের চাপ দিলে স্পন্দন ক্রিয়া পুনরায় আরম্ভ হয় এবং অনিবারিত গতিতে চলিতে থাকে। তাহার পর দেখা যায় যে, উত্তাপে স্পন্দনসংখ্যা বর্ধিত, শৈত্যে স্পন্দনের মন্থরতা ঘটে। ইথার প্রয়োগে স্পন্দন ক্রিয়া স্তম্ভিত হয়; কিন্তু বাতাস করিলে অচৈতন্য ভাব দূর হয়। ক্লোরোফরমের প্রভাব মারাত্মক। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, বিষ দ্বারা যে ভাবে স্পন্দনশীল হৃদয় নিস্পন্দিত হয়, সেই বিষে সেই ভাবে উদ্ভিদের স্পন্দনও নিরস্ত হয়। উদ্ভিদেও এক বিষ দিয়া অন্য বিষ ক্ষয় করিতে সমর্থ হইয়াছি।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, স্বতঃস্পন্দনের মূল রহস্য কি। উদ্ভিদ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইতেছি যে, কোনো কোনো উদ্ভিদ-পেশীতে আঘাত করিলে সেই মুহূর্তে তাহার কোনো উত্তর পাওয়া যায় না। তবে যে বাহিরের শক্তি উদ্ভিদে প্রবেশ করিয়া একেবারে বিনষ্ট হইল তাহা নহে; উদ্ভিদ সেই আঘাতের শক্তিকে সঞ্চয় করিয়া রাখিল। এইরূপে আহারজনিত বল, বাহিরের আলোক, উত্তাপ ও অন্যান্য শক্তি উদ্ভিদ সঞ্চয়

করিয়া রাখে ; যখন সম্পূর্ণ ভরপুর হয় তখন সঞ্চিত শক্তি বাহিরে উথালিয়া পড়ে। সেই উথালিয়া পড়াকে আমরা স্বতঃস্পন্দন মনে করি। যাহা স্বতঃ বলিয়া মনে করি প্রকৃতপক্ষে তাহা সঞ্চিত বলের বহিরোচ্ছ্বাস। যখন সঞ্চয় ফুরাইয়া যায় তখন স্বতঃস্পন্দনেরও শেষ হয়। ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া বনচাঁড়ালের সঞ্চিত তেজ হরণ করিলে স্পন্দন বন্ধ হইয়া যায়। খানিকক্ষণ পর বাহির হইতে উত্তাপ সঞ্চিত হইলে পুনরায় স্পন্দন আরম্ভ হয়।

গাছের স্বতঃস্পন্দনে অনেক বৈচিত্র্য আছে। কতকগুলি গাছে অতি অল্প সঞ্চয় করিলেই শক্তি উথালিয়া উঠে ; কিন্তু তাহাদের স্পন্দন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। স্পন্দিত অবস্থা রক্ষা করিবার জন্য তাহারা উত্তেজনার কাঙাল। বাহিরের উত্তেজনা বন্ধ হইলেই অমনি স্পন্দন বন্ধ হইয়া যায়। কামরাঙা গাছ এই জাতীয়।

আর কতকগুলি গাছ বাহিরের আঘাতেও অনেক কাল সাড়া দেয় না ; দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহারা সঞ্চয় করিতে থাকে। কিন্তু যখন তাহাদের পরিপূর্ণতা বাহিরে প্রকাশ পায় তখন তাহাদের উচ্ছ্বাস বহুকাল স্থায়ী হয়। বনচাঁড়াল এই দ্বিতীয় শ্রেণীর উদাহরণ।

মানুষের একটা অবস্থাকে স্বতঃ উদ্ভাবনশীলতা অথবা উদ্দীপনা বলা যাইতে পারে। সেই অবস্থার জন্য সঞ্চয় এবং পরিপূর্ণতার আবশ্যক। কতকগুলি লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় যে, সেই অবস্থা স্বতঃস্পন্দনেরই একটি উদাহরণ বিশেষ। যদি তাহা সত্য হয় তাহা হইলে সেই অবস্থা-অভিলাষী সাধক চিন্তা করিয়া দেখিবেন, কোন্ পথ— কামরাঙা অথবা বনচাঁড়ালের পদাঙ্ক অনুসরণ— তাঁহার পক্ষে শ্রেয়।

মৃত্যুর সাড়া

পরিশেষে উদ্ভিদের জীবনে এরূপ সময় আসে যখন কোনো এক প্রচণ্ড আঘাতের পর হঠাৎ সমস্ত সাড়া দিবার শক্তির অবসান হয়। সেই আঘাত মৃত্যুর আঘাত। কিন্তু সেই অন্তিম মুহূর্তে গাছের স্থির স্নিগ্ধ মূর্তি ম্লান হয় না। হেলিয়া পড়া কিংবা শুষ্ক হইয়া যাওয়া অনেক পরের অবস্থা। মৃত্যুর রুদ্র-আহ্বান যখন আসিয়া পেঁছে তখন গাছ তাহার শেষ উত্তর কেমন করিয়া দেয় ? মানুষের মৃত্যুকালে যেমন একটা দারুণ আক্ষেপ সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া বহিয়া যায় তেমনি দেখিতে পাই, অন্তিম মুহূর্তে বৃক্ষদেহের মধ্য দিয়াও একটা বিপুল কুঞ্চনের আক্ষেপ প্রকাশ পায়। এই সময়ে একটি বিদ্যুৎপ্রবাহ মুহূর্তের জন্য মুমূর্ষু বৃক্ষগাত্রে তীব্রবেগে ধাবিত হয়। লিপিযন্ত্রে এই সময় হঠাৎ জীবনের লেখার গতি পরিবর্তিত হয়— উর্ধ্বগামী রেখা নিম্নদিকে ছুটিয়া গিয়া স্তব্ধ হইয়া যায়। এই সাড়াই বৃক্ষের অন্তিম সাড়া।

এই আমাদের মূক সঙ্গী, আমাদের দ্বারের পার্শ্বে নিঃশব্দে যাহাদের জীবনের লীলা চলিতেছে তাহাদের গভীর মর্মের কথা তাহারা ভাষাহীন অক্ষরে লিপিবদ্ধ

করিয়া দিল এবং তাহাদের জীবনের চাঞ্চল্য ও মরণের আক্ষেপ আজ আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশিত করিল। জীব ও উদ্ভিদের মধ্যে যে কৃত্রিম ব্যবধান রচিত হইয়াছিল তাহা দূরীভূত হইল। কল্পনারও অতীত অনেকগুলি সংবাদ আজ বিজ্ঞান স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়া বহুত্বের ভিতরে একত্ব প্রমাণ করিল।

[প্রবন্ধটির রচনাকাল সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে প্রেসিডেন্সী কলেজে ২০ শে ভাদ্র ১৩২০ সালের বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা, অব্যক্ত গ্রন্থে পরিবেশিত "বিজ্ঞানে সাহিত্য" প্রবন্ধটির বর্জিত অংশবিশেষ ও সে সময়ের অন্যান্য আবিষ্কারের বিষয় বস্তুর সার সংক্ষেপ হিসেবে প্রবন্ধটিকে চিহ্নিত করা যায়।]

আহত উদ্ভিদ

পশ্চিমে কয় বৎসর যাবৎ আকাশ ধূমে আচ্ছন্ন ছিল। সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া দৃষ্টি পেঁছিত না। অপরিস্ফুট আর্তনাদ কামানের গর্জনে পরাহত। কিন্তু যেদিন হইতে শিখ ও পাঠান, গুরখা ও বাঙালী সেই মহারণে জীবন আহুতি দিতে গিয়াছে, সেদিন হইতে আমাদের দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি বাড়িয়া গিয়াছে।

শুভ্র তুষার-প্রান্তর যাহাদের জীবনধারায় রক্তিম হইয়াছে তাহাদের অন্তিম বেদনা আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিতেছে। কি এই আকর্ষণ যাহা সকল ব্যবধান ঘুচাইয়া দেয়, যাহা নিকটকেও নিকটতর করে, যাহাতে পর ও আপন ভুলিয়া যাই ? সমবেদনাই সেই আকর্ষণ, কেবল সহানুভূতি-শক্তিতেই আমাদের জীবনে প্রকৃত সত্য প্রতিভাত হয়। চিরসহিষ্ণু এই উদ্ভিদরাজ্য নিশ্চলভাবে আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান। উত্তাপ ও শৈত্য, আলো ও অন্ধকার, মৃদু সমীরণ ও ঝটিকা, জীবন ও মৃত্যু ইহাদিগকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। বিবিধ শক্তি দ্বারা ইহারা আহত হইতেছে, কিন্তু আহতের কোনো ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইতেছে না। এই অতি সংযত, মৌন ও অক্রন্দিত জীবনেরও যে এক মর্মভেদী ইতিহাস আছে তাহা বর্ণনা করিব।

মানুষকে আঘাত করিলে সে চিৎকার করে। তাহা হইতে মনে করি, সে বেদনা পাইয়াছে। বোবা চীৎকার করে না ; কি করিয়া জানিব, সে বেদনা পাইয়াছে ? সে ছট্‌ফট্‌ করে, তাহার হস্তপদ আকুঞ্চিত হয় ; দেখিয়া মনে, সেও বেদনা পাইয়াছে। সমবেদনার দ্বারা তাহার কষ্ট অনুভব করি। ব্যাঙকে আঘাত করিলে সে চীৎকার করে না, কিন্তু ছট্‌ফট্‌ করে ; তবে মানুষ ও ব্যাঙে যে অনেক প্রভেদ ! ব্যাঙ বেদনা পাইল কি না, এ কথা কেবল অন্তর্যামীই জানেন। সমবেদনা সতত ঊর্ধ্বমুখী, কখনও কখনও সমতলগামী, কচিৎ নিম্নগামী। ইতর লোকে যে আমাদের মতোই

সুখ দুঃখ, মান অপমান বোধ করে, এ কথা কেহ কেহ সন্দেহ করিয়া থাকেন। ইতর জীবের তো কথাই নাই তবে ব্যাঙ আঘাত পাইয়া যে কিছু-একটা অনুভব করে এবং সাড়া দেয়, এ কথা মানিয়া লইতেই হইবে। অনুভব করে— এই কথা, টের পায় এই অর্থে ব্যবহার করিব। মানুষ বেদনা পায়, ইতর জীব সাড়া দেয়, এই কথাতে কেহ কোনো আপত্তি করিবেন না। ব্যাঙের ছট্‌ফটানি দেখিয়া হয়তো অভ্যাস-দোষে কখনও বলিয়া ফেলিতে পারি যে, সে বেদনা পাইয়াছে। এ কথাটা রূপক অর্থে লইবেন। কথা ব্যবহার সম্বন্ধে সাবধান হওয়া আবশ্যক। কারণ বিলাতের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত বলেন যে, খোলা ছাড়াইয়া জীবিত ঝিনুক অথবা অয়স্টারকে যখন গলাধঃকরণ করা হয় তখন ঝিনুক কোনো কষ্টই অনুভব করে না, বরঞ্চ পাক-গহ্বরের উষ্ণতা অনুভব করিয়া উল্লসিত হয়। ব্যাঘ্রের উদরস্থ হইয়া কেহ ফিরিয়া আসে নাই, সুতরাং পাকস্থলীর অন্তর্গত হইবার সুখ চিরকাল অনির্বচনীয়ই থাকিবে।

জীবনের মাপকাঠি

এখন দেখা যাউক, জীবন্ত অবস্থার কোনোরূপ মাপকাঠি আছে কি না। জীবিত ও মৃতের কি প্রভেদ? যে জীবিত তাহাকে নাড়া দেয়। কেবল তাহাই নহে; যে অধিক জীবন্ত সে একই নাড়ায় অতি বৃহৎ সাড়া দেয়। যে মৃতপ্রায় সে নাড়ার উত্তরে ক্ষুদ্র সাড়া দেয়। যে মরিয়াছে সে একেবারেই সাড়া দেয় না।

সুতরাং আঘাত দিয়া জীবন্ত ভাবের পরিমাণ করিতে পারি। যে তেজস্বী সে অল্প আঘাতেই পূর্ণ সাড়া দিবে। আর যে দুর্বল সে অনেক তাড়না পাইয়াও নিরুত্তর থাকিবে। মনে করুন; কোনোপ্রকারে আমার অঙ্গুলির উপর বার বার আঘাত পড়িতেছে। আঘাত পাইয়া অঙ্গুলি আকুঞ্চিত হইতেছে এবং তজ্জন্য নড়িতেছে। অল্প আঘাতে অল্প নড়ে এবং প্রচণ্ড আঘাতে বেশি নড়ে। শুধু চক্ষে তাহার পরিমাণ প্রকৃতরূপে লক্ষিত হয় না। আকুঞ্চনের মাত্রা ধরিবার জন্য কোনো-প্রকার লিখিবার বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। সম্মুখে যে পরীক্ষা দেখানো হইয়াছে তাহা হইতে কলের আভাস পাওয়া যাইবে। স্বল্প আঘাতের পরে স্বল্প আকুঞ্চন; কলমটা উপরের দিকে অল্প দূর উঠিয়া যায়, আকুঞ্চনরেখাও স্বল্প-আয়তনের হয়। বৃহৎ আঘাতে রেখাটা বড়ো হয়।

কেবল তাই নহে। আঘাতের চকিত অবস্থা হইতে আমরা পুনরায় প্রকৃতিস্থ হই; সংকুচিত অঙ্গুলির টানে লিখিত রেখা হঠাৎ উপর দিকে চলিয়া যায়। প্রকৃতিস্থ হইতে কিছু সময় লাগে; ঊর্ধ্বোত্থিত রেখা ক্রমশঃ নামিয়া পূর্ব স্থানে আসে। আঘাতে বেদনা অল্প সময়েই পূর্ণ মাত্রা হইয়া থাকে; কিন্তু সেই বেদনা অন্তর্হিত হইতে সময় লাগে। সেইরূপ আকুঞ্চনের সাড়া অল্প সময়েই হইয়া থাকে; তাহা হইতে প্রকৃতিস্থ হইবার প্রসারণ-রেখা অধিক সময় লয়। গুরুতর আঘাতে বৃহত্তর সাড়া পাওয়া যায়; প্রকৃতিস্থ হইতে দীর্ঘতর সময় লাগে। বেদনাও অনেক কাল স্থায়ী হয়। যদি জীবিত পেশী একই অবস্থায় থাকে এবং একইবিধ আঘাত তাহার

উপর বার বার পতিত হয়, তাহা হইলে সাড়াগুলি একই রকম হয়। কিন্তু জীবিত পেশী সর্বসময়ে একই অবস্থায় থাকে না ; কারণ বাহ্য জগৎ এবং বিগত ইতিহাস আমাদিগকে মুহূর্তে মুহূর্তে নূতন রূপে গড়িতেছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রকৃতি মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তিত হইতেছে। কখনও বা উৎফুল্ল, কখনও বা বিমর্ষ, কখনও বা মুমূর্ষু। এই সকল ভিতরের পরিবর্তন অনেক সময় বাহির হইতে বুঝা যায় না। যিনি দেখিতে ভালোমানুষটি তিনি হয়তো কোপনস্বভাব, অল্পেতেই সপ্তমে চড়িয়া বসেন ; অন্যকে হয়তো কিছুতেই চেতানো যায় না। ব্যক্তিগত পার্থক্য, অবস্থাগত পরিবর্তন, তদ্ভিন্ন জীবনের অনেক ইতিহাস ও স্মৃতি আছে যাহার ছাপ অদৃশ্যরূপেই থাকিয়া যায়। সে সকল লুপ্ত কাহিনী কি কোনোদিন ব্যক্ত হইবে? প্রথমে মনে হয়, এই চেষ্টা একেবারেই অসম্ভব। দেখা যাউক, অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে কি না। কি করিয়া লোকের স্বভাব পরখ করিব? সাচ্চা ও ঝুটার প্রভেদ কি? টাকা পরখ করিতে হইলে বাজাইয়া লইতে হয় ; আঘাতের সাড়া শব্দরূপে শুনিতে পাই। সাচ্চা ও ঝুটার সাড়া একেবারেই বিভিন্ন ; একটাতে সুর আছে, অন্যটা একেবারে বেসুর। মানুষের প্রকৃতিও বাজাইয়া পরখ করা যায়। অদৃষ্ট দারুণ আঘাত দিয়া মানুষকে পরীক্ষা করে ; সাচ্চা ও ঝুটার পরীক্ষা কেবল তখনই হয়।

হয়তো এইরূপে জীবের প্রকৃতি ও তাহার ইতিহাস বাহির করা যাইতে পারে— আঘাত করিয়া এবং তাহার সাড়া লিপিবদ্ধ করিয়া সাড়া-লিপি তো রেখা মাত্র ; কোনোটা একটু বড়ো কোনোটা কিছু ছোটো। দুইটি রেখার সামান্য বিভেদ হইতে এমন অব্যক্ত, এমন অন্তরঙ্গ, রহস্যময় ইতিহাস কিরূপে ব্যক্ত হইবে? কথাটা যত অসম্ভব মনে হয়, বাস্তবিক তত নয়। গ্রহবৈগুণ্যে হয়তো আমাদিগকে কোনোদিন আসামীরূপে আদালতে উপস্থিত হইতে হইবে। সেখানে আসামীর বাগাড়ম্বর করিবার অধিকার নাই। কৌসুলির জেরাতে কেবল 'হাঁ' কি 'না' এইমাত্র উত্তর দিতে হইবে ; অর্থাৎ কেবলমাত্র দুই প্রকার সাড়া দিতে পারিব— শিরের ঊর্ধ্বাধঃ অথবা দক্ষিণ-বামে আন্দোলন দ্বারা। যদি আসামীর নাকের উপর কালি মাখাইয়া সম্মুখে একখানি অতি শুভ্র স্ট্যাম্প কাগজ ধরা যায় তাহা হইলে কাগজে দুই রকম সাড়া লিখিত হইবে। ইহাই প্রকৃত নাকে-খৎ এবং এই দুইটি রেখাময়ী সাড়া দ্বারা স্বয়ং ধর্মাবতার বিচারপতি আমাদের সমস্ত জীবন পরীক্ষা করিবেন। সেই বিচারের ফলেই আমাদের ভবিষ্যৎ বাসস্থান নিরূপিত হইবে— কলিকাতায় কিংবা আন্দামানে, ইহলোকে কিংবা পরলোকে।

এতক্ষণ মানুষের কথা বলিলাম। গাছের কথা ও তাহার গূঢ় ইতিহাসের কথা এখন বলিব। গাছের পরীক্ষা করিতে হইলে গাছকে কোনো বিশেষরূপে আঘাত দ্বারা উত্তেজিত করিতে হইবে এবং তাহার উত্তরে সে যে সংকেত করিবে তাহা তাহাকে দিয়াই লিপিবদ্ধ করাইতে হইবে। সেই লিখনভঙ্গী দিয়াই তাহার বর্তমান ও অতীত-ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইবে। সুতরাং এই দুরূহ প্রযত্ন সফল করিতে হইলে দেখিতে হইবে—

১· গাছ কি কি আঘাতে উত্তেজিত হয় এবং কিরূপে সেই আঘাতের মাত্রা নিরূপিত হইতে পারে ?
২· আঘাত পাইয়া গাছ উত্তরে কিরূপ সংকেত করে ?
৩· কি প্রকারে সেই সংকেত লিপিরূপে অঙ্কিত হইতে পারে ?
৪· সেই লেখার ভঙ্গী হইতে কি করিয়া গাছের ইতিহাস উদ্ধার হইতে পারে ?
৫· গাছের হাত, অর্থাৎ ডাল কাটিলে গাছ কি ভাবে তাহা অনুভব করে ?

গাছের উত্তেজনার কথা

পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের কোনো অঙ্গে আঘাত করিলে সেখানে একটা বিকারের ভাব উৎপন্ন হয়। তাহাতে অঙ্গ সংকুচিত হয়। তদ্ভিন্ন আহত স্থান হইতে সেই বিকার-জনিত একটা ধাক্কা স্নায়ুসূত্র দিয়া মস্তিষ্কে আঘাত করে ; তাহা আমরা আঘাতে মাত্রা ও প্রকৃতিভেদে সুখ কিংবা দুঃখ বলিয়া মনে করি। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাঁধিলে যদিও নড়িবার শক্তি বন্ধ হয়, তথাপি সেই স্নায়ুসূত্র বাহিয়া যে সংবাদ যায় তাহা বন্ধ হয় না। বৃক্ষকে তার দিয়া বৈদ্যুতিক কলের সঙ্গে সংযোগ করিলে দেখা যায় যে, গাছকে আঘাত করিবামাত্র সে একটা বৈদ্যুতিক সাড়া দিতেছে। গাছের মৃত্যুর পর আর কোনো সাড়া পাওয়া যায় না। এইরূপে সকল প্রকার গাছ এবং তাহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আঘাত অনুভব করিয়া যে সাড়া দেয় তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

কোনো কোনো গাছ আছে যাহারা নড়িয়া সাড়া দেয় ; যেমন লজ্জাবতী লতা। প্রতি পত্র-মূলের নীচের দিকে উদ্ভিদপেশী অপেক্ষাকৃত স্থূল। আমাদের মাংসপেশী আহত হইলে যেরূপ সংকুচিত হয়, পত্রমূলের নীচের দিকের উদ্ভিদপেশীও আঘাতে সেরূপ সংকুচিত হয়। তাহার ফলে পাতাটা পড়িয়া যায়। আঘাতজনিত আকস্মিক সংকোচের পরে গাছ প্রকৃতিস্থ হয় এবং পাতা আবার পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া উত্থিত হয়। মানুষ যেরূপ হাত নাড়িয়া সাড়া দেয়, লজ্জাবতী সেইরূপ পাতা নাড়িয়া সাড়া দেয়।

মানুষকে যেরূপে উত্তেজিত করা যায়, লজ্জাবতীকে ঠিক সেই প্রকারে— যেমন লাঠির আঘাত দিয়া, চিমটি কাটিয়া, উত্তপ্ত লোহার ছ্যাঁকা দিয়া, অ্যাসিডে পোড়াইয়া উত্তেজিত করা যাইতে পারে। এই সকল নাড়া পাইয়া পাতা সাড়া দেয়। তবে এই সকল ভীষণ তাড়ণা পাতা অধিক কাল সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করে। সুতরাং দীর্ঘকাল পরীক্ষার জন্য এমন কোনো মৃদু তাড়ণার ব্যবস্থা আবশ্যক যাহাতে পাতার প্রাণনাশ না হয় এবং নাড়ার মাত্রাটা যেন ঠিক এক পরিমাণে থাকে।

গাছটিকে কোনো সহজ উপায়ে নিদ্রিত অথবা নিশ্চল অবস্থা হইতে জাগাইতে হইবে। রাজকন্যা মায়াবশে নিদ্রিতা ছিলেন ; সোনার কাঠি ও রূপার কাঠির স্পর্শে তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সম্মুখের পরীক্ষা হইতে জানা যাইতেছে যে, সোনার কাঠি ও রূপার কাঠি স্পর্শ করা মাত্র লজ্জাবতী লতা ও নিশ্চল ব্যাঙ পাতা ও গা নাড়িয়া সাড়া দিল। ইহার কারণ এই যে, দুই বিভিন্ন ধাতুর স্পর্শ হইলেই বিদ্যুৎ-

স্রোত বহিতে থাকে এবং সেই বিদ্যুৎবলে সর্বপ্রকার জীব ও উদ্ভিদ একইরূপে উত্তেজিত হয়। বিদ্যুৎশক্তি দ্বারা উত্তেজিত করিবার সুবিধা এই যে, কল দ্বারা উহার শক্তি হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায়, অথবা একই প্রকার রাখা যাইতে পারে। ইচ্ছাক্রমে বিদ্যুতের আঘাত বজ্রানুরূপ ভীষণ করিয়া মুহূর্তে জীবন ধ্বংস করা যাইতে পারে, অথবা কলের কাঁটা ঘুরাইয়া আঘাত মৃদু হইতে মৃদুতর করা যায়। এইরূপ মৃদু আঘাতে বৃক্ষের কোনো অনিষ্ট হয় না।

গাছের যন্ত্রলিপি

গাছের সাড়া দিবার কথা বলিয়াছি। এখন কঠিন সমস্যা এই যে, কি করিয়া গাছের সাড়া লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে। জন্তুর সাড়া সাধারণতঃ কলম সংযোগে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু চড়ুই পাখির লেজে কুলা বাঁধিলে তাহার উড়িবার যেরূপ সাহায্য হয়, গাছের পাতার সহিত কলম বাঁধিলে তাহার লিখিবার সাহায্যও সেইরূপ হইয়া থাকে। এমন-কি, বনচাঁড়ালের ক্ষুদ্র পত্র সুতার ভার পর্যন্তও সহিতে পারে না ; সুতরাং সে যে কলম ঠেলিয়া সাড়া লিখিবে এরূপ কোনো সম্ভাবনা ছিল না। এ জন্য আমি অন্য উপায় গ্রহণ করিয়াছিলাম। আলো-রেখার কোনো ওজন নাই। প্রথমতঃ, প্রতিবিম্বিত আলো-রেখার সাহায্যে আমি বৃক্ষপত্রের বিবিধ লিপি-ভঙ্গী স্বহস্তে লিখিয়া লইয়াছিলাম। ইহা সম্পাদন করিতেও বহু বৎসর লাগিয়াছিল। যখন এই সকল নূতন কথা জীবতত্ত্ববিদ্‌দিগের নিকট উপস্থিত করিলাম তখন তাঁহারা যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। পরিশেষে আমাকে জানাইলেন যে, এই সকল তত্ত্ব এরূপ অভাবনীয় যে, যদি কোনোদিন বৃক্ষ স্বহস্তে লিখিয়া সাক্ষ্য দেয়, কেবল তাহা হইলেই তাঁহারা এরূপ নূতন কথা মানিয়া লইবেন।

যেদিন এ সংবাদ আসিল সেদিন সকল আলো যেন আমার চক্ষে নিবিয়া গেল। কিন্তু পূর্ব হইতেই জানিতাম— সফলতা বিফলতারই উল্টা পিঠ। এ কথাটা আবার নূতন করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলাম। বারো বৎসর পর শাপই বর হইল। সেই বারো বৎসরের কথা সংক্ষেপে বলিব। কলটি সম্পূর্ণ নূতন গড়িলাম। অতি সূক্ষ্ম তার দিয়া একান্ত লঘু ওজনের কলম প্রস্তুত করিলাম। সে কলমটিও মরকত-নির্মিত জুয়েলের উপর স্থাপিত হইল, যেন পাতার একটু টানেই লেখনী সহজে ঘুরিতে পারে। এতদিন পরে বৃক্ষপত্রের স্পন্দনের সহিত লেখনী স্পন্দিত হইতে লাগিল। তাহায় পর লিখিবার কাগজের ঘর্ষণের বিরুদ্ধে কলম আর উঠিতে পারিল না। কাগজ ছাড়িয়া মসৃণ কাচের উপর প্রদীপের কৃষ্ণ কাজল লেপিলাম। কৃষ্ণ লিপিপটে শুভ্র লেখা হইল। ইহাতে ঘর্ষণের বাধাও অনেকটা কমিয়া গেল ; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও গাছের পাতা সেই সামান্য ঘর্ষণের বাধা ঠেলিয়া কলম চালাইতে পারিল না। ইহার পর অসম্ভবকে সম্ভব করিতে আরও ৫-৬ বৎসর লাগিল। তাহা আমার 'সমতাল' যন্ত্রের উদ্ভাবন দ্বারা সম্ভাবিত হইয়াছে। এই সকল কলের গঠনপ্রণালী বর্ণনা করিয়া আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি করিব না। তবে ইহা বলা আবশ্যক যে, এই সকল কলের দ্বারা

বৃক্ষের বহুবিধ সাড়া লিখিত হয়। বৃক্ষের বৃদ্ধি মুহূর্তে নির্ণীত হয় এবং এইরূপে তাহার স্বতঃস্পন্দন লিপিবদ্ধ হয় এবং জীবন ও মৃত্যু-রেখা তাহার আয়ু পরিমাণ করে।

গাছের লেখা হইতে তাহার ভিতরকার ইতিহাস উদ্ধার

গাছের লিখনভঙ্গী ব্যাখ্যা অনেক সময়-সাপেক্ষ। তবে উত্তেজিত অবস্থায় সাড়া বড়ো হয়, বিমর্ষ অবস্থায় সাড়া ছোটো হয় এবং মুমূর্ষু অবস্থায় সাড়া লুপ্তপ্রায় হয়। এই যে সাড়ালিপি সম্মুখে দেখিতেছেন তাহা লিখিবার সময় আকাশ ভরিয়া পূর্ণ আলো এবং বৃক্ষ উৎফুল্ল অবস্থায় ছিল। সেইজন্য সাড়াগুলির পরিমাণ কেমন বৃহৎ! দেখিতে দেখিতে সাড়ার মাত্রা কোনো অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ ছোটো হইয়া গেল। ইতি মধ্যে যদি কোনো পরিবর্তন হইয়া থাকে তাহা আমার অনুভূতিরও অগোচর ছিল। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, সূর্যের সম্মুখে একখানা ক্ষুদ্র মেঘখন্ড বাতাসে উড়িয়া যাইতেছে। তাহার জন্য সূর্যালোকের যে যৎকিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছিল তাহা ঘরের ভিতর হইতে কোনোরূপে বুঝিতে পারি নাই; কিন্তু গাছ টের পাইয়াছিল, সে ছোট্ট সাড়া দিয়া তাহার বিমর্ষতা জ্ঞাপন করিল। আর যেই মেঘখন্ড চলিয়া গেল অমনি তাহার পূর্বের ন্যায় উৎফুল্লতার সাড়া প্রদান করিল। পূর্বে বলিয়াছি যে, আমি বৈদ্যুতিক পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছিলাম যে, সকল গাছেরই অনুভব-শক্তি আছে। এ কথা পশ্চিমের বৈজ্ঞানিকেরা অনেক দিন পর্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। কিয়দ্দিন হইল ফরিদপুরের খেজুর বৃক্ষ আমার কথা প্রমাণ করিয়াছে। এই গাছটি প্রত্যুষে মস্তক উত্তোলন করিত, আর সন্ধ্যার সময় মস্তক অবনত করিয়া মৃত্তিকা স্পর্শ করিত। ইহা যে গাছের বাহিরের পরিবর্তনের অনুভূতি জনিত তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। যে সকল উদাহরণ দেওয়া গেল তাহা হইতে বুঝিতে পারিবেন যে, বৃক্ষ-লিখিত সাড়া দ্বারা তাহার জীবনের গুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার হইতে পারে। গাছের পরীক্ষা হইতে জীবন সম্বন্ধে এইরূপ বহু নূতন তথ্য আবিষ্কার সম্ভবপর হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক সত্য ব্যতীত অনেক দার্শনিক প্রশ্নেরও মীমাংসা হইবে বলিয়া মনে হয়।

পাত্রাধার তৈল

শুনিতে পাই, কুকুরের লাঙুল আন্দোলন লইয়া দুই মতের এ পর্যন্ত মীমাংসা হয় নাই। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, কুকুর লেজ নাড়ে; অন্য পক্ষে বলিয়া থাকেন, লেজই কুকুরকে নাড়িয়া থাকে। এইরূপ পাতা নড়ে, কি গাছ নড়ে? তৈলাধার পাত্র কি পাত্রাধার তৈল? কে নাড়ায় আর কে সাড়া দেয়? বিলাতে আমাদের সমাজ লইয়া অনেক সমালোচনা হইয়া থাকে। এ দেশে নাকি নারীজাতি নিজের ইচ্ছায় কিছু করিতে পারেন না, কেবল পুরুষের ইঙ্গিতে পুতুলের ন্যায় তাঁহারা চলাফেরা করিয়া থাকেন। কে কাহার ইঙ্গিতে চলে? রাশ কাহার হাতে? কে নাড়ায়, কুকুর কিংবা

তাহার লেজ ? ভুক্তভোগীরা যাহা যাহা বলেন তাহা অন্যরূপ। বাহিরে যতই প্রতাপ, যতই আস্ফালন, এ সকল পুতুলের নাচমাত্র, চালাইবার সূত্র নাকি অন্তঃপুরে। এমন সময়ও আসে যখন রমণী সেই বন্ধন-রজ্জু স্বীয় হস্তেই ছেদন করেন। অঞ্চল দিয়া যাহাকে এতদিন রক্ষা করিয়াছিলেন তাহাকেই আদেশ করেন— যাও তুমি দূরে, কেবল আশীর্বাদ লইয়া ! তোমাকে মৃত্যুর হস্তেই বরণ করিলাম !

আঘাত করিলে লজ্জাবতীর পাতা পড়িয়া যায়। পাতা নড়ে কিংবা গাছ নড়ে, তাহা পরীক্ষা করিয়া নির্ণয় করা যাইতে পারে। প্রথম, গাছ ধরিয়া রাখিলে গাছ নড়িতে পারে না, পাতাই নড়ে। কিন্তু যদি পাতা ধরিয়া মাটি হইতে মূল উঠাইয়া লওয়া যায় তাহা হইলে দেখা যায়— আঘাতে গাছই নড়িয়া উঠে, পাতা স্থির থাকে। অঙ্গে আঘাত পাইলে সেই আঘাতের বেদনা সমস্ত শিরায় শিরায় বৃক্ষের সর্ব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ধাবিত হয় এবং একের আপদ অন্যে নিজের বলিয়া লয়। কারণ, যদিও বৃক্ষটি শত সহস্র শাখাপ্রশাখা লইয়া গঠিত, তাহা সত্ত্বেও কোনো গ্রন্থি ইহাদিগকে এক করিয়া বাঁধিয়াছে। কেবল সেই একতার বন্ধনের জন্যই বাহিরের ঝটিকা ও আঘাত তুচ্ছ করিয়া বৃক্ষ তাহার শির উন্নত করিয়া রহিয়াছে।

আহতের সাড়া

এক্ষণে দেখা যাউক, কি কি বিভিন্নরূপে আহত বৃক্ষ তাহার ক্লিষ্টতা বাহিরে জ্ঞাপন করে। আমি এ সম্বন্ধে বৃক্ষের দুই প্রকার সাড়া বিবৃত করিব। প্রথমতঃ, বর্ধনশীল গাছে ছুরি বসাইলে বৃদ্ধির মাত্রা বাড়ে কি কমে, সে বিষয় জ্ঞাপন করিব। দ্বিতীয়তঃ, গাছের পাতা কাটিয়া ফেলিলে সেই অস্ত্রাঘাতে গাছ এবং বৃক্ষবিচ্যুত পাতা কিরূপ অনুভব করিবে তাহা দেখাইব।

গাছ স্বভাবতঃ কতখানি করিয়া বাড়ে তাহা জানিতে হইলে অনেক সময় লাগে। শম্বুকের গতি হইতেও গাছের বৃদ্ধিগতি ছয় সহস্র গুণ ক্ষীণ ; এজন্য আমাকে এক নূতন কল আবিষ্কার করিতে হইয়াছে, তাহার নাম ক্রেস্কোগ্রাফ। তাহা দ্বারা বৃদ্ধি-মাত্রা কোটি গুণ বাড়াইয়া লিপিবদ্ধ হয়। যেখানে অণুবীক্ষণ পরাস্ত, তাহার পরও ক্রেস্কোগ্রাফের কৃতিত্ব লক্ষগুণ বেশি। কোটি গুণ বৃদ্ধি আপনারা মনে ধারণা করিতে পারিবেন না ; এজন্য গল্পচ্ছলে উদাহরণ দিতেছি। একবার বাংলা-নাগপুর এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলের গাড়ির দৌড় হইয়াছিল— কে আগে যাইতে পারে। এমন সময় এক শম্বুক তাহা দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না। অমনি সে ক্রেস্কো-গ্রাফের উপর আরোহণ করিল। খানিক পরে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতে পাইল, গাড়ি বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে।

ইচ্ছা ছিল কলের নাম ক্রেস্কোগ্রাফ না রাখিয়া 'বৃদ্ধিমান' রাখি। কিন্তু হইয়া উঠিল না। আমি প্রথম প্রথম আমার নূতন কলগুলির সংস্কৃত নাম দিয়াছিলাম ; যেমন 'কুঞ্চনমান' এবং 'শোষণমান'। স্বদেশী প্রচার করিতে যাইয়া অতিশয় বিপন্ন হইতে হইয়াছে। প্রথমতঃ, এই সকল নাম কিম্ভূতকিমাকার হইয়াছে বলিয়া বিলাতি

কাগজ উপহাস করিলেন। কেবল বোস্টনের প্রধান পত্রিকা অনেকদিন আমার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। সম্পাদক লেখেন, 'যে আবিষ্কার করে, তাহারই নামকরণের প্রথম অধিকার। তাহার পর নূতন কলের নাম পুরাতন ভাষা লাটিন ও গ্রীক হইতেই হইয়া থাকে। তাহা যদি হয় তবে অতি পুরাতন অথচ জীবন্ত সংস্কৃত হইতে কেন হইবে না ?' বলপূর্বক যেন নাম চালাইলাম, কিন্তু ফল হইল অন্যরূপ। গতবারে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতার সময় তথাকার বিখ্যাত অধ্যাপক আমার কল 'কাঞ্চনম্যান' সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। প্রথমে বুঝিতে পারি নাই, শেষে বুঝিলাম 'কুঞ্চনমান' 'কাঞ্চনম্যানে' রূপান্তরিত হইয়াছে। হাণ্টার সাহেবের প্রণালী মতে কুঞ্চন বানান করিয়াছিলাম, হইয়া উঠিল কাঞ্চন। রোমক অক্ষরমালার বিশেষ গুণ এই যে, ইহার কোনো-একটা স্বরকে অ হইতে ঔ পর্যন্ত যথেচ্ছরূপে উচ্চারণ করা হইতে পারে ; কেবল হয় না, ঋ ৯। তাহাও উপরে কিংবা নীচে দুই-একটা ফোঁটা দিলে হইতে পারে।

সে যাহা হউক, বুঝিতে পারিলাম— হিরণ্যকশিপুকে দিয়া বরং হরিনাম উচ্চারণ করানো যাইতে পারে, কিন্তু ইংরেজকে বাংলা কিংবা সংস্কৃত বলানো একেবারেই অসম্ভব। এজন্যই আমাদের হরিকে হ্যারী হইতে হয়। এই সকল দেখিয়া কলের 'বৃদ্ধিমান' নামকরণের ইচ্ছা একেবারে চলিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধিমান— হইতে বারু-ডোয়ান হইত। তার চেয়ে বরং ক্রেস্কোগ্রাফই ভালো।

বাড়ন্ত গাছ প্রতি সেকেণ্ডে কতটুকু বৃদ্ধি পায় তাহা পর্যন্ত এই কল লিখিয়া দেয়। ইহাতে জানা যায় যে, এই গাছটি এক মিনিটে এক ইঞ্চির লক্ষ ভাগের ৪২ ভাগ করিয়া বাড়িতেছিল। গাছটিকে তখন একখানা বেত দিয়ে সামান্য রকমে আঘাত করিলাম। এমনি গাছের বৃদ্ধি একেবারে কমিয়া গেল। সে আঘাত ভুলিতে গাছের আধ ঘণ্টার অধিক সময় লাগিয়াছিল। তাহার পর অতি সন্তর্পণে সে পুনরায় বাড়িতে আরম্ভ করিল। হে বেত্রপাণি স্কুলমাস্টার, তোমার কানমলা খাইয়া কেহ কেহ যে হাইকোর্টের জজ পর্যন্ত হইয়াছেন, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু ছেলেরা তোমার হাতে বেত খাইয়া যে হঠাৎ লম্বায় বাড়িয়া উঠিবে, এ সম্বন্ধে গুরুতর সন্দেহ আছে। সর্বপ্রকার আঘাতেই বৃদ্ধি কমিয়া যায়। সুঁচ দিয়া বিঁধিয়াছিলাম, তাহাতে গাছের বৃদ্ধি কমিয়া এক-চতুর্থ হইয়া গেল। এক ঘণ্টা পরেও সে আঘাত সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই, তখনও তাহার বৃদ্ধির গতি অর্ধেকেরও অধিক হইতে পারে নাই। ছুরি দিয়া লম্বভাবে চিরিলে আঘাত আরও গুরুতর হয়। তাহাতে বৃদ্ধি অনেক সময় পর্যন্ত থামিয়া যায়। কিন্তু লম্বা চেরার চেয়ে এপাশ ওপাশ করিয়া কাটা আরও নিদারুণ। কই মাছ কাটিবার সময় এই কথাটি যেন গৃহলক্ষ্মীরা মনে রাখেন।

আঘাতে অনুভূতি-শক্তির বিলোপ

ইহার পর লজ্জাবতী লতার পাতা কাটিলাম। তাহাতে কাটা পাতা এবং গাছের যে সকল পাতা ছিল সমস্তগুলিই মুষড়াইয়া পড়িয়া গেল। ইহার পর দেখিতে হইবে,

কাটা পাতা ও আহত বৃক্ষের অবস্থা কিরূপ হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, ৩।৪ ঘণ্টা পর্যন্ত উভয়েই একেবারে অচেতন। তাহার পরের ইতিহাস বড়োই অদ্ভুত। কাটা পাতাটিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য সুখাদ্য রস পান করিতে দিয়াছিলাম। ইহাতে পাতাটা চারি ঘণ্টার পর মাথা তুলিয়া উঠিল ও বড়ো রকমের সাড়া দিল। ভাবটা এই— কি হইয়াছে? ভালোই হইয়াছে; গাছটার সঙ্গে এতদিন বাঁধা ছিলাম, এখন শরীরটা কেমন লঘু লাগে! এইরূপে পাতাটা জেদের সহিত বারংবার সাড়া দিতে লাগিল। এই ভাবটা সমস্ত দিন ছিল। তাহার পরদিন কি যে হইল জানি না, সাড়াটা একেবারে কমিয়া গেল। ৫০ ঘণ্টার পর পাতাটা মুখ থুবড়াইয়া গেল। তার পরেই মৃত্যু!

যাহার পাতা কাটা হইয়াছিল সেই গাছটার ইতিহাস অন্যরূপ। সে ধীরে ধীরে সারিয়া উঠিল। 'কুছ্‌পরোয়া নেই' ভাবটা তাহার একেবারেই ছিল না। যাহা আছে তাহা লইয়াই তাহাকে থাকিতে হইবে। ধীরে ধীরে আহত বৃক্ষ তাহার বেদনা সামলাইয়া লইল। যে সাময়িক দুর্বলতা আসিয়াছিল তাহা ঝাড়িয়া ফেলিল এবং পূর্বের ন্যায় সাড়া দিতে সক্ষম হইল।

জন্মভূমি

কেন তবে এই বিভিন্নতা? কি কারণে ছিন্নশাখ-বৃক্ষ আহত ও মুমূর্ষু হইয়াও কিয়দ্দিন পর বাঁচিয়া উঠে, আর বিচ্যুত-পত্র নানা ভোগে লালিত হইয়াও মৃত্যুমুখে পতিত হয়? ইহার কারণ এই যে, বৃক্ষের মূল একটা নির্দিষ্ট ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত, যে স্থানের রস দ্বারা তাহার জীবন সংঘঠিত হইতেছে। সেই ভূমিই তাহার স্বদেশ ও তাহার পরিপোষক।

বৃক্ষের ভিতরেও আর একটি শক্তি নিহিত আছে যাহা দ্বারা যুগে যুগে সে আপনাকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিয়াছে। বাহিরে কত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু অদৃষ্টবৈগুণ্যে সে পরাহত হয় নাই। বাহিরের আঘাতের উত্তরে পূর্ণজীবন দ্বারা সে বাহিরের পরিবর্তনের সহিত যুঝিয়াছে। যে পরিবর্তন আবশ্যক, সে তাহা গ্রহণ করিয়াছে; যাহা অনাবশ্যক, জীর্ণপত্রের ন্যায় সে তাহা ত্যাগ করিয়াছে। এইরূপে বাহিরের বিভীষিকা সে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

আরও একটি শক্তি তাহার চিরসম্বল রহিয়াছে। এই জন্য তাহার মূল ভূমিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, তাহার শির ঊর্ধ্বে আলোকের সন্ধানে উন্নত এবং শাখা-প্রশাখা ছায়াদানে চতুর্দিকে প্রসারিত। তবে কি কি শক্তিবলে সে আহত হইয়াও বাঁচিয়া থাকে? ধৈর্যে ও দৃঢ়তায় সে তাহার স্বস্থান দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া থাকে, অনুভূতিতে সে ভিতর ও বাহিরের সামঞ্জস্য করিয়া লয়, স্মৃতিতে বহু জীবনের সঞ্চিত শক্তি নিজস্ব করিয়া লয়। আর যে হতভাগ্য আপনাকে স্বস্থান ও স্বদেশ হইতে বিচ্যুত করে, যে পর-অন্নে পালিত হয়, যে জাতীয় স্মৃতি ভুলিয়া যায়, সে হতভাগ্য কি শক্তি লইয়া বাঁচিয়া থাকিবে? বিনাশ তাহার সম্মুখে, ধ্বংসই তাহার পরিণাম।

[১৩২৪ সালের ৭ই চৈত্র তারিখের বিজ্ঞান বিষয়ক লোকরঞ্জক বক্তৃতা। বক্তৃতাটি প্রবন্ধকারে প্রবাসী পত্রিকার নববর্ষ সংখ্যা ১৩২৬ সালে মুদ্রিত হয়।]

স্নায়ুসূত্রের উত্তেজনা-প্রবাহ

বাহিরের সংবাদ ভিতরে কি করিয়া পেঁছায় ? আমাদের বাহ্যেন্দ্রিয় চতুর্দিকে প্রসারিত। বিবিধ ধাক্কা অথবা আঘাত তাহাদের উপর পতিত হইতেছে এবং সংবাদ ভিতরে প্রেরিত হইতেছে। আকাশের ঢেউ দ্বারা আহত হইয়া চক্ষু যে বার্তা প্রেরণ করে তাহা শব্দ বলিয়া উপলব্ধি হয়। বাহিরের আঘাতের মাত্রা মৃদু হইলে সচরাচর তাহা সুখকর বলিয়াই মনে করি। কিন্তু আঘাতের মাত্রা বাড়াইলে অনুরূপ অনুভূতি হইয়া থাকে। মৃদুস্পর্শ সুখকর, কিন্তু ইষ্টকাঘাত কোনোরূপেই সুখজনক নহে।

টেলিগ্রাফের তার দিয়া বৈদ্যুতিক প্রবাহ স্থান হইতে স্থানান্তরে পেঁছিয়া থাকে এবং এইরূপে দূরদেশে সংকেত প্রেরিত হয়। তার কাটিয়া দিলে সংবাদ বন্ধ হয়। একই বিদ্যুৎ-প্রবাহ বিভিন্ন কলে বিবিধ সংকেত করিয়া থাকে— কাঁটা নাড়ায়, ঘণ্টা বাজায় অথবা আলো জ্বালায়। বিবিধ ইন্দ্রিয় স্নায়ুসূত্র দিয়া যে উত্তেজনা-প্রবাহ প্রেরণ করে তাহা কখনও বা স্পর্শ বলিয়া অনুভব করি। উত্তেজনা-প্রবাহ যদি মাংসপেশীতে পতিত হয় তখন পেশী সংকুচিত হয়। তার কাটিলে যেরূপ খবর বন্ধ হয়, স্নায়ুসূত্র কাটিলে সেইরূপ বাহিরের সংবাদ আর ভিতরে পেঁছায় না।

স্বতঃস্পন্দন ও ভিতরের শক্তি

বাহিরের আঘাতজনিত সাড়ার কথা বলিয়াছি। তাহা ছাড়া আর এক রকমের সাড়া আছে যাহা আপনা-আপনিই হইয়া থাকে। সেই স্বতঃস্পন্দন ভিতরের কোনো অজ্ঞাত শক্তি দ্বারা ঘটিয়া থাকে। আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন ইহারই একটি উদাহরণ। ইহা আপনা-আপনিই হইয়া থাকে। উদ্ভিদ্-জগতে ইহার উদাহরণ দেখা যায়। বনচাঁড়ালের ছোটো দুইটি পাতা আপনা-আপনিই নড়িতে থাকে। ভিতরের শক্তিজাত স্বতঃস্পন্দনের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহা বাহিরের শক্তি দ্বারা বিচলিত হয় না ; বাহিরের শক্তিকে বরং প্রতিরোধ করে। সুতরাং দেখা যায়, দুই প্রকারের শক্তি দ্বারা জীব উত্তেজিত হয়— বাহিরের শক্তি এবং ভিতরের শক্তি। সচরাচর ভিতরের শক্তি বাহিরের শক্তিকে প্রতিরোধ করে।

ইন্দ্রিয়-অগ্রাহ্য কিরূপে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইবে ?

আঘাতের মাত্রা অনুসারেই উত্তেজনা-প্রবাহের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। এরূপ অনেক ঘটনা ঘটিতেছে যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়েরও অগ্রাহ্য। আলো যখন ক্ষীণ হইতে

ক্ষীণতর হয় তখন দৃশ্য অদৃশ্যে মিলিয়া যায়। তখনও চক্ষু আলোক দ্বারা আহত হইতেছে সত্য, কিন্তু অতি ক্ষীণ উত্তেজনা-প্রবাহ স্নায়ুসূত্র দিয়া অধিক দূর যাইতে না পারিয়া নিদ্রিত অনুভূতি-শক্তিকে জাগাইতে পারে না। ইন্দ্রিয়-অগ্রাহ্য কি কোনোদিন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইবে? ক্ষণিকের জন্য একদিন যাহার সন্ধান পাইয়াছিলাম তাহা তো আর দেখিতে পাইতেছি না! কি করিয়া তবে দৃষ্টি প্রখর হইবে, অনুভূতি-শক্তি বৃদ্ধি পাইবে?

অন্যদিকে বাহিরের ভীষণ আঘাতে অনুভূতি শক্তি বেদনায় মুহ্যমান, সেই যন্ত্রণাদায়ক প্রবাহ কিরূপে প্রশমিত হইবে? হে ভীরু, যদিও তুমি একদিন মরিবে তথাপি অকাল-শঙ্কা-হেতু শত শত বার মৃত্যুযাতনা ভোগ করিতেছ। যদিও বহির্জগতের আঘাত তুমি নিবারণ করিতে অসমর্থ, তথাপি অন্তর্জগতের তুমিই একমাত্র অধিপতি। যে পথ দিয়া বাহিরের সংবাদ তোমার নিকট পেঁছিয়া থাকে, কোনোদিন কি সেই পথ তোমার আজ্ঞায় এক সময়ে প্রসারিত এবং অন্য সময়ে একেবারে রুদ্ধ হইবে?

কখনও কখনও উক্তরূপ ঘটনা ঘটিতে দেখা গিয়াছে। মনের বিক্ষিপ্ত অবস্থায় যাহা দেখি নাই কিংবা শুনি নাই, চিত্তসংযম করিয়া তাহা দেখিয়াছি অথবা শুনিয়াছি। ইহাতে মনে হয়, ইচ্ছানুক্রমে এবং বহুদিনের অভ্যাসবলে অনুভূতি-শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যখন স্নায়ুসূত্র দিয়াই বাহিরের খবর ভিতরে পেঁছায় তখন স্নানুসূত্রের কি পরিবর্তনে অর্ধ-উন্মুক্ত দ্বার একেবারে খুলিয়া যায়? অন্য উপায়ও হয়তো আছে, যাহাতে খোলা দ্বার একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।

বাহিরের শক্তির প্রতিরোধ

এরূপ একটি ঘটনা কুমায়ুন-অবস্থানকালে দেখিয়াছিলাম। তরাই হইতে এক ভীষণ ব্যাঘ্র আসিয়া দেশ বিধ্বস্ত করিতেছিল। অল্প দিনেই শতাধিক লোক ব্যাঘ্র-কবলিত হইল। সরকার হইতে বাঘ মারিবার অনেক চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু সকলই নিষ্ফল হইল। গ্রামবাসীরা তখন নিরুপায় হইয়া কালু সিংহের শরণাপন্ন হইল। সে কোনো কালে শিকার করিত, কিন্তু অস্ত্র-আইনের নিষেধহেতু বহুকাল যাবৎ তাহার পুরাতন এক-নলা বন্দুক ব্যবহার করে নাই। বাঘ দিনের বেলায় মাঠে মহিষ বধ করিয়াছিল; সেই মহিষের আর্তনাদ স্পষ্ট শুনিতে পাইয়াছিলাম। রাত্রে সে স্থানে বাঘ ফিরিয়া আসিবে, এই আশায় নিকটের ঝোপের আড়ালে কালু সিং প্রতীক্ষা করিতেছিল। সন্ধ্যার সময় সাক্ষাৎ যমস্বরূপ বাঘ দেখা দিল; মাঝখানে ৩ হাত মাত্র ব্যবধান। ভয়ে কালু সিংহের সমস্ত শরীর কাঁপিতেছিল, কোনোরূপেই বন্দুক স্থির করিয়া লক্ষ্য করিতে পারিতেছিল না। কালু সিংহের নিকট পরে শুনিলাম—'তখন আমি নিজকে ধমক দিয়া বলিলাম; একি, কালু সিং? স্ত্রী, বহিন বাল-বাচ্চাদের জান বাঁচাইবার জন্য তোমাকে এখানে পাঠাইয়াছে, আর তুমি ঝোপের আড়ালে শুইয়া

আছ ? অমনি ভিতর দিয়া আগুনের মতো কি একটা ছুটিয়া গেল ; তাহাতে শরীর লোহার মতো শক্ত হইল। তখন বাঘের সামনে দাঁড়াইলাম। বাঘ আমাকে লক্ষ্য করিয়া লাফ দিল সেই সঙ্গেই আমার বন্দুকের আওয়াজ হইল, আর বাঘ মরিল।'

স্নায়ুর ভিতর দিয়া কি-একটা ছুটিয়া যায়, যাহাতে শরীর লোহার মতন কঠিন হয়। তখন সেই লৌহ-বর্ম ভেদ করিয়া বাহিরের কোনো ভয় ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। স্নায়ুসূত্রে কি পরিবর্তন ঘটে যাহা দ্বারা এরূপ অসম্ভবও সম্ভব হয় ? স্নায়ুর ভিতরে উত্তেজনা-প্রবাহ সম্পূর্ণ অদৃশ্য ; তাহার প্রকৃতি কি, তাহা কি নিয়মে চালিত হয়, তাহার কিছুই জানা নাই। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা এই তথ্য নির্ণীত হইবে মনে করিয়া বিশ বৎসর যাবৎ এই সন্ধানে নিযুক্ত ছিলাম।

বৃক্ষে স্নায়ুসূত্র

সর্বাগ্রে উদ্ভিদ-জীবন লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলাম। ফেফার, হ্যাবারল্যান্ড প্রমুখ ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, প্রাণীদের ন্যায় উদ্ভিদে কোনো স্নায়ুসূত্র নাই ; তবে লজ্জাবতী লতার একস্থানে চিমটি কাটিলে দূরস্থিত পাতা কেন পড়িয়া যায় ? ইহার উত্তরে তাঁহারা বলেন, চিমটি কাটিলে উদ্ভিদে জল-প্রবাহ উৎপন্ন হয় এবং সেই প্রবাহের ধাক্কায় পাতা পতিত হইয়া থাকে। এই নিষ্পত্তি যে ভ্রমাত্মক তাহা আমার পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। প্রথমতঃ, চিমটি না কাটিয়া অন্যরূপে লজ্জাবতী লতার উত্তেজনা-প্রবাহ প্রেরণ করা যাইতে পারে, যে সব উপায়ে জল-প্রবাহ একেবারেই উৎপন্ন হয় না। আরও দেখা যায়, প্রাণীর স্নায়ুতে যে সব বিশেষত্ব আছে উদ্ভিদ-স্নায়ুতেও তাহা বর্তমান। নলের ভিতরে জল-প্রবাহের বেগ শীত কিংবা উষ্ণতায় হ্রাস-বৃদ্ধি পায় না ; কিন্তু স্নায়ুর উত্তেজনার বেগ ৯ ডিগ্রি উত্তাপে দ্বিগুণিত হয়। উদ্ভিদে তাহাই হইয়া থাকে। অধিক শৈত্যে উদ্ভিদের স্নায়ুসূত্র অসাড় হইয়া যায় ; তখন উত্তেজনা-প্রবাহ একেবারেই বন্ধ হয়। ক্লোরোফরম প্রয়োগে উত্তেজনা-প্রবাহ স্থগিত হইয়া যায়। উদ্ভিদে যে স্নায়ুসূত্র আছে— আমার এই সিদ্ধান্ত এখন সর্বত্র গৃহীত হইয়াছে।

আণবিক সন্নিবেশে উত্তেজনা-প্রবাহের হ্রাস-বৃদ্ধি

প্রথমে দেখা যাউক, কি উপায়ে স্নায়ুর উত্তেজনা দূরে প্রেরিত হয়। এ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা হইলে পরে দেখা যাইবে, কিরূপে উত্তেজনা-প্রবাহ বর্ধিত কিংবা প্রশমিত হইতে পারে। স্নায়ুসূত্র অসংখ্য অণু-গঠিত ; প্রত্যেক অণুই স্বাভাবিক অবস্থায় আপেক্ষিক নিশ্চলভাবে স্বীয় স্থানে অবস্থিত। কিন্তু আঘাত পাইলে হেলিতে দুলিতে থাকে ; এই হেলা-দোলাই উত্তেজিত অবস্থা। একটি অণু যখন স্পন্দিত হয়, পার্শ্বের অন্য অণুও প্রথম অণুর আঘাতে স্পন্দিত হইয়া থাকে এবং এইরূপ ধারা-

বাহিক রূপে স্নায়ুসূত্র দিয়া উত্তেজনা এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে প্রেরিত হয়। অণুর আঘাতজনিত কম্পন কিরূপে দূরে প্রেরিত হয় তাহার একটা ছবি কল্পনা করিতে পারি। মনে কর, টেবিলের উপর এক সারি পুস্তক সোজাভাবে সাজানো আছে। ডান দিকের বইখানাকে বাম দিকে ধাক্কা দিলে প্রথম নম্বরের পুস্তক দ্বিতীয় নম্বরের পুস্তকের উপর পড়িয়া তৃতীয় পুস্তককে ধাক্কা দিবে এবং এইরূপে আঘাতের ধাক্কা এক দিক হইতে অন্য দিকে পেঁছিবে।

বইগুলি প্রথমে সোজা ছিল এবং পুস্তকখানাকে উল্টাইয়া ফেলিতে কিয়ৎপরিমাণ শক্তির আবশ্যক ; মনে কর তাহার মাত্রা পাঁচ। ধাক্কার জোর যদি পাঁচ না হইয়া তিন হয় তাহা হইলে বইখানা উল্টাইয়া পড়িবে না ; সুতরাং পার্শ্বের বইগুলিও নিশ্চল অবস্থায় থাকিবে। এই কারণে বহিরিন্দ্রিয়ের উপর ধাক্কা যখন অতি ক্ষীণ হয় তখন উত্তেজনা দূরে পেঁছিতে পারে না এবং এই জন্য বাহিরের আঘাত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না। মনে কর, বইগুলিকে সোজা অবস্থায় না রাখিয়া বাম দিকে একটু হেলানো অবস্থায় রাখা গেল। এবার স্বল্প ধাক্কাতেই বইখানা উল্টাইয়া পড়িবে এবং ধাক্কাটা এক দিক হইতে অন্য দিকে পেঁছিবে। পূর্বে ধাক্কার জোর পাঁচ না হইয়া তিন হইলে আঘাত দূরে পেঁছিত না, এখন তাহা সহজেই পেঁছিবে। বইগুলিকে উল্টাদিকে হেলাইয়া পাঁচ নম্বরের ধাক্কা প্রথম পুস্তকখানাকে উল্টাইতে পারিবে না। ধাক্কা এবার দূরে পেঁছিবে না ; গন্তব্য পথ যেন একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। এই উদাহরণ হইতে বুঝা যায় যে, স্নায়ুসূত্রের অণুগুলিকেও দুই প্রকারে সাজানো যাইতে পারে। 'সমুখ' সন্নিবেশে ইন্দ্রিয়-অগ্রাহ্য শক্তি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইবে। আর 'বিমুখ' সন্নিবেশে বাহিরের ভীষণ আঘাতজনিত উত্তেজনার ধাক্কা ভিতরে পেঁছিতে পারে না।

পরীক্ষা

উত্তেজনা-প্রবাহ সংযত করিবার সমস্যা কিরূপে পূরণ করিতে সমর্থ হইব তাহা স্থূলভাবে বর্ণনা করিয়াছি। এ সম্বন্ধে যাহা মনে করিয়াছি তাহা পরীক্ষা-সাপেক্ষ। তবে কি উপায়ে আণবিক সন্নিবেশ 'সমুখ' অথবা 'বিমুখ' হইতে পারে? এরূপ দেখা যায় যে, বিদ্যুৎ-প্রবাহ এক দিকে প্রেরণ করিলে নিকটের চুম্বক-শলাকাগুলি ঘুরিয়া একমুখী হইয়া যায় ; বিদ্যুৎ-প্রবাহ অন্য দিকে প্রেরণ করিলে শলাকাগুলি ঘুরিয়া অন্যমুখী হয়। বিদ্যুৎ-বাহক জলীয় পদার্থের ভিতর দিয়া যদি বিদ্যুৎ-স্রোত প্রেরণ করা যায় তবে অণুগুলিও বিচলিত হইয়া যায় এবং অণু-সন্নিবেশ বিদ্যুৎ-স্রোতের দিক অনুসারে নিয়মিত হইয়া থাকে।

স্নায়ুসূত্রে এই উপায়ে দুই প্রকারে আণবিক সন্নিবেশ করা যাইতে পারে। প্রথম পরীক্ষা লজ্জাবতী লইয়া করিয়াছিলাম। আঘাতের মাত্রা এরূপ ক্ষীণ করিলাম যে, লজ্জাবতী তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হইল না। তাহার পর আণবিক সন্নিবেশ 'সমুখ' করা হইল। অমনি যে আঘাত লজ্জাবতী কোনোদিনও টের পায় নাই এখন

তাহা অনুভব করিল এবং সজোরে পাতা নাড়িয়া সাড়া দিল। ইহার পর আণবিক সন্নিবেশ 'বিমুখ' করিলাম। এবার লজ্জাবতীর উপর প্রচণ্ড আঘাত করিলেও লজ্জাবতী তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিল না ; পাতাগুলি নিস্পন্দিত থাকিয়া উপেক্ষা জানাইল।

তাহার পর ভেক ধরিয়া পূর্বোক্ত প্রকারে পরীক্ষা করিলাম। যে আঘাত ভেক কোনোদিনও অনুভব করে নাই স্নায়ুসূত্রে 'সমুখ' আণবিক সন্নিবেশে সে তাহা অনুভব করিল এবং গা নাড়িয়া সাড়া দিল। তাহার পর 'কাটা ঘায়ে নুন' প্রয়োগ করিলাম। এবার ব্যাঙ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। কিন্তু যেমনই আণবিক সন্নিবেশ 'বিমুখ' করিলাম অমনি বেদনাজনক প্রবাহ যেন পথের মাঝখানে আবদ্ধ হইয়া রহিল এবং ব্যাঙ একেবারে শান্ত হইল।

সুতরাং দেখা যায় যে, স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনা-প্রবাহ ইচ্ছানুসারে হ্রাস অথবা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। এই হ্রাস-বৃদ্ধি আণবিক সন্নিবেশের উপর নির্ভর করে। একরূপ সন্নিবেশ উত্তেজনার প্রবাহ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, অন্যরূপ সন্নিবেশে উত্তেজনার প্রবাহ আড়ষ্ট হইয়া যায়। আরও দেখা যায়, এই আণবিক সন্নিবেশ এবং তজ্জনিত উত্তেজনা-প্রবাহের হ্রাস-বৃদ্ধি বাহিরের নির্দিষ্ট শক্তি প্রয়োগে নিয়মিত করা যাইতে পারে। ইহা কোনো আকস্মিক কিংবা দৈবঘটনা নহে, কিন্তু পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক সত্য। ইহাতে কার্য-কারণের সম্বন্ধ অকাট্য।

বাহিরের শক্তি দ্বারা যাহা ঘটিয়া থাকে ভিতরের শক্তি দ্বারাও অনেক সময়ে তাহা সংঘটিত হয়। বাহিরের আঘাতে হস্ত-পেশী যেরূপ সংকুচিত হয়, ভিতরের ইচ্ছায়ও হস্ত সেইরূপ সংকুচিত হয়। উল্টা রকমের হুকুমে হাত শ্লথ হইয়া যায়। ইহাতে দেখা যায় যে, স্নায়ুসূত্রে আণবিক সন্নিবেশ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিয়মিত হইতে পারে। তাহা হইলে ভিতরের শক্তিবলেও স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনা-প্রবাহ বর্ধিত অথবা সংযত হইতে পারিবে। তবে এই দুই প্রকার আণবিক সন্নিবেশ করিবার ক্ষমতা বহু দিনের অভ্যাস ও সাধনা সাপেক্ষ। শিশু প্রথম প্রথম হাঁটিতে পারে না ; কিন্তু অনেক দিনের চেষ্টা ও অভ্যাসের ফলে চলাফেরা স্বাভাবিক হইয়া যায়।

সুতরাং মানুষ কেবল অদৃষ্টেরই দাস নহে, তাহারই মধ্যে এক শক্তি নিহিত আছে যাহার দ্বারা সে বহির্জগৎ-নিরপেক্ষ হইতে পারে। তাহারই ইচ্ছানুসারে বাহির ও ভিতরের প্রবেশ-দ্বার কখনও উদ্ঘাটিত, কখনও অবরুদ্ধ হইতে পারিবে। এইরূপে দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতার উপর সে জয়ী হইবে। যে ক্ষীণ বার্তা শুনিতে পায় নাই তাহা শ্রুতিগোচর হইবে, যে লক্ষ্য সে দেখিতে পায় নাই তাহা তাহার নিকট জাজ্বল্যমান হইবে। অন্যপ্রকারে সে বাহিরের সর্ব বিভীষিকার অতীত হইবে। অন্তরাজ্যে স্বেচ্ছাবলে সে বাহিরের ঝঞ্ঝার মধ্যেও অক্ষুব্ধ রহিবে।

ভিতরের শক্তি তো স্বেচ্ছা! তবে জীবনের কোন্ স্তরে এই শক্তির উদ্ভব হইয়াছে? শুষ্ক তৃণ জল-স্রোতে ভাসিয়া যায়। কিন্তু জীব কেবল বাহিরের প্রবাহ দ্বারাই পরিচালিত হয় না, বরং ঢেউয়ের আঘাতে উত্তেজিত হইয়া স্রোতের বিরুদ্ধে সন্তরণ করে। কোন্ স্তরে তবে এই যুঝিবার শক্তি জাগিয়া উঠিয়াছে? ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীব-বিন্দু কখনও বাহিরের শক্তি গ্রহণ করে, কখনও ভিতরের শক্তি দিয়া প্রতিহার করে। গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান করিবার ক্ষমতাই তো ইচ্ছা-শক্তি।

আর ভিতরের শক্তিই বা কিরূপে উদ্ভূত হইয়াছে? বাহিরের ও ভিতরের শক্তি কি একেবারেই বিভিন্ন? পূর্বে বলিয়াছি যে, বনচাঁড়ালের পাতা দুইটি ভিতরের শক্তিবলে আপনা-আপনিই নড়িতে থাকে। কিন্তু গাছটিকে দুই দিন অন্ধকারে রাখিয়া দেখিলাম যে, পাতা দুইটি একেবারেই নিশ্চল হইয়া গিয়াছে। ইহার কারণ এই যে, ভিতরের শক্তি যাহা সঞ্চিত ছিল তাহা এখন ফুরাইয়া গিয়াছে। এখন পাতা দুইটির উপর ক্ষণিকের জন্য আলো নিক্ষেপ করিলে দেখা যায় যে, পাতা নড়িয়া সাড়া দিতেছে; কিন্তু আলো বন্ধ করিলেই পাতার স্পন্দন থামিয়া যায়। ইহার পর অধিক কাল আলোক নিক্ষেপ করিলে এক অদ্ভুত ঘটনা দেখা যায়। এবার আলো বন্ধ করিবার পরেও পাতা দুইটি বহুক্ষণ ধরিয়া যেন স্বেচ্ছায় নড়িতে থাকে। ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর ঘটনা আর কি হইতে পারে? দেখা যায়, আলোরূপে যাহা বাহিরের শক্তি ছিল, গাছ তাহা গ্রহণ করিয়া নিজস্ব করিয়া লইয়াছে এবং বাহির হইতে সঞ্চিত শক্তি এখন ভিতরের শক্তির রূপ ধারণ করিয়াছে। সুতরাং বাহিরের ও ভিতরের শক্তি প্রকৃতপক্ষে একই; সামান্য বিভিন্নতা এই যে, যাহা পর্দার ও-পারে ছিল তাহা এ-পারে আসিয়াছে; যাহা পর ছিল তাহা আপন হইয়াছে। আরও দেখা যায় যে, এইরূপ স্বতঃস্পন্দিত অবস্থায় পাতাটি বাহিরের আঘাতে বিচলিত হয় না। সে এখন বাহিরের শক্তি-নিরপেক্ষ, অর্থাৎ ভিতরের শক্তি দিয়া বাহিরের শক্তি প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছে। যখন ভিতরের সঞ্চয় ফুরাইবে কেবল তখনই গ্রহণ করিবে এবং পরে স্বেচ্ছাক্রমে প্রত্যাখ্যান করিবে। জীবনের কোন্ স্তরে তবে ভিতরের শক্তি ও স্বেচ্ছা উদ্ভূত হইয়াছে?

জন্মিবার সময় ক্ষুদ্র ও অসহায় হইয়া এই শক্তিসাগরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলাম। তখন বাহিরের শক্তি ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমার শরীর লালিত ও বর্ধিত করিয়াছে। মাতৃ-স্তন্যের সহিত স্নেহ মায়া মমতা অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে এবং বন্ধুজনের প্রেমের দ্বারা জীবন উৎফুল্ল হইয়াছে। দুর্দিন ও বাহিরের আঘাতের ফলে ভিতরের শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে এবং তাহারই বলে বাহিরের সহিত যুঝিতে সক্ষম হইয়াছি।

ইহার মধ্যে আমার নিজস্ব কোথায়? এই সবের মূলে আমি না তুমি?

একের জীবনের উচ্ছ্বাসে তুমি অন্য জীবন পূর্ণ করিয়াছ; অনেকে তোমারই নির্দেশে জ্ঞান-সন্ধানার্থে জীবনপাত করিয়াছে, মানবের কল্যানহেতু রাজ্য-সম্পদ ত্যাগ করিয়া দুঃখ-দারিদ্র্য বরণ করিয়াছে এবং দেশসেবায় অকাতরে বধ্যমঞ্চে আরোহণ

করিয়াছে। সেই সব জীবনের বিক্ষিপ্ত শক্তি অন্য জীবন জ্ঞান ও ধর্মে, শৌর্য ও বীর্যে পরিপূরিত করিয়াছে।

ভিতর ও বাহিরের শক্তি-সংগ্রামেই জীবন বিবিধরূপে পরিস্ফুটিত হইতেছে। উভয়ের মূলে একই মহাশক্তি, যদ্দ্বারা অজীব ও সজীব, অণু ও ব্রহ্মাণ্ড অনুপ্রাণিত। সেই শক্তির উচ্ছ্বাসেই জীবনের অভিব্যক্তি। সেই শক্তিতেই মানব দানবত্ব পরিহার করিয়া দেবত্বে উন্নীত হইবে।

[সাহিত্য পরিষদের বক্তৃতার বিষয়বস্তু অবলম্বনে প্রবন্ধ। বক্তৃতার তারিখ ১৩২৭ সালের ১৯ শে চৈত্র। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় এই বক্তৃতার আসর বসে বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের বক্তৃতা কক্ষে। এই নবম বিশেষ অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন মহামহো-পাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। বক্তৃতা আরম্ভের আগে সভাপতির ভাষণে শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছিলেন,—

"চারি বৎসর পূর্বে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু সাহিত্য পরিষদের সভাপতিরূপে ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে তিনি আজ "স্নায়ু সূত্রে উত্তেজনা প্রবাহ" বিষয়ে বক্তৃতা দিবেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার নূতন আবিষ্ক্রিয়া প্রদর্শিত হইবে"।]

বৃক্ষের অঙ্গভঙ্গী

(১৩২৯ সালের জৈষ্ঠ মাসের প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত এবং 'অব্যক্ত' গ্রন্থের শত-বার্ষিকী সংস্করণেও এটি সংযোজিত হয় ২২শ ভাগ ১ম খণ্ড)

মানুষের অঙ্গভঙ্গী হইতে তাহার ভিতরের অবস্থা বুঝিতে পারা যায়। সকালবেলা তাহার যে আকৃতি থাকে, দিনের শেষে সারাদিনের ক্লান্তিহেতু তাহা পরিবর্তিত হয়। সুখে সে উৎফুল্ল, দুঃখে সে বিবশ। সব জীবজন্তুর মূর্তি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হইতেছে ; তাহা কেবল ভিতরের পরিবর্তনজনিত নহে। বাহিরের আঘাতেও তাহার অঙ্গভঙ্গী বিভিন্ন হইয়া যায়। তাড়নায় কুপিতা ফণিনী মুহূর্তেই সংহাররূপিণী হইয়া থাকে।

এইরূপে অহরহ ভিতর ও বাহিরের শক্তির দ্বারা তাড়িত হইয়া জীব বহুরূপী হইয়াছে। ভিতরের শক্তির সহিত বাহিরের শক্তির নিরন্তর সংগ্রাম চলিতেছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বাহিরের আঘাতের ফলেই ভিতরের শক্তি দিন দিন পরিস্ফুট হইয়া থাকে।

এক সময়ে ভিতরে কিছুই ছিল না, বাহির হইতে শক্তি প্রবেশ করিয়া ভিতরে সংস্থিত হইয়াছে। যাহা বাহিরে অসীম ছিল, তাহাই ভিতরে সসীম হইল ; এবং সেই ক্ষুদ্র তখন বৃহতের সহিত যুঝিতে সমর্থ হয়। সেই ক্ষুদ্র কখনও বাহিরকে বরণ করে, কখনওবা প্রত্যাখ্যান করে। জীবনের এই লীলা বৈচিত্র্যময়ী।

জীবের ন্যায় বৃক্ষের ভঙ্গীও সর্বদা পরিবর্তিত হইতেছে। পাতা কখনও আলোর সন্ধানে উন্মুখ হয়, কখনও প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ হইতে বিমুখ হয়। এই সকালবেলায় বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলাম যে, সূর্যমুখীর গাছটি পূর্বগগনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। পাতাগুলি ঘুরিয়া এরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক পাতার উপরে যেন সূর্যরশ্মি পূর্ণরূপে পতিত হয়। ইহার জন্য কোনো পাতা উপরের দিকে উঠিয়া থাকে, আর পাশের পাতাগুলি ডান কিংবা বাম দিকে পাক খাইয়া সূর্যকিরণ পূর্ণমাত্রায় আহরণ করে। বৈকালবেলায় দেখিতে পাইলাম, গাছ ও পাতা পশ্চিম গগনোন্মুখ হইয়াছে, ডাল এবং সব পাতাগুলি ঘুরিয়া গিয়াছে। কি শক্তির বলে এই পরিবর্তন ঘটিল ? বাহিরের সহিত ভিতরের এ কি অদ্ভুত সম্বন্ধ ! সূর্য তো প্রায় পাঁচ কোটি ক্রোশ দূরে, তবে কি রাখীবন্ধনে গাছ দিবাকরের সহিত এইরূপ সম্মিলিত হইল ?

উদ্ভিদ বিদ্যা সম্বন্ধীয় পুস্তকে দেখা যায় যে, সূর্যমুখীর এই ব্যবহার "হীলিও-ট্রোপিজম্"-জনিত। হীলিওট্রোপিজমের বাংলা অনুবাদ, সূর্যের দিকে মুখ হওয়া। সূর্যমুখী কেন সূর্যের দিকে আকৃষ্ট হয় ? কারণ 'সূর্যের দিকে মুখ' হওয়াই তাহার প্রবৃত্তি ! যখন কোনো বিষয়ের প্রকৃত সন্ধান না পাইয়া মানুষ উৎকণ্ঠিত হয়, তখন

কোনো দুর্বোধ্য মন্ত্রতন্ত্র তাহাকে নিশ্চিন্ত করে। তবে সেই মন্ত্রটি সংস্কৃত, লাটিন, কিংবা গ্রীক ভাষায় হওয়া আবশ্যক। সোজা বাংলায় কিংবা অন্য আধুনিক ভাষায় হইলে মন্ত্রের শক্তি থাকে না। এই জন্যই গ্রীক হীলিওট্রোপিজ্‌ম্‌ মন্ত্রে সূর্যমুখীর ব্যবহার বিশদ হইল!

সে যাহাই হউক, ইহার পশ্চাতে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। এই সব অঙ্গভঙ্গী অদৃশ্য জীববিন্দুর প্রকৃতিগত কোনো পরিবর্তন দ্বারাই সাধিত হয়। জীববিন্দুর পরিবর্তন অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও অদৃশ্য। তবে কিরূপে সেই অপ্রকাশকে সুপ্রকাশ করা যাইতে পারে? বহু চেষ্টার পর বিদ্যুৎ বলে সেই অদৃশ্য জগৎকে দৃষ্টিগোচর করিতে সমর্থ হইয়াছি। এই বিষয়ে দুই-একটি কথা পরে বলিব।

কেবল সূর্যমুখীই যে আলোক দ্বারা আকৃষ্ট হয়, এরূপ নহে। টবে বসানো একটি লতা অন্ধকার ঘরে রাখিয়া দিয়াছিলাম। রুদ্ধ জানালার একটি রন্ধ্র দিয়া অতি ক্ষুদ্র আলোকরেখা আসিতেছিল। পরের দিন দেখিলাম, সব পাতাগুলি ঘুরিয়া সেই ক্ষীণ আলোকের দিকে প্রসারিত হইয়াছে।

লজ্জাবতী লতাতেও এইরূপ ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। টবে বসানো লতাটি যদি জানালার নিকটে রাখা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, সব পাতাগুলি ঘুরিয়া বাহিরের আলোর দিকে মুখ করিয়া রহিয়াছে। টব ঘুরাইয়া দিলে পাতাগুলি পুনরায় নূতন করিয়া ঘুরিয়া যায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পাতাগুলি কেবল উঠে এবং নামে তাহা নয়, কোনোগুলি ডান দিকে এবং কোনোগুলি বাম দিকে পাক খায়। পাতার ডাঁটার গোড়ায় যে স্থূল পেশী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার দ্বারাই পাতাগুলি ঘুরিয়া থাকে, কখনও উঠানামা করে, কখনও ডান দিকে কিংবা বাম দিকে পাক খায়। পূর্বে বিশ্বাস ছিল যে, পাতার গোড়ায় একটিমাত্র পেশী আছে যাহার দ্বারা কেবলমাত্র উঠানামা হয়। কিন্তু আমাদের হাত ঘুরাইতে হইলে অনেকগুলি পেশীর আকুঞ্চন এবং প্রসারণের আবশ্যক। অনুসন্ধান করিতে গিয়া জানিতে পারিলাম যে, লজ্জাবতী পাতার মূলে চারিটি বিভিন্ন পেশী আছে, যাহার অস্তিত্ব ইতিপূর্বে কেহই মনে করিতে পারেন নাই। একটি পেশীর দ্বারা পাতা উপরের দিকে উঠে, আর একটির দ্বারা নীচের দিকে নামে, অন্য একটির দ্বারা ডান দিকে পাক খায় এবং চতুর্থ পেশীর দ্বারা বাম দিকে ঘুরিয়া যায়।

ইহার প্রমাণ কি? প্রমাণ এই যে, পালক দ্বারা উপরের পেশীটুকুতে সুড়সুড়ি দিলে পাতাটি উপরের দিকে উঠে এবং সেই ঊর্ধ্ব গতি যন্ত্রের দ্বারা লিখিত হয়। এক নম্বরের বা চারি নম্বরের পেশীকে এইরূপে উত্তেজিত করিলে পাতাটি বাম দিকে বা ডান দিকে পাক খায়, দুই নম্বর বা তিন নম্বরটিকে ঐরূপ উত্তেজিত করিলে পাতা নীচে নামে বা উপরে উঠিয়া যায়। সূর্যের আলো এইরূপে পেশীর নানা অংশে নিক্ষেপ করিলে উক্তবিধ সাড়া পাওয়া যায়। তবে সূর্যের আলোক তো সব সময়ে পত্রমূলে পড়ে না, কারণ পাতার ছায়ায় পত্রমূলটি ঢাকা থাকে। লজ্জাবতীর বড়ো ডাঁটাটির সহিত চারিটি ছোটো ডাঁটা সংযুক্ত, এবং সেই ছোটো ডাঁটার গায়ে অনেক ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র পাতা থাকে। আলো সেই ক্ষুদ্র পাতার উপরই পড়ে। পড়িবামাত্রই দেখা যায় যে পাতা নড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু পাতার নড়াচড়া তো সেই দূরের স্থূল পেশীর আকুঞ্চন প্রসারণ ভিন্ন হইতে পারে না। তবে ছোটো পাতাগুলি আলোর অনুভবজনিত উত্তেজনায় কি সংকেত কোন্ পথ দিয়া দূরে পাঠাইয়া থাকে? এই বিষয়ে অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম যে, চারিটি ছোটো ডাঁটা হইতে পাতার মূল পর্যন্ত চারিটি বিভিন্ন স্নায়ুসূত্র প্রসারিত। তাহার দ্বারাই খবরাখবর পেঁছিয়া থাকে। এক নম্বরের ক্ষুদ্র পাতাগুলিকে কোনোরূপে উত্তেজিত করিলে একটি মাত্র সূত্র দিয়া পত্রমূলের এক নম্বর পেশীতে উত্তেজনা প্রেরিত হয়, অমনি পাতাটি বাম দিকে পাক খাইয়া যায়। চারি নম্বরের পাতাগুলিকে ঐরূপে উত্তেজিত করিলে ডান দিকে পাক খায়। দুই নম্বরের পাতাগুলিকে উত্তেজিত করিলে বড়ো পাতাটি নীচের দিকে পড়ে। তিন নম্বরের ছোটো পাতাগুলিকে উত্তেজিত করিলে উপরের দিকে উঠিয়া যায়। সুতরাং দেখা যায়, পাতার বাহির দিক হইতে ভিতরের দিকে হুকুম পাঠাইবার চারিটি রাশ আছে। কে সেই বল্গা টানিয়া সংকেত পাঠায়?

কেবল তাহাই নহে। কোনো নির্দিষ্ট দিকে চালিত করিবার জন্য একটা বল্গা টানিলে তাহা সাধিত হয় না। নৌকার একটি দাঁড় টানিলে নৌকা কেবল ঘুরিতে থাকে। দিশাহীন তবে এক দিকের টান! অন্ততঃ দুই দিকের দুইটি সমবেত টান দ্বারা গন্তব্য পথ নির্দিষ্ট হয়। এক সময়ে দুইটি দাঁড় টানা আবশ্যক।

পতঙ্গ আলোর দিকে ছুটিয়া যায়। তাহার দুইটি চক্ষুর উপর আলো পড়ে। প্রত্যেক চক্ষুর সহিত তাহার এক-একটি পাখার সংযোগ। একটি চক্ষু অন্ধ হইলে সে আর আলোর দিকে যাইতে পারে না। এক দাঁড়ের নৌকার ন্যায় কেবল ঘুরিতে থাকে। যখন দুইটি চক্ষুর উপর আলো পড়ে। কেবল তখনই দুটি ডানা একসঙ্গে একই বলে আন্দোলিত হয়, এবং সে সোজা পথে আলোর দিকে ধাবিত হয়। আলো যদি পাশে ঘুরাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে উহা কেবল একটি চক্ষুর উপর পড়ে, সেইজন্য একটি পাখা প্রবল বেগে স্পন্দিত হয় এবং পতঙ্গটি ঘুরিয়া যায়। ঘুরিয়া যখন আলোর সোজাসুজি আলোমুখীন হয় এবং আলো দুইটি চক্ষুর উপর সমানভাবে পড়ে, তখন দুইটি পাখাই সমানভাবে একই শক্তিতে স্পন্দিত হইতে থাকে এবং পতঙ্গ তাহার অভিষ্ট লাভ করে—জীবন কিংবা মরণে!

দুইটি দাঁড়ের দ্বারা তরণী কেবল নদী বক্ষের উপরই গন্তব্য দিকে ধাবিত হইতে পারে। কিন্তু সর্বদিগ্‌বিহারী জীব কখনও দক্ষিণে কখনও বামে, কখনও উর্ধ্বে কখনও বা অধোদিকে ধাবিত হইতে চাহে। এরূপ সর্বমুখী গতি নিরূপণ করিবার অন্ততঃ চারিটি রশ্মির আবশ্যক।

লজ্জাবতী পাতার প্রতিকোষই আলোক ধরিবার ফাঁদ। সেই আলোর উত্তেজনা এক-একটি স্নায়ুসূত্র ধরিয়া পত্রমূলের পেশীতে উপস্থিত হয়। যতক্ষণ-না চারিটি ডাঁটার পত্রসমষ্টি সমানভাবে আলোকমুখীন হয়, ততক্ষণ চারিটি বল্গার টানের

ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। পত্ররথ তখন দক্ষিণে কিংবা বামে, ঊর্ধ্বে কিংবা নিম্নে চালিত হয়।

সবিতার রথ

সারথি তবে কে? দিবাকর নিজকে কোটি কোটি অংশে বিভক্ত করিয়া ধরা পৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত। জানালার ক্ষুদ্র রন্ধ্র দিয়া সূর্যদেবের শত শত মূর্তি মেঝের উপর দেখিতে পাই।

সবিতা তবে প্রতি পত্রকে তাঁহার রথরূপে গ্রহণ করেন। পত্রের চারিটি বল্গা তাঁহারই হস্তে। অনন্ত আকাশ বাহিয়া সীমাহীন তাঁহার গতি। কিন্তু এই অসীম পথ প্রদক্ষিণ করিবার সময়ও ধূলিকণার ন্যায় এই পৃথিবী এবং তাহা হইতে উত্থিত ক্ষুদ্র লতার অতি ক্ষুদ্র পাতাটিরও আহ্বান উপেক্ষা করেন না। নিজের শক্তির দ্বারা প্রতি জীববিন্দুকে স্পন্দিত করেন এবং ক্ষুদ্র পাতাটির গতি নিরূপণ করিয়া থাকেন। জীবন এবং জীবনের গতির মূলে সেই শক্তিই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

সর্বভূতের চালক তুমি, তোমার তেজোরাশিকে উদ্দীপ্ত রাখিতেছেন!

উদ্ভিদের হৃৎস্পন্দন

[প্রবাসী পত্রিকার ১৩৩২ সালের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত। প্রবন্ধটির মুখবন্ধে প্রবাসী পত্রিকায় লেখা আছে; "গত এক বৎসরের মধ্যে বসু বিজ্ঞানমন্দিরে উদ্ভিদ জীবনের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে তিনটি গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। এই আবিষ্কার সমস্ত বৈজ্ঞানিক জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছে। গত মাসে দার্জিলিং-এর গবর্নমেণ্ট হাউসে লর্ড লিটনের নিমন্ত্রণে যে সভা আহূত হয় তাহাতে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু উদ্ভিদের পেশীমণ্ডল আবিষ্কারের ঘোষণা করেন। গত ১৪ই অগ্রহায়ণ বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠাদিগের অষ্টম বার্ষিক উৎসব সভায় তিনি উদ্ভিদের হৃৎস্পন্দন ও রসসঞ্চালন সর্বসমক্ষে প্রদর্শন করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ ইংরেজি মডারন রিভিয়ুতে প্রকাশিত বক্তৃতা ও আচার্য বসুর অন্যান্য প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত হইল।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রবন্ধে উল্লিখিত যন্ত্রগুলির অধিকাংশই আজও সবল অবস্থায় আছে।]

বত্রিশ বৎসর পূর্বে আমি অদৃশ্য বৈদ্যুতিক রশ্মি সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করি। হার্জ (Hertz) আবিস্কৃত বৈদ্যুতিক তরঙ্গ অতি বৃহদাকার বলিয়া, সরলরেখায় ধাবিত না হইয়া বক্র হইয়া যাইত। দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোর প্রকৃতি যে একই, তাহা প্রমাণ করিতে হইলে আলোর ঊর্মি খর্ব করা আবশ্যক। আমি যে কল নির্মাণ করিয়াছিলাম তাহা দ্বারা প্রেরিত আকাশ ঊর্মির দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির ছয় ভাগের একভাগ মাত্র। এই আলো আমরা দেখিতে পাই না, হয়ত অন্য জীবে দেখিতে পায়। পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, এই আলোকে উদ্ভিদ উত্তেজিত হইয়া থাকে। অদৃশ্য আলো উপলব্ধি করিবার কোনো বিশ্বাসযোগ্য কল তৎকালে ছিল না। আমা কর্তৃক গ্যালিনা রিসিভর উদ্ভাবিত হওয়াতে বহুদূর হইতে প্রেরিত সংবাদ পাইবার সম্ভাবনা হইল। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে আমি সর্বসমক্ষে বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। বিদ্যুৎ ঊর্মি গবর্নরের বিশাল দেহ এবং আরও দুইটি রুদ্ধ কক্ষ ভেদ করিয়া তৃতীয় কক্ষে নানাপ্রকার তোলপাড় করিয়াছিল। তাহা একটা লোহার গোলা নিক্ষেপ করিল, পিস্তল আওয়াজ করিল এবং বারুদস্তুপ উড়াইয়া দিল।

জীব ও অজীব

তারহীন কল লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে দেখিলাম হঠাৎ কলের সাড়া কোনো অজ্ঞাত কারণে বন্ধ হইয়া গেল। মানুষের লেখাভঙ্গী হইতে তাহার শারীরিক দুর্বলতা ও ক্লান্তি যেরূপ অনুমান করা যায়, কলের সাড়ালিপিতে সেই একইরূপ চিহ্ন দেখিলাম।

আরও আশ্চর্যের বিষয় এই, যে বিশ্রামের পর কলের ক্লান্তি দূর হইল এবং পুনরায় সাড়া দিতে লাগিল। উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগে তাহার সাড়া দিবার শক্তি বাড়িয়া গেল এবং বিষ প্রয়োগে তাহার সাড়া একেবারে অন্তর্হিত হইল। যে সাড়া দিবার শক্তি, জীবনের এক প্রধান চিহ্ন বলিয়া গণ্য হইত, জড়েও তাহার ক্রিয়া দেখিতে পাইলাম। এইরূপে বহুর মধ্যে একত্বের সন্ধান পাইয়াছিলাম।

উদ্ভিদের সাড়া

ইহার পরে আমি উদ্ভিদের চেতনা-সম্বন্ধে গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলাম। তখন সর্ব্ববাদিসম্মত মত এই ছিল যে, উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন ধারার মধ্যে প্রভূত পার্থক্য আছে। আহত হইলে প্রাণী দ্রুত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা করে; তাহার হৃদ্‌যন্ত্র সর্বদা স্পন্দিত হয়। এতদ্ব্যতীত প্রাণী, ইন্দ্রিয় সাহায্যে বাহ্যদ্রব্য উপলব্ধি করিতে পারে। অপর পক্ষে বৃক্ষাদির সঙ্কোচন বা প্রসারণ করিবার ক্ষমতা নাই, তাহাতে কোনো স্পন্দন নাই, তাহারা স্নায়ুহীন, ইহাই প্রচলিত বিশ্বাস। দুইটি জীবনধারা পাশাপাশি প্রবাহিত হইতেছে। অথচ তাহাদের জীবনে কোথাও ঐক্যের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় নাই। এই ভ্রান্ত বিশ্বাস বহুদিন যাবৎ উদ্ভিজ্জীবনের জ্ঞানের পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। যেদিন এমন যন্ত্র আবিষ্কৃত হইল, যাহার প্রভাবে বৃক্ষ চেতনার সাড়া দিল, সেই দিনই তাহার অজ্ঞাত আভ্যন্তরীণ জীবন যাত্রা-প্রণালী অবগত হওয়া সম্ভবপর হইল। ক্রমে ক্রমে এই সাড়াকে লেখায় পরিণত করিবার যন্ত্রাদি আবিষ্কার করিতে হইয়াছে, সেই লেখা পড়িবার কৌশলাদিও উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে। এই নূতন পন্থায় গবেষণার ফলে এই সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে প্রাণীর জীবন ও উদ্ভিদের জীবন একই প্রকার। মানুষের যেমন হৃৎস্পন্দন আছে, বৃক্ষলতাদিরও ঠিক সেইরূপ হৃৎস্পন্দন আছে। প্রাণী যেমন মৃত্যু মুখে পতিত হইবার সময় মৃত্যুজনিত আক্ষেপ প্রদর্শন করিয়া থাকে, উদ্ভিদও সেইরকম আক্ষেপ জ্ঞাপন করে। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উত্তেজক ঔষধ বা বিষের প্রক্রিয়া উভয়ের উপরই একই প্রকার। ইহা হইতে বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ মনে করেন যে, উদ্ভিজ্জীবন সম্পর্কিত এই নূতন গবেষণার ফলে ঔষধ বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে। কৃষিকার্যে সাফল্য লাভ করিতে হইলে উদ্ভিদের পরিবর্ধনের ধারা অবগত হওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়। ক্রেস্কোগ্রাফ (Crescograph) যন্ত্রের আবিস্কার হওয়াতে এই ধারার রহস্যও অনাবৃত হইয়াছে।

সাধনা

এই সমস্ত সিদ্ধান্তে উপণীত হইতে বহু গবেষণা করিতে হইয়াছে। এক দিনের চেষ্টায় ইহা সম্ভব হয় নাই। বহু বর্ষ একাগ্রতার সহিত সাধনা করিয়াই ইহা লাভ করা সম্ভবপর হইয়াছে। আট বৎসর পূর্বে আমি যখন বসু বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম, তখন যাহারা এই গবেষণা কার্যে সমস্ত জীবন নিয়োগ করিবে, যাহারা চরিত্রবল এবং দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে ও প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন

করিতে সমর্থ হইবে, কেবল তাহাদিগকেই আমার শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম। ভারতবাসী কোনো কার্যেই অগ্রণী হইতে অক্ষম— এই কলঙ্ক ভারতীয়গণকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। চিরদিনের জন্য সেই তথাকথিত কলঙ্ক কালিমা মুছাইতে কৃত সঙ্কল্প হইয়াছিলাম।

অন্তর্দৃষ্টি

অতি মহৎ আবিষ্কার করিতে হইলে প্রবল অন্তর্দৃষ্টি ও সূক্ষযন্ত্র আবিষ্কার ও নির্মাণের দক্ষতা ও অনুসন্ধান করিবার কৌশল জানা আবশ্যক। অন্তর্দৃষ্টিশূন্য ও উদ্দেশ্যবিহীন অনুসন্ধানের কোনই সার্থকতা নাই। ভারতের চিন্তা এবং উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যের ফলে ভারত জ্ঞান প্রচার ক্ষেত্রে বিশেষরূপে পারদর্শী। আপাত দৃষ্টিতে বৈষম্যপূর্ণ ঘটনাবলীর মধ্যে ভারতীয় কল্পনাশক্তি ঐক্যের সন্ধান পায়। একাগ্র সাধনার সেই শক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত করা যায়। এই ক্ষমতায় আবার মনকে ধৈর্যশালী করে ও সত্যের অনুসন্ধানে সক্ষম করিয়া তোলে। মনোমন্দিরই প্রকৃত বিজ্ঞানমন্দির।

উদ্ভিদের আভ্যন্তরীণ প্রাণ যন্ত্রের গূঢ় রহস্য অবগত হইতে হইলে অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা উদ্ভিদের হৃৎস্পন্দন অনুভব করিতে হইবে। এই অন্তর্দৃষ্টি মাঝে মাঝে পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্তব্য ; অপরীক্ষিত কল্পনা, চিন্তারাশিকে বিপথগামী করে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা যখন কিছু দৃষ্ট হয় না, তখনও আমাদিগকে অদর্শণীয়ের অনুসরণ করিতে হয়। কারণ, যাহা আমাদের দৃষ্টি পথের বাহিরে থাকে, তাহার তুলনায় আমরা যতটুকু দেখিতে পাই তাহা একান্তই সামান্য। সেই অদৃশ্য রাজ্যে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিবার জন্য ক্রেস্কোগ্রাফ (Crescograph) আবিষ্কার করিতে হইয়াছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে সমস্ত জিনিষই তাহার আসল মাপ হইতে দশ কোটি-গুণ বৃহৎ হয়। তাহাতে দৃষ্টির বহির্ভূত জীবনের মূলগতি প্রত্যক্ষ করা সম্ভবপর হইয়াছে। এই যন্ত্র ব্যবহার করিতে হইলে হস্ত সম্পূর্ণরূপে মনের অধীন করিতে হয়। নচেৎ যন্ত্র অব্যবহার্য হইয়া যায়। দেহের উপর মনের প্রভাব অপরিসীম এবং মনের বল দ্বারা যে সাফল্য লাভ করা সম্ভবপর হইয়াছে তাহা ইন্দ্রজালকেও পরাজিত করিয়াছে। বিশেষ শিক্ষার দ্বারাই এই সমস্ত শক্তির উৎকর্ষ সাধন করা সম্ভব। বিগত আট বৎসরে এই বিজ্ঞানমন্দিরের ২০০টি বিষয়, এই কারণে সাফল্যের সহিত পরীক্ষিত হইরাছে।

বৃক্ষে রস-সঞ্চালন

অন্তর্দৃষ্টি এবং অবিরাম অনুসন্ধিৎসা দ্বারা সুকঠিন সমস্যাসমূহ কি প্রকারে পূরিত হয়। আমার বর্তমান আবিষ্কার তাহারই প্রমাণ। বৃক্ষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কি করিয়া রস সঞ্চালিত হয়, এই সমস্যা লইয়া দুইশত বর্ষের অধিককাল অনুসন্ধান চলিয়াছে। কিন্তু কোনো সুমীমাংসা হয় নাই। মাটি হইতে বহু উচ্চে গাছের উপরে জল উপরে উঠে।

কি উপায়ে জলের গতি নিরূপিত হয় ইহা বহুদিন ধরিয়া এক সমস্যা ছিল। এই রস-সঞ্চালন কি জড়শক্তির প্রভাবে হয় না জীবনী-শক্তির ফল? এই প্রশ্ন সমাধানের জন্য স্ট্রাসবর্গার (Strasburger) বৃক্ষে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং মনে করিয়াছিলেন যে, তাহাতে রস-সঞ্চালনের কোন ব্যতিক্রম ঘটায় নাই। কাজেই তিনি মত দেন, জীবনী-শক্তি ঐরূপ রস সঞ্চালন হইতে পারে না। জড় বিজ্ঞানের মধ্যে ইহার কারণ অনুসন্ধান চলিতে লাগিল— কল্পনার সহিত সত্যের সামঞ্জস্য ঘটাইবার জন্য অদ্ভুত অদ্ভুত যুক্তির অবতারণা করা হইল। কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। এমন কোনো নিদর্শক বাহির করিবার চেষ্টা হইল না, যাহার সাহায্যে রস-সঞ্চালনের নির্দেশ পাওয়া যায়।

এ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া আমি দেখাইলাম যে উদ্ভিদের পত্র রস-সঞ্চালনের নির্দেশক। রসের দ্রুত সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গেই বৃক্ষের পাতা সতেজ হইয়া ঊর্ধ্বে উঠে এবং সঞ্চালনে বাধা পড়িলে পাতা ঢলিয়া পড়ে। পাতার গতিবিধি এত সূক্ষ্ম যে সহজে তাহা লক্ষীভূত হয় না। আমি অপ্টিক্যাল লিভার (optical lever) দ্বারা এই অসুবিধা দূর করিলাম। এই যন্ত্রের একটি দণ্ডের একদিক একটি সূত্রদ্বারা পাতার সহিত বাঁধা থাকে। দণ্ডটির সহিত একটি দর্পণ সংলগ্ন থাকে। পাতার গতিবিধি এই দর্পণে প্রতিফলিত হয়। এইরূপে পাতার অতিসামান্য উত্থান-পতন এই যন্ত্রের সাহায্যে অতি সহজেই ৫ হাজার গুণ পরিবর্ধিত আকারে দেখা যায়। এই গবেষণার ফলে স্ট্রাসবুর্গারের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

নাড়ীর স্পন্দন প্রতিফলিত আলোকরশ্মির সাহায্যে বড় করিয়া দেখাইতে পারা যায়। কব্জির নিকটস্থ কাড়ীটি বাহিরেই অবস্থিত, সুতরাং নাড়ীর স্পন্দন সহজেই অনুভব করা যায়। মানুষের নাড়ীস্পন্দন সাধারণ অবস্থায় প্রতি মিনিটে ৭২ বার হয়। উত্তেজনার ফলে হৃদ্‌যন্ত্র সতেজ হয় ও তাহাতে রক্তের চাপ বৃদ্ধি হয়। রেকর্ডারে (recorder) ঊর্ধ্বরেখা অধোরেখা হইতে দীর্ঘতর দেখা যায়। পক্ষান্তরে অবসাদের সময় অধোরেখা দীর্ঘতর হয় এবং রক্তের চাপ কমিয়া যায়। কিন্তু এই নাড়ী মাংস-পেশীতে নিমজ্জিত থাকিলে স্পন্দন অনুভূত হয় না বা রক্তচাপ নির্ণয় করা যায় না। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রাণীর রক্তচাপের মতন বৃক্ষের রসচাপ কি বর্দ্ধিত কিম্বা অবনন্ন হয়। এই অনুসন্ধান স্বভাবতই ব্যর্থ চেষ্টা বলিয়া মনে হইবে। প্রত্যেক স্পন্দের দরুণ যে সঙ্কোচ-প্রসারণ হয় অত্যুৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও তাহা পরিলক্ষিত হয় না। তাহা ছাড়া অন্যান্য পেশীর মধ্যে বৃক্ষ হৃদয় নিমজ্জিত। সুতরাং এই অদৃশ্য ও অবোধ্যকে কি করিয়া দৃশ্যমান করা সম্ভব হইবে?

উদ্ভিদের হৃদয় সন্ধান

তবে বৃক্ষের হৃদয় কোথায়? এই তথ্য প্রথমে আমার নূতন উদ্ভাবিত বিদ্যুৎ শলাকা দ্বারা আবিষ্কৃত হইল। শিলপন্দিত পেশীর সহিত বৈদ্যুতিক সংস্পর্শ ঘটাইলে তাড়িতমান যন্ত্র নিঃস্পন্দ থাকে। কিন্তু যদি ইহার সহিত স্পন্দমান হৃদযন্ত্রের সংস্পর্শ

ঘটে। তাহা হইলে ঐ স্পন্দনের অনুরূপ বৈদ্যুতিক স্পন্দন প্রতিফলিত হয়। বৃক্ষের হৃদয়ের অধিষ্ঠান স্থান নির্ণয় করিবার নিমিত্ত আমি বৃক্ষের কাণ্ডের ধাপে ধাপে বৈদ্যুতিক শলাকা প্রবিষ্ট করাইয়া দেখিয়াছিলাম যে, সে মুহূর্তে ঐ শলাকা স্পন্দমান স্তরের সংস্পর্শে আসে সেই মুহূর্তে বৈদ্যুতিক সাড়া পাওয়া যায়। ঐ সাড়া গ্যালভানোগ্রাফ (Galvanograph) যন্ত্রে লেখা হয়। প্রত্যেকটি জীবকোষ প্রসারণ কালে নিম্নদেশ হইতে জল চুষিয়া লয় এবং সঙ্কোচনের সময় উহা ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করে। উদ্ভিদের হৃদ্‌যন্ত্র নিম্নশ্রেণীর জীবের হৃদযন্ত্রেরই অনুরূপ।

হৃদয়-স্পন্দন অনুভব করার যন্ত্র

ইহার পর অন্য সমস্যা মনে উদিত হইল। বিদ্যুৎশলাকা প্রবেশ না করাইয়া বাহির হইতে বৃক্ষের হৃদয় স্পন্দন কি কোনদিন আমাদের অনুভূতিগ্রাহ্য হইবে ? যখন স্পন্দিত রস-প্রবাহ বৃক্ষে সঞ্চারিত হয় তখন প্রত্যেক ঢেউ বৃক্ষকে ক্ষণিকের জন্য প্রসারিত করে ; ঢেউটি চলিয়া গেলে বৃক্ষ পুনরায় পূর্ব আকার ধারণ করে। এই অদৃষ্ট ও অস্পশ্য মনুষ্য প্রত্যক্ষগোচর করিবার জন্য কল্পনারও অতীত অনুভবযন্ত্র আবিষ্কার করিতে হইয়াছে। এই অনুভবযন্ত্রে দুইটি দণ্ড থাকে— একটি স্থির ; আর-একটি চালনশীল। বৃক্ষটি এই দণ্ড দুইটির মধ্যে অবস্থাপিত করিলে প্রসারণ-তরঙ্গ, চালন-যোগ্য দণ্ডখানিকে বাহিরের দিকে ঠেলিয়া দেয়। তবে ইহা চোখে দেখা যায় না। এই সঙ্কোচন প্রসারণ এক ইঞ্চির দশ লক্ষভাগের এক ভাগেরও কম। সুতরাং আমার ম্যাগনেটিক অ্যাম্‌প্লিফায়ার (magnetic amplifier) যন্ত্রের দ্বারা এই প্রসারণ সঙ্কোচনকে এককোটিগুণ বাড়াইতে হইয়াছে। এই যন্ত্রের চুম্বকের সহিত সংলগ্ন দর্পনে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি দূরস্থিত যবনিকায় পতিত হয়। বৃক্ষটির হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে এই আলোকরশ্মি আলোড়িত হইতেছে। উত্তেজক বা ক্লান্তিজনক ঔষধ প্রয়োগের ফলে এই আলোড়নের শক্তিবৃদ্ধি অথবা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। জীবনীশক্তির অদৃশ্য গতিবিধি কল্পিত আলোকরেখা দ্বারা জীবনের গূঢ় রহস্য জগৎসমক্ষে এইরূপ সর্বপ্রথমে প্রচারিত করিল।

অভাব ও দৈন্য

বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য মানুষের ভার লাঘব করা। দৈন্য এবং অভাব আসিয়া জাতীয় জীবনকে মৃত্যুপথে লইয়া যাইতেছে। দেশের আর্থিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে কৃষি এবং শিল্প উভয়েরই উন্নতি সাধন করা আবশ্যক। ইহা করিতে হইলে বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করিতেই হইবে। আমি প্রমাণ করিয়াছি যে অনুসন্ধান এবং আবিষ্কারের ফলে ভারতবাসী বিজ্ঞানের প্রভুত উন্নতি সাধন করিতে পারে। যেমন আর্থিক দুরবস্থা ইউরোপে অশান্তি আনয়ন করিয়াছে— ভারতের আর্থিক সমস্যাই ভারতবর্ষের সমস্ত অশান্তির মূল। দেশের মৃত্তিকা নিহিত স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্য উদ্ধার করিবার একমাত্র উপায়— দেশের বহুসংখ্যক যুবককে উন্নত প্রণালীর বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া

তাহাদিগকে দেশের কাজে ব্যাপৃত করা। উদ্যোগী শক্তিশালী ব্যক্তির পক্ষে বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র রহিয়াছে। দেশের লোক যখন বৃথা আত্মকলহে ব্যাপৃত, এই সুযোগে বাহির হইতে বহুজাতি আসিয়া ভারতের ধনরত্ন লুটিয়া লইতেছে।

আমরা কি ভুলিয়া গিয়াছি, যে, অকূল জলধি এবং হিমাচল সমগ্র পৃথিবীর প্রতিযোগিতা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না? ধরিত্রীমাতা যেমন পাপ-ভার বহন করিতে অসমর্থ, প্রকৃতি জননীও সেইরূপ অসমর্থ জীবের ভার বহন করিতে বিমুখ। দেহের মৃত্যুই আমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ নহে। ধ্বংসশীল শরীর মৃত্তিকায় মিশিয়া গেলেও জাতীয় আশা ও চিন্তা ধ্বংস হয় না। মানসিক শক্তির ধ্বংসই প্রকৃত মৃত্যু; তাহা একেবারে আশাহীন এবং চিরন্তন।

বীরধর্ম

অবিরাম চেষ্টা ও বিরুদ্ধ শক্তির সহিত যুঝিয়া এবং মনের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াই দেশের ও জগতের কল্যাণসাধন করিতে পারিব— নিশ্চেষ্ট হইয়া নহে। যে দুর্বল এবং যে জীবন-সংগ্রাম হইতে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছে, সে কাপুরুষ, সে দান করিবার অধিকারী নহে, কারণ তাহার দান করিবার কিছুই নাই। যে বীরের ন্যায় সংগ্রামে যুঝিয়াছে এবং জয়যুক্ত হইয়াছে, কেবল সেই-ই তাহার জয়লব্ধ বিত্তদান করিতে পারে। এবং সেই দান দ্বারা জগৎকে সমৃদ্ধিশালী করিতে পারে। ভারতের গৌরব এবং জগতের কল্যাণ, ইহাই আমাদের চির সাধনা হউক।

ক্রেস্কোগ্রাফ (Crescograph)—Cresco শব্দটির অর্থ হল বৃদ্ধি।

গল্প

পলাতক তুফান

বৈজ্ঞানিক রহস্য

কয়েক বৎসর পূর্বে এক অত্যাশ্চর্য ভৌতিক কাণ্ড ঘটিয়াছিল। তাহা লইয়া অনেক আন্দোলন হইয়া গিয়াছে এবং এ বিষয়ে ইউরোপ এবং আমেরিকার বিবিধ বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় অনেক লেখালেখি চলিয়াছে। কিন্তু এ পর্যন্ত কিছু মীমাংসা হয় নাই।

২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতার ইংরাজী সংবাদপত্রে সিমলা হইতে এক তারের সংবাদ প্রকাশ হয়—

সিমলা হাওয়া আপিস ২৭শে সেপ্টেম্বর। "বঙ্গোপসাগরে শীঘ্রই ঝড় হইবার সম্ভাবনা।"

২৯শে তারিখের কাগজে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হইল— হাওয়া আপিস আলিপুর। "দুই দিনের মধ্যেই প্রচণ্ড ঝড় হইবে। ডায়মণ্ড-হারবারে এই মর্মে নিশান উত্থিত করা হইয়াছে।"

৩০ তারিখে যে খবর প্রকাশিত হইল তাহা অতি ভীতিজনক—

"আধঘণ্টার মধ্যে চাপমান যন্ত্র দুই ইঞ্চি নামিয়া গিয়াছে। আগামীকল্য ১০ ঘটিকার মধ্যে কলিকাতায় অতি প্রচণ্ড ঝড় হইবে ; এরূপ তুফান বহু বৎসরের মধ্যে হয় নাই।"

কলিকাতার অধিবাসীরা সেই রাত্রি কেহই নিদ্রা যায় নাই। আগামী কল্য কি হইবে তাহার জন্য সকলে ভীতচিত্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

১লা অক্টোবর আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হইল। দুই-চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে লাগিল।

সমস্ত দিন মেঘাবৃত ছিল, কিন্তু বৈকাল ৪ ঘটিকার সময় হঠাৎ আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। ঝড়ের চিহ্নমাত্রও রহিল না।

তার পর দিন হাওয়া আপিস খবরের কাগজে লিখিয়া পাঠাইলেন—

"কলিকাতায় ঝড় হইবার কথা ছিল, বোধ হয় উপসাগরের কূলে প্রতিহত হইয়া ঝড় অন্য অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে।"

ঝড় কোন্ দিকে গিয়াছে তাহার অনুসন্ধানের জন্য দিক্-দিগন্তরে লোক প্রেরিত হইল ; কিন্তু তাহার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

তারপর সর্বপ্রধান ইংরাজী কাগজ লিখিলেন— এত-দিনে বুঝা গেল যে, বিজ্ঞান সর্বৈব মিথ্যা।

অন্য কাগজে লেখা হইল, যদি তাহাই হয় তবে গরিব ট্যাক্সদাতাদিগকে পীড়ণ করিয়া হাওয়া আপিসের ন্যায় অকর্মণ্য আপিস রাখিয়া লাভ কি ?

তখন বিবিধ সংবাদপত্র তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন— উঠাইয়া দাও।

গবর্নমেণ্ট বিভ্রাটে পড়িলেন। অল্প দিন পূর্বে হাওয়া আপিসের জন্য লক্ষাধিক টাকার ব্যারোমিটার, থার্মোমিটার আনানো হইয়াছে। সেগুলি এখন ভাঙা শিশি বোতলের মূল্যেও বিক্রয় হইবে না। আর হাওয়া আপিসের বড়ো সাহেবকে অন্য কি কার্যে নিয়োগ করা যাইতে পারে ?

গবর্নমেণ্ট নিরুপায় হইয়া কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে লিখিয়া পাঠাইলেন— "আমরা ইচ্ছা করি ভেষজবিদ্যার এক নূতন অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন। তিনি বায়ুর চাপের সহিত মানুষের স্বাস্থ্যসম্বন্ধ-বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন।"

মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ লিখিয়া পাঠাইলেন— "উত্তম কথা, বায়ুর চাপ কমিলে ধমনী স্ফীত হইয়া উঠে, তাহাতে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি হয়। তাহাতে সচরাচর আমাদের যে স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইতে পারে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। তবে কলিকাতাবাসীরা আপাততঃ বহুবিধ চাপের নীচে আছে ঃ

১ম	বায়ু	প্রতি বর্গইঞ্চি	১৫ পাউণ্ড
২য়	ম্যালেরিয়া	...	২০ ...
৩য়	পেটেণ্ট ঔষধ	...	৩০ ...
৪র্থ	ইউনিভার্সিটি	....	৫০ ...
৫ম	ইনকম ট্যাক্স	...	৮০ ...
৬ষ্ঠ	মিউনিসিপাল ট্যাক্স	...	১ টন

বায়ুর ২।১ ইঞ্চি চাপের ইতর বৃদ্ধি 'বোঝার উপর শাকের আঁটি' স্বরূপ হইবে। সুতরাং কলিকাতায় এই নূতন অধ্যাপনা আরম্ভ করিলে বিশেষ যে উপকার হইবে এরূপ বোধ হয় না।

তবে সিমলা পাহাড়ে বায়ুর চাপ ও অন্যান্য চাপ অপেক্ষাকৃত কম। সেখানে উক্ত অধ্যাপক নিযুক্ত হইলে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে।"

ইহার পর গবর্নমেণ্ট নিরুত্তর হইলেন। হাওয়া আপিস এবারকার মতো অব্যাহতি পাইল।

কিন্তু যে সমস্যা লইয়া এত গোল হইল তাহা পূরণ হইল না।

একবার কোনো বৈজ্ঞানিক বিলাতের 'নেচার' কাগজে লিখিয়াছিলেন বটে ; তাঁহার থিয়োরি এই যে, কোনো অদৃশ্য ধূমকেতুর আকর্ষণে আবর্তমান বায়ুরাশি ঊর্ধ্বে চলিয়া গিয়াছে।

এসব অনুমান মাত্র। এখনও এ বিষয় লইয়া বৈজ্ঞানিক জগতে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে। অক্সফোর্ডে যে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েসনের অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে এক অতি বিখ্যাত জার্মান অধ্যাপক 'পলাতক তুফান' সম্বন্ধে অতি পাণ্ডিত্য-পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সমবেত বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন।

প্রবন্ধারম্ভে অধ্যাপক বলিলেন, তুফান বায়ুমণ্ডলের আবর্তমাত্র। সর্বাগ্রে দেখা যাউক, কিরূপে বায়ুমণ্ডলের উৎপত্তি হইয়াছে। পৃথিবী যখন ফুটন্ত ধাতুপিণ্ডরূপে সূর্য হইতে ছুটিয়া আসিল তখন বায়ু উৎপত্তি হয় নাই। কি করিয়া অম্লজান, দ্ব্যম্লজান ও উদ্‌যানের উৎপত্তি হইল তাহা সৃষ্টির এক গভীর প্রহেলিকা! যবক্ষারজানের উৎপত্তি আরও বিস্ময়কর। ধরিয়া লওয়া যাউক, কোনো প্রকারে বায়ুরাশি উৎপন্ন হইয়াছে। গুরুতর সমস্যা এই যে, কি কারণে বায়ু শূন্যে মিলাইয়া যায় না। ইহার মূল কারণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুসারে পদার্থের উপর পৃথিবীর আকর্ষণ বেশি কিংবা কম। যাহা গুরু তাহার উপরেই টান বেশি এবং তাহা সেই পরিমাণে আবদ্ধ। হালকা জিনিসের উপর টান কম, তাহা অপেক্ষাকৃত উন্মুক্ত। এই কারণে তৈল ও জল মিশ্রিত করিলে লঘু তৈল উপরে ভাসিয়া উঠে। উদ্‌জান হালকা গ্যাস বলিয়া অনেক পরিমাণে উন্মুক্ত এবং উপরে উঠিয়া পলাইবার চেষ্টা করে; কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের টান একেবারে এড়াইতে পারে না। আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্বন্ধে যে বৈজ্ঞানিক সত্য বর্ণিত হইল তাহা যে পৃথিবীর সবস্থানে প্রযোজ্য এ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে; কারণ ইণ্ডিয়া নামক দেশে যদিও পুরুষজাতি গুরু তথাপি তাহারা উন্মুক্ত, আর লঘু স্ত্রীজাতিই সে দেশে আবদ্ধ!

সে যাহা হউক, পদার্থমাত্রেই মাধ্যাকর্ষণবলে ভূপৃষ্ঠে আবদ্ধ থাকে। পদার্থের মৃত্যুর পর স্বতন্ত্র কথা। মানুষ মরিয়া যখন ভূত হয় তখন তাহার উপর পৃথিবীর আর কোনো কর্তৃত্ব থাকে না। কেহ কেহ বলেন, মরিয়াও নিষ্কৃতি নাই; কারণ ভূতদিগকেও থিয়োসোফিক্যাল সোসাইটির আজ্ঞানুসারে চলাফেরা করিতে হয়। পদার্থও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া থাকে— পদার্থ সম্বন্ধে পঞ্চত্ব কথা প্রয়োগ করা ভুল; কারণ রেডিয়ামের গুতা খাইয়া পদার্থ ত্রিত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ আল্‌ফা বিটা ও গামা এই তিন ভূতে পরিণত হয়। এইরূপে পদার্থের অস্তিত্ব যখন লোপ হয় তখন অপদার্থ শূন্যে মিলিয়া যায়। কিন্তু যতদিন পার্থিব পদার্থ জীবিত থাকে ততদিন পৃথিবী ছাড়িয়া পলায়ন করিতে পারে না।

যদিও অধ্যাপক মহাশয়, পদার্থ কেন পলায়ন করে না, এ সম্বন্ধে অকাট্য বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রয়োগ করিলেন, তথাপি তুফান কেন পলায়ন করিল, এ সম্বন্ধে কিছুই বলিলেন না।

এই ঘটনার প্রকৃত তত্ত্ব পৃথিবীর মধ্যে একজন মাত্র জানে— সে আমি।

পরের অধ্যায়ে ইহা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গত বৎসর আমার বিষম জ্বর হইয়াছিল। প্রায় মাসেক কাল শয্যাগত ছিলাম। ডাক্তার বলিলেন— সমুদ্রযাত্রা করিতে হইবে, নতুবা পুনরায় জ্বর হইলে বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। আমি জাহাজে লঙ্কাদ্বীপ যাইবার জন্য উদ্যোগ করিলাম।

এতদিন জ্বরের পর আমার মস্তকের ঘন কুন্তলরাশি একান্ত বিরল হইয়াছিল।

একদিন আমার অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, দ্বীপ কাহাকে বলে?" আমার কন্যা ভূগোল-তত্ত্ব পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমার উত্তর পাইবার পূর্বেই বলিয়া উঠিল "এই দ্বীপ"— ইহা বলিয়া প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায় আমার বিরল-কেশ মসৃণ মস্তকে দুই এক গোছা কেশের মণ্ডলী দেখাইয়া দিল।

তারপর বলিল, তোমার ব্যাগে এক শিশি 'কুন্তল-কেশরী' দিয়াছি ; জাহাজে প্রত্যহ ব্যবহার করিও, নতুবা নোনা জল লাগিয়া এই দুই একটি দ্বীপের চিহ্নও থাকিবে না।" 'কুন্তল-কেশরী'র আবিষ্কার এক রোমাঞ্চকর ঘটনা। সার্কাস দেখাইবার জন্য বিলাত হইতে এ দেশে এক ইংরেজ আসিয়াছিল। সেই সার্কাসে কৃষ্ণ কেশর-ভূষিত সিংহই সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য দৃশ্য ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে জাহাজে আসিবার সময় আণুবীক্ষণিক কীটের দংশনে সমস্ত কেশরগুলি খসিয়া যায় এবং এ দেশে পেঁছিবার পর সিংহ এবং লোমহীন কুকুরের বিশেষ পার্থক্য রহিল না। নিরুপায় হইয়া সার্কাসের অধ্যক্ষ এক সন্ন্যাসীর শরণাপন্ন হইল এবং পদধূলি লইয়া জোড়হস্তে বর প্রার্থনা করিল। একে ম্লেচ্ছ, তাহাতে সাহেব! ভক্তের বিনয় ব্যবহারে সন্ন্যাসী একেবারে মুগ্ধ হইলেন এবং বরস্বরূপ স্বপ্নলব্ধ অব-ধৌতিক তৈল দান করিলেন। পরে উক্ত তৈল 'কুন্তল-কেশরী' নামে জগৎ-বিখ্যাত হইয়াছে। তৈল্য প্রলেপে এক সপ্তাহের মধ্যেই সিংহের লুপ্ত কেশর গজাইয়া উঠিল। কেশহীন মানব এবং তস্য ভার্যার পক্ষে উক্ত তৈলের শক্তি অমোঘ। লোক-হিতার্থেই এই শুভসংবাদ দেশের সমস্ত সংবাদপত্রের প্রকাশিত হয়। এমন কি, অতি বিখ্যাত মাসিক পত্রিকার সর্বপ্রথম পৃষ্ঠায় এই অদ্ভুত আবিষ্কার বিঘোষিত হইয়া থাকে।

২৮শে তারিখে আমি চুসান জাহাজে সমুদ্রযাত্রা করিলাম। প্রথম দুইদিন ভালো-রূপেই গেল। ১লা তারিখ প্রত্যুষে সমুদ্র এক অস্বাভাবিক মূর্তি ধারণ করিল, বাতাস একেবারে বন্ধ হইল। সমুদ্রের জল পর্যন্ত সীসার রঙের ন্যায় বিবর্ণ হইয়া গেল।

কাপ্তানের বিমর্ষ মুখ দেখিয়া আমরা ভীত হইলাম। কাপ্তান বলিলেন, "যেরূপ লক্ষণ দেখিতেছি, অতি সত্বরই প্রচণ্ড ঝড় হইবে। আমরা কূল হইতে বহু দূরে— এখন ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

এই সংবাদ শুনিয়া জাহাজে যেরূপ ঘোর ভীতিসূচক কলরব হইল তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।

দেখিতে দেখিতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া গেল। চারি দিক মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকার হইল এবং দূর হইতে এক-এক ঝাপটা আসিয়া জাহাজখানাকে আন্দোলিত করিতে লাগিল।

তার পর মুহূর্তমধ্যে যাহা ঘটিল তাহার সম্বন্ধে আমার কেবল এক অপরিষ্কার ধারণা আছে। কোথা হইতে যেন রুদ্ধ দৈত্যগণ একেবারে নির্মুক্ত হইয়া পৃথিবী সংহারে উদ্যত হইল।

বায়ুর গর্জনের সহিত সমুদ্র স্বীয় মহাগর্জনের সুর মিলাইয়া সংহার মূর্তি ধারণ করিল।

এক মহা ঊর্মি জাহাজের উপর পতিত হইল এবং মাস্তুল, লাইফ-বোট ভাঙিয়া লইয়া গেল।

আমাদের অন্তিমকালে উপস্থিত। মুমূর্ষু সময়ে জীবনের স্মৃতি যেরূপ জাগিয়া উঠে, সেইরূপ আমার প্রিয়জনের কথা মনে হইল। আশ্চর্য এই, আমার কন্যা আমার বিরল কেশ লইয়া যে উপহাস করিয়াছিল, এই সময়ে তাহা পর্যন্ত স্মরণ হইল—

'বাবা, এক শিশি 'কুন্তল-কেশরী' তোমার ব্যাগে দিয়াছি।'

হঠাৎ এক কথায় আর এক কথা মনে পড়িল। বৈজ্ঞানিক কাগজে ঢেউয়ের উপর তৈলের প্রভাব সম্প্রতি পড়িয়াছিলাম। তৈল যে চঞ্চল জলরাশিকে মসৃণ করে, এ বিষয়ে অনেক ঘটনা মনে হইল।

অমনি আমার ব্যাগ হইতে তৈলের শিশি খুলিয়া অতি কষ্টে ডেকের উপর উঠিলাম। জাহাজ টলমল করিতেছিল।

উপরে উঠিয়া দেখি, সাক্ষাৎ কৃতান্তসম পর্বতপ্রমাণ ফেনিল এক মহা ঊর্মি জাহাজ গ্রাস করিবার জন্য আসিতেছে।

আমি 'জীব আশা পরিহরি' সমুদ্র লক্ষ্য করিয়া 'কুন্তল-কেশরী' বাণ নিক্ষেপ করিলাম। ছিপি খুলিয়া শিশি সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম ; মুহূর্তমধ্যে তৈল সমুদ্রে ব্যাপ্ত হইয়া ছিল।

ইন্দ্রজালের প্রভাবের ন্যায় মুহূর্তমধ্যে সমুদ্র প্রশান্ত মূর্তি ধারণ করিল। কমনীয় তৈল স্পর্শে বায়ুমণ্ডল পর্যন্ত শান্ত হইল। ক্ষণ পরেই সূর্য দেখা দিল।

এইরূপে আমরা নিশ্চিত মরণ হইতে উদ্ধার পাই এবং এই কারণেই সেই ঘোর বাত্যা কলিকাতা স্পর্শ করে নাই। কত সহস্র সহস্র প্রাণীর যে এই সামান্য এক বোতল তৈলের সাহায্যে অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে ?

[রচনাটি "নিরুদ্দেশের কাহিনী" নামক রচনার পরিমার্জিতরূপ। অব্যক্ত গ্রন্থে প্রকাশকালে লেখক এটিকে বহুলাংশে পরিবর্তন করেন। তাই "নিরুদ্দেশের কাহিনী" রচনাটিও গ্রন্থের পরিশিষ্টে তুলে ধরা হল।]

অগ্নি পরীক্ষা

১৮১৪ খৃস্টাব্দে ইংরেজ গবর্নমেণ্ট নেপাল রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। জেনারেল মার্নি কাটামুণ্ডু আক্রমণের জন্য প্রেরিত হইলেন। জেনারেল উড গোরক্ষপুরে ছাউনি করিয়া তরাই প্রদেশ আক্রমণ করিলেন। জেনারেল অক্টারলোনি নেপাল রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তে অমরসিংহের সৈন্যের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন ; আর জেনারেল গিলেস্পি দেরাদুন হইতে কলুঙ্গা আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। এইরূপে নেপাল রাজ্য চারি বিভিন্ন দিক হইতে একেবারে আক্রান্ত হইল। নেপাল রাজ্যের সৈন্যসংখ্যা সমুদয়ে দ্বাদশ সহস্র ; তাহার বিরুদ্ধে ইংরেজ গবর্নমেণ্ট উনত্রিশ সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিলেন। যুদ্ধের কারণ কি, তাহা অনুসন্ধান করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়— প্রয়োজনও নাই।

অগ্নিদগ্ধ না হইলে স্বর্ণের পরীক্ষা হয় না। মনুষ্যও অগ্নি দ্বারা পরীক্ষিত হয়। প্রলয়কালে পৃথিবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনা ও বন্ধন ঊর্ণনাভ-তন্তুর ন্যায় ছিন্ন হইয়া যায় ; বীরপুরুষ তখনই মুক্ত হইয়া আপনার প্রকৃত রূপ প্রকাশ করেন।

যুদ্ধ ঘোষণার সময় নেপাল সীমান্তপ্রদেশে কলুঙ্গা নামক স্থানে অল্পসংখ্যক একদল গোরক্ষ-সৈন্য ছিল। সৈন্যসংখ্যা তিনশত মাত্র। বলভদ্র থাপা তাহাদের অধিনায়ক ছিলেন। এস্থানে বহুদিনের পুরাতন একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ ছিল। অস্ত্রশস্ত্রের বিশেষ অভাব। কাহারও তীর, ধনু ও খুড়কি, কাহারও বা পুরাতন বন্দুক— ইহাই যুদ্ধের উপকরণ। এতকাল যুদ্ধের কোনো সম্ভাবনা ছিল না, এইজন্য সৈনিকেরা তাহাদের পুত্রকলত্র লইয়া এক স্থানে বাস করিতেছিল। স্ত্রীলোক ও শিশুর সংখ্যা প্রায় দেড়শত হইবে।

হঠাৎ একদিন সংবাদ আসিল যে, ইংরেজ যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে এবং কলুঙ্গা আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। বলভদ্র এই সংবাদ পাইয়া পুরাতন ভগ্ন প্রাচীর কোনোপ্রকারে সংস্কার করিতে লাগিলেন। গোরক্ষ-সেনাপতি, স্ত্রীলোক ও শিশুগণ লইয়া বিব্রত এবং সৈন্য ও অস্ত্রাভাবে একান্ত বিপন্ন। এমন সময়ে ইংরেজ-মাউরি পঁয়ত্রিশ-শত সৈন্য ও বহুসংখ্যক কামান লইয়া সত্বর এই স্থান অবরোধ করিলেন।

যে যুদ্ধে জয়ের আশা থাকে, সে যুদ্ধ অনেকেই করিতে পারে ; কিন্তু যাহাতে পরাভব নিশ্চিত, সে যুদ্ধ যুঝিতে অমানুষিক বলের প্রয়োজন।

দেখিতে দেখিতে ইংরেজ-সৈন্য দুর্গের চারি দিক সেনাজালে আবদ্ধ করিল। বলভদ্র ভাবিতেছিলেন, তাঁহার প্রভু তাঁহাকে সুদিনে কলুঙ্গার সৈন্যাধ্যক্ষ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এখন দুর্দিন উপস্থিত। আজ নিমকের পরীক্ষা হইবে।

২৫শে অক্টোবর রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় ইংরেজ-দূত বলভদ্রের নিকট যুদ্ধপত্র লইয়া আসিল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর বলভদ্র শয়ন করিতে গিয়াছেন, এমন সময় ইংরাজ সেনাপতির পত্র আসিল। পত্রে লিখিত ছিল, 'এই অসম যুদ্ধে পরাভব স্বীকার করা বীরপুরুষের গ্লানিজনক নহে; গোরক্ষ-সেনাপতির বিনা রক্তপাতে দুর্গাধিকার ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।' উত্তরে গোরক্ষ-সেনাপতি ইংরেজ-দূতকে বলিলেন, তোমাদের সুবাদারকে বলিও, আগামীকল্য যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ইহার উত্তর পাইবেন।'

পরদিন প্রত্যুষে কামানের গোলা এই ধৃষ্টতার প্রত্যুত্তর লইয়া আসিল। চতুর্দিকে কামানের অগ্নির ধূম অপসারিত হইবার পূর্বেই ইংরেজ সেনাপতি সমস্ত সেনা লইয়া দুর্গ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু প্রস্তরস্তূপের পশ্চাতে এক অদম্য শক্তি প্রচ্ছন্ন ছিল, যাহা কামানের গোলা ভেদ করিতে পারে না। সেই মানসিক মহাশক্তি আজ চকিতে দেখা দিল এবং সুবাদার হইতে সামান্য সেনার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। কেবল যোদ্ধার হৃদয়ে নহে—দুর্বল নারী ও নিরুপায় শিশুকেও সেই মহা অগ্নিশিখা উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিল।

ইংরেজ-সৈন্য পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়াও দুর্গ অধিকার করিতে অক্ষম হইল। পরিশেষে জয়ের আশা নাই দেখিয়া দেরাদুনে প্রত্যাবর্তন করিল।

তাহার পর জেনারেল গিলেস্পি দুর্গ ভগ্ন করিবার উপযোগী নূতন কামান এবং নূতন সৈন্যদল লইয়া মার্টিন্ডেলের সহিত যোগ দিলেন। স্থির হইল, সৈন্যদল এক সময়ে চারি দিক হইতে দুর্গ আক্রমণ করিবে এবং কামানের গোলাতে দুর্গপ্রাচীর ভগ্ন করিয়া অবারিত দ্বারে দুর্গে প্রবেশ করিবে।

২৬শে তারিখের নয় ঘটিকার সময় এই বিরাট আক্রমণ আরব্ধ হইল; কিন্তু অল্প সময়েই ইংরেজ-সৈন্য পরাহত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিল। তখন জেনারেল গিলেস্পি স্বয়ং নূতন তিন দল সৈন্য লইয়া দুর্গ আক্রমণ করিলেন। একেবারে বহুসংখ্যক কামান অগ্নি উদ্গীরণ করিয়া দুর্গে অনলপূর্ণ গোলা নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

দুর্গের নামমাত্র যে প্রাচীর ছিল, এক ঝটিকায় তাহা আর রক্ষা পাইল না, গোলার আঘাতে প্রস্তরস্তূপ খসিয়া পড়িতে লাগিল। আক্রান্ত গোরক্ষ-সৈন্যের ভাগ্যলক্ষ্মী এখন লুপ্তপ্রায়। কিন্তু এই সময়ে সহসা এক অদ্ভুত দৃশ্য লক্ষিত হইল; ভগ্নস্থানে মুহূর্তমধ্যে এক প্রাচীর উত্থিত হইল। এই নূতন প্রাচীর সুকোমল নারীদেহ রচিত। গোরক্ষ-রমণীগণ স্বীয় দেহ দ্বারা প্রাচীরের ভগ্নস্থান পূর্ণ করিলেন। ইহার অনুরূপ দৃশ্য পৃথিবীতে আর কখনও দেখা যায় নাই। কার্থেজের রমণীরা স্বীয় দেহ দ্বারা কেশপাশ ছিন্ন করিয়া ধনুর জ্যা রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু রক্তমাংসে গঠিত জীবন্ত শরীর দিয়া কুত্রাপি দুর্গপ্রাচীর নির্মিত হয় নাই। কেবল প্রাচীর নহে—এই দুর্বল কষ্ট-অসহিষ্ণু দেহ বজ্রবৎ কঠিন ও রণে ভীষণ সংহারক অস্ত্র হইয়া উঠিল।

এই সময়ে জেনারেল গিলেস্পি দুর্গপ্রাচীর অতিক্রম করিতে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু অধিক দূর না যাইতেই বক্ষে গুলিবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার

অনুগামী সৈন্য তীর ও গুলির আঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল ; ইংরেজ-সৈন্যের ভগ্নাবশেষ দেরাদুন প্রত্যাবর্তন করিল।

ইহার পর দিল্লি হইতে নূতন সৈন্যদল ও বহুসংখ্যক কামান যুদ্ধস্থানে প্রেরিত হইল। ২৪শে নভেম্বর তারিখে এই নূতন সৈন্যদল পুনরায় কলুঙ্গা আক্রমণ করিল।

এবার কামান হইতে গোলাপূর্ণ শেল অনবরত দুর্গে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ভূমিস্পর্শমাত্র এই শেল ভীষণ রবে শতধা বিদীর্ণ হইয়া চতুর্দিকে মৃত্যুর করাল ছায়া বিস্তার করিতে লাগিল। এতদিন যোদ্ধায় যোদ্ধায় প্রতিযোগিতা চলিতেছিল ; কিন্তু এখন মৃত্যু সর্বগ্রাসীরূপে সর্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল—মাতার বক্ষে থাকিয়াও শিশু উদ্ধার পাইল না।

একমাসের অধিককাল কলুঙ্গার অবরোধ আরম্ভ হইয়াছে। আহার্য সামগ্রী ফুরাইয়া গিয়াছে, যুদ্ধের উপকরণও নিঃশেষিত প্রায়। এত বিপদের মধ্যেও যোদ্ধারা অবিচলচিত্ত। মুমূর্ষু শত্রুকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার জন্য সাগরোর্মির ন্যায় ইংরেজ-সৈন্য দুর্গোপরি বারংবার পতিত হইতে লাগিল ; কিন্তু গোরক্ষ-সৈন্য অমানুষিক শক্তিতে যুদ্ধ করিতে লাগিল। বারুদ ফুরাইলে তীর-ধনু দ্বারা, তাহা ফুরাইলে প্রস্তরনিক্ষেপে শত্রু বিনাশ করিতে লাগিল। এই অসম সংগ্রামে গোরক্ষদেরই জয় হইল। দুর্গাধিকারের কোনো আশা নাই দেখিয়া ইংরেজসৈন্য দেরাদুনে প্রত্যাগমন করিতে আদিষ্ট হইল।

এমন সময়ে গুপ্তচর আসিয়া সংবাদ দিল যে, কলুঙ্গার দুর্গে পানীয় জল নাই। দুর্গের বাহিরে এক নির্ঝরিণী হইতে গোরক্ষেরা রাত্রির অন্ধকারে জল লইয়া যায়। এই জল বন্ধ করিতে পারিলেই তৃষ্ণাতুর শত্রু নিরুপায় হইয়া পরাভূত হইবে।

নির্ঝরিণীর জল বন্ধ করা হইল। ইহার পর দুর্গমধ্যে যে ভীষণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইল তাহা কল্পনারও অতীত—আহত ও মুমূর্ষু নরনারী এবং শিশুর 'জল জল' এই আর্তনাদ কেবল মৃত্যুর আগমনেই নীরব হইল!

এ দিকে ইংরেজরা শত্রুকে এইরূপ বিপন্ন দেখিয়া সিংহ-শিশুদিগকে জীবন্ত শৃঙ্খলবদ্ধ করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। দুর্গের চতুর্দিকে সৈন্যপাশ দৃঢ়ীকৃত হইল। অবরুদ্ধ দুর্গের বহির্গমন-পথে বহুসংখ্যক সৈন্য সন্নিবেশিত হইল। তাহারা দিবারাত্রি পথ অবরোধ করিয়া রহিল।

গোরক্ষ-সৈন্যের সংখ্যা প্রথমে তিনশত ছিল, মাসাধিক কাল যুদ্ধের পর সত্তর জন মাত্র রহিল। চারি দিন পর্যন্ত ইহাদের কেহ একবিন্দু জল স্পর্শ করে নাই, অনশন ও তৃষ্ণা নীরবে সহ্য করিয়াছে—তাহারা এ সকল কষ্ট অকাতরে সহ্য করিতেছিল, কিন্তু নারী ও শিশুর আর্তনাদ ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। শত্রুর হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিলেই এই দারুণ কষ্ট শেষ হয়। কিন্তু হস্তের তরবারি শত্রুর পদে স্থাপন, প্রাণ থাকিতে হইবে না। জীবন থাকিতে কোনো উপায় নাই—জীবন দিয়াই বা কি উপায় আছে? সম্মুখে চারি দিক বেষ্টন করিয়া লোহিত রেখার জাল ক্রমে সংকীর্ণ

হইতেছে। সেই রেখার মধ্যে মধ্যে অসিজ বর্ণ কামানের বিকট মূর্তি দেখা যাইতেছে। এই জালে কি আবদ্ধ হইতে হইবে? অথবা জীবনবিন্দু এই রক্তিমা ক্ষণিকের জন্য গাঢ়তর করিবে? তবে তাহাই হউক!

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় হঠাৎ দুর্গের দ্বার খুলিয়া গেল। যে দ্বার সঙ্গীন ও কামানের গোলার আঘাতে উদ্ঘাটিত হয় নাই, আজ তাহা স্বতঃই উন্মুক্ত হইল। আত্মবলিদানে উন্মুক্ত সেই সত্তরটি বীর—মুষ্টিপ্রমাণ কৃষ্ণ মেঘের ন্যায়—অগণিত শত্রুদলের উপর পতিত হইল এবং অসির আঘাতে পথ কাটিয়া মুহূর্তে অদৃশ্য হইল।

পরদিন প্রত্যুষে ইংরেজ-সৈন্য যোদ্ধৃ-পরিত্যক্ত দুর্গে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহাদের উল্লাস বিষাদে পরিণত হইল। এই কি দুর্গ—না শ্মশান? এই শবকবন্ধমন্ডিত ভূমিতে কি প্রকারে মানুষ এতদিন বাস করিয়াছে? আহত, জীবিত ও মৃতের কি ভয়ানক সমাবেশ! এই যে সম্মুখে সুবাদারের মৃত শরীর পড়িয়া রহিয়াছে, ইহার ক্রোড়ে লুক্কায়িত চারি বৎসরের একটি শিশু কাঁদিতেছে। তাহার একটু অগ্রে একটি স্ত্রীলোক মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার দুই উরু ভেদ করিয়া কামানের গোলা চলিয়া গিয়াছে। অদূরে বহু ছিন্ন হস্তপদ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত দেখা যাইতেছে—এস্থানে শেল পড়িয়া বিদীর্ণ হইয়াছিল। নিকটে কয়েকটি শিশু রক্তাপ্লুত হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেছে—এখনও তাহাদের প্রাণবায়ু বাহির হয় নাই। চতুর্দিকে কেবল 'জল জল' এই কাতর ধ্বনি!

বলভদ্র সত্তরটি সঙ্গী লইয়া যেঁতগড়ের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ইংরেজ-সৈন্য এই দুর্গ অবরোধ করিয়াছিল; কিন্তু অধিকার করিতে পারে নাই। তারপর বলভদ্র সৈন্যের আধিপত্য গ্রহণ করেন এবং নেপাল-যুদ্ধ শেষ হইলে স্বদেশে তাঁহার তরবারি আর আবশ্যক নাই দেখিয়া সঙ্গীদের সহিত রণজিৎ সিংহের শিখ-সৈন্যে প্রবেশ করেন।

এই সময়ে রণজিৎ সিংহ আফগান-যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। একবার তাঁহার একদল সৈন্য বহুসংখ্যক আফগান কর্তৃক আক্রান্ত হয়। অনেকে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিল, কেবল সত্তরটি সেনা রণভূমি ত্যাগ করিল না। এই কয়টি সেনা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শত্রুর দিকে মুখ করিয়া অটল পর্বতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। ইহারা অনেক বিপদের সময় পাশাপাশি দাঁড়াইয়াছে, আজ এই শেষবার সুবাদার ও সিপাহী এক শ্রেণী হইয়া দাঁড়াইল। দূর হইতে কামান গর্জন করিতেছিল। এক এক বার সেই জীমূত-নাদ পর্বত ও উপত্যকা প্রতিধ্বনিত করিতেছিল—সেই সঙ্গে শ্রেণীর মধ্যে এক একটি স্থান শূন্য হইতে লাগিল; কিন্তু শ্রেণী টলিল না। পরিশেষে পাশাপাশি সত্তরটি শবদেহ অনন্তশয্যায় শায়িত হইল। জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড ধরায় পতিত হইয়া চিরশান্তি লাভ করিল।

ইংরেজ-সৈন্য কলুঙ্গা অধিকার করিয়া দুর্গ সমভূমি করিল। এখন পূর্বদুর্গস্থানে বন্ধুর প্রস্তরস্তূপ দৃষ্ট হয়। সেই দারুণ যুদ্ধের লীলাভূমিতে এখন গভীর নির্জনতা

বিরাজিত। মৃত্যুর এ পারেই ঝটিকা, পরপারে চিরশান্তি। মরণের পরপার হইতেই বোধ হয় কোনো শান্তিময় আত্মা এই রণস্থলে আবির্ভূত হইয়া জেতৃগণের বীরহৃদয়ে করুণ রস সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন।

যে স্থানে জেতা ও বিজিতের দেহধূলি একত্র মিশ্রিত হইতেছিল সেই স্থানে ইংরেজ দুইটি স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত করিল। ইহা অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। একটি প্রস্তরফলক জেনারেল গিলেস্পি ও কলুঙ্গা-যুদ্ধে হত ইংরেজ-সৈন্যের স্মরণার্থে স্থাপিত ; ইহার অদূরে দ্বিতীয় প্রস্তরফলকে লিখিত আছে ঃ

আমাদের বীরশত্রু কলুঙ্গা-দুর্গাধিপতি বলভদ্র
এবং তাঁহার অধীনস্থ বীর সেনা
যাঁহারা রণে জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন
এবং
আফগান কামানের সম্মুখীন হইয়া
একে একে অকাতরে প্রাণদান করিয়াছিলেন—
সেই বীরগণের স্মরণার্থে
এই স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হইল।

ইংরেজী ১৮৯৫ সালের মে মাসে "দাসী" পত্রিকায় প্রকাশিত। অব্যক্তের প্রথম সংস্করণে জগদীশচন্দ্র প্রবন্ধটির পাদটীকায় বলেছেন, "লেখক নেপালের সীমান্ত প্রদেশে ভ্রমণকালে এই ঐতিহাসিক ঘটনা সংগ্রহ করেন। সাহিত্য পত্রিকায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন এই যুদ্ধ সম্বন্ধে অতি সুন্দর এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।"

বিবিধ প্রসঙ্গ

রানী-সন্দর্শন

একদিন সম্মুখের গলির মোড়ে দেখিলাম, এক ভিক্ষুক বিকট অঙ্গ-ভঙ্গী করিয়া পথ-যাত্রীর করুণা উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিতেছে। লোকটা একেবারেই ভণ্ড; প্রতারণা করিয়া সকলকে ঠকাইতেছে বলিয়া আমার রাগ হইল। এই সময় সেখান দিয়া একটি স্ত্রীলোক যাইতেছিল। তাহার পরনে ছেঁড়া কাপড়। ভিক্ষুকের কান্না শুনিয়া স্ত্রীলোকটি থমকিয়া দাঁড়াইল এবং তাহার দিকে কাতর নয়নে চাহিয়া দেখিল। তাহার অঞ্চল-কোণে একটি মাত্র পয়সা বাঁধা ছিল; হয়তো তাহাই তাহার সর্বস্ব। বিনা বাক্যব্যয়ে সে সেই পয়সাটি ভিক্ষুককে দিয়া চলিয়া গেল। সেই দিনেই আমার প্রকৃত রানী-সন্দর্শন লাভ হইয়াছিল—মাতৃরূপিণী জগদ্ধাত্রী রাণী! এইজন্যই তো বয়স নির্বিশেষে ছোটো মেয়ে হইতে বর্ষীয়সী পর্যন্ত সকল নারীকেই আমরা মা বলিয়া সম্বোধন করি।

বাঘিনী মাতৃস্নেহে মমতাপন্ন হয়। একবার ১০।১২ বৎসরের একটি ছেলে দেখিলাম। শিশুকালে নেকড়ে-বাঘিনী তাহাকে লইয়া যায়। ক্ষুধার্ত শিশু বাঘিনীর স্তন্যপান করিতে চেষ্টা করিয়াছিল; তাহাতেই তাহার প্রাণরক্ষা হইল। সেই অবধি বাঘিনী স্বীয় শাবকের ন্যায় তাহাকে পালন করিয়াছিল। কিন্তু শাবকদিগের প্রাণরক্ষার জন্য সে অন্য মূর্তি ধরিয়াছিল এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়া মরিয়াছিল। মাতৃস্নেহে দুইটি রূপ দেখা যায়; উভয়ই আশ্রিতের রক্ষা-হেতু। একটি মমতাপন্না করুণাময়ী, অন্যটি সংসাররূপিণী শক্তিময়ী।

নারীর হৃদয়ের যে সন্তান-স্নেহ উথলিত হইয়া সমস্ত দুস্থজনকে সন্তানজ্ঞানে আগুলিয়া রাখিবে তাহা আশ্চর্য নহে। এতদ্ব্যতীত নারী স্বতঃই অভিমানিনী; প্রিয়জনের অপমান ও লাঞ্ছনা তাহাকে মর্মে মর্মে বিদ্ধ করে। হে অভিমানিনী রমণী, ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, তুমি যাহার গৌরবে গৌরবিনী, এ জগতে তাহার স্থান কোথায়? পৃথিবী হইতে শান্তি পলায়ন করিয়াছে, সম্মুখে ঘোর দুর্দিন। যাহার উপর তুমি নির্ভর করিয়া আছ, সে কি সেই দুর্দিনে তোমাকে ঘোরতর লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা করিতে পারিবে? বাক্য ছাড়া যে তাহার আর কোনো অস্ত্র নাই। কে তাহার বাহু সবল করিবে, হৃদয়ের শক্তি দুর্দম রাখিবে এবং মৃত্যুর বিভীষিকার অতীত করিবে? এ সকল শিক্ষা তো মাতৃ-ক্রোড়েই হইয়া থাকে। কি তোমার দীক্ষা, যাহা দিয়া তুমি সন্তানকে মানুষ করিয়া গড়িবে? কৃচ্ছ্রসাধনা অথবা বিলাসিতা—ইহার কোন্ পথ তুমি গ্রহণ করিবে? রানী হইয়া জন্মিয়াছিলে, দাসী হইয়াই কি তুমি মরিবে?

"জীবন দর্শন হিসাবে রচনাটি সাহিত্য সাধনার অপূর্ব নিদর্শন।" ১৩২৮ সালের ভারতবর্ষ পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত।

বোধন

শতাধিক বৎসর পূর্বে আমাদের বংশের জননী প্রপিতামহী দেবী তরুণ যৌবনে বৈধব্য প্রাপ্ত হইয়া একমাত্র শিশুসন্তান লইয়া ভ্রাতৃগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুত্রের লালন পালন ও শিক্ষার ভার লইয়া প্রপিতামহী দেবী যখন নানা প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতেছিলেন তখন একদিন তাঁহার শিশুপুত্র শিক্ষকের তাড়নায় অন্তঃপুরে আসিয়া মাতার অঞ্চল ধারণ করিয়াছিল। যিনি তাঁহার সমুদয় শক্তি একমাত্র পুত্রের উন্নতিকল্পে প্রতিদিন তিল তিল করিয়া ক্ষয় করিতেছিলেন, সেই স্নেহময়ী মাতা মুহূর্তে তেজস্বিনীরূপ ধারণ করিয়া পুত্রের হস্তপদ বাঁধিয়া তাহাকে শিক্ষকের হস্তে অর্পণ করিলেন। ভাবিয়া দেখিলে আমাদের মাতৃভূমি আমার তেজস্বিনী বংশ জননীর মতো। সন্তানদিগকে বিক্রম ও পৌরুষে উদ্দীপ্ত হইতে তাড়া দিয়া তিনি তাহাদের প্রতি আপনার গভীর বাৎসল্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার পুত্রদিগকে অঙ্কে রাখিয়া আলস্যে কালহরণ করিতে দেন নাই ; কিন্তু জগতের অগ্নিময় কর্মশালে তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিয়া দিয়া দৃঢ়স্বরে বলিয়াছেন, 'পৃথিবীর সংগ্রামময় কর্মক্ষেত্রে যখন যশঃ, বিক্রম ও পৌরুষ সংগ্রহ করিতে পারিবে তখনই আমার ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিবে।' মাতার আদেশ পালন করিবার জন্য বহু শতাব্দী পূর্বে দীপঙ্কর হিমালয় লঙ্ঘন করিয়া তিব্বত গমন করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে আধুনিক সময় পর্যন্ত বহু বাঙালী ভারতের বহুস্থানে গমন করিয়া কর্ম, যশঃ ও ধর্ম আহরণ করিয়াছেন। এই বিক্রমপুর বিক্রমশালী সন্তানের জন্মভূমি, মনুষ্যত্বহীন দুর্বলের নহে। আমার পূজা হয়তো তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, এই সাহসে ভর করিয়া আমি বহুদিন বিদেশে যাপন করিয়া জননীর স্নেহময় ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিয়াছি। হে, জননী তোমারই আশীর্বাদে আমি বঙ্গভূমি এবং ভারতের সেবকরূপে গৃহীত হইয়াছি।

কি ঘটনাসূত্রে আমি এখানে সভাপতিরূপে আহূত হইয়াছি তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই। কোন্ নিয়মে আমাদের দেশে কোনো এক সংকীর্ণ পথে খ্যাতনামা ব্যক্তিদিগকে বিসদৃশ কার্যে নিয়োগ করা হয় তাহার কারণ নির্দেশ করা কঠিন। যে যুক্তি অনুসারে ব্যবহারজীবীকে কলকারখানার ডিরেক্টার করা হয় সেই নিয়মেই লোকালয় হইতে দূরে লুক্কায়িত শিক্ষার্থী আজ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নিয়োজিত হইয়াছে। এই নির্বাচনের বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ আপনারা গ্রহণ করেন নাই। আপনাদের প্রীতিকর কিছু যে আমি বলিতে পারিব সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। যে বিষয়ে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নাই সে বিষয়ে কিছু বলিতে উদ্যম করা

ধৃষ্টতা মাত্র। আমি স্বীয় জীবনে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি কেবল সেই বিষয়েই কিছু বলিব। পৃথিবীর বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া আমি ইহা উপলব্ধি করিয়াছি যে, আমাদের সমুদয় শিক্ষা-দীক্ষা কেবল মনুষ্যত্বলাভের উদ্দেশ্যে মাত্র। কি করিয়া আমরা দুর্বলের ক্রন্দন ও স্ত্রীজনসুলভ মান অভিমান ও আবদার ত্যাগ করিয়া পুরুষোচিত শক্তিবলে স্বহস্তে স্বীয় অদৃষ্ট গঠন করিতে পারি, তাহাই যেন আমাদের একমাত্র সাধনা হয়।

জীবনসংগ্রাম

জীবনসংগ্রামে যে কেবল শক্তিমানই জীবিত থাকে, দুর্বল নির্মূল হয়, এ কথা কেবল নিম্ন জীবের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য মনে করিতাম। কিন্তু পৃথিবী-ভ্রমণের ফলে এ ভ্রান্তি দূর হইয়াছে। এখন দেখিতেছি, বিশ্বব্যাপী আসরে দুর্বল উচ্ছিন্ন হইবে এবং সবল প্রতিষ্ঠিত হইবে। মনে করিবেন না যে, আমরা এখনও দূরে আছি বলিয়া এই খান্ডবদাহ আমাদিগকে স্পর্শ করিবে না। বহুদিন হইতেই এই ভীষণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে।

অহিফেন সেবনে অতি সহজেই নানা কষ্ট হইতে নিজেকে উদ্ধার করিতে পারা যায়। সুতরাং অতীত গৌরব স্মরণই আমাদের পক্ষে বর্তমান দুরবস্থা ভুলিবার প্রকৃষ্ট উপায়। আর এই-যে সম্মুখে ম্যালেরিয়াতে জনপদ নির্মূল হইতেছে, দেশী শিল্প জাপানের প্রতিযোগিতায় উচ্ছিন্ন হইতেছে, এ সব কথা ভাবিতে নাই। আমাদের জড়তা সম্বন্ধে যদি আমি কোনো তীব্র ভাষা ব্যবহার করি তাহা হইলে ক্ষমা করিবেন। আমার জীবনে যদি কোনো সফলতা দেখিয়া থাকেন তবে জানিবেন, তাহা সর্বদা নিজেকে আঘাত করিয়া জাগ্রত রাখিবার ফলে। স্বপ্নের দিন চলিয়া গিয়াছে ; যদি বাঁচিতে চাও তবে কশাঘাত করিয়া নিজেকে জাগ্রত রাখো।

বিবিধ সংক্রামক রোগ যেন দেশকে একেবারে বিধ্বস্ত করিতে চলিল। এই সব বিপদ একেবারে অনিবার্য নয়, কিন্তু এ আমাদের অজ্ঞতা ও চেষ্টাহীনতারই বিষময় ফল। যে পুকুর হইতে পানীয় জল গৃহীত হয় তাহার অপব্যবহার সভ্যতার পরিচায়ক নহে। কি করিয়া এই সব অজ্ঞতা দূর হইতে পারে? স্কুল বৃদ্ধি অতি মন্থর গতিতে হইতেছে ; আর-কোনো কি উপায় নাই যাহা দ্বারা অত্যাবশ্যক জ্ঞাতব্য বিষয় সহজে প্রচারিত হইতে পারে? আমাদের সর্বসাধারণে শিক্ষাবিস্তারের চিরন্তন প্রথা কথকতা দ্বারা। তাহা ছাড়া চক্ষে দেখিলে একটা বিষয়ে সহজেই ধারণা হয়। আমার বিবেচনায় স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় গৃহ ও পল্লী পরিষ্কার, বিশুদ্ধ জল ও বায়ুর ব্যবস্থা নির্ধারণ। এ সব বিষয়ে শিক্ষাবিস্তার এবং আদর্শ-গঠিত পল্লী প্রদর্শন অতি সহজেই হইতেই পারে। ইহার উপায় মেলা স্থাপন। পর্যটনশীল মেলা দেশের এক প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া অল্পদিনেই অন্য প্রান্তে পেঁীছিতে পারে। এই মেলায়

স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে ছায়া চিত্রযোগে উপদেশ, স্বাস্থ্যকর ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যায়াম প্রচলন, যাত্রা, কথকতা, গ্রামের শিল্প-বস্তুর সংগ্রহ, কৃষি-প্রদর্শনী ইত্যাদি গ্রামহিতকর বহুবিধ কার্য সহজেই সাধিত হইতে পারে। আমাদের কলেজের ছাত্রগণও এই উপলক্ষে তাঁহাদের দেশ পরিচর্যাবৃত্তি কার্যে পরিণত করিতে পারেন।

লোকসেবা

গত কয়েক বৎসর যাবৎ আমাদের দেশের ছাত্রগণ বহুবিধ রূপে লোকসেবায় আশ্চর্য পারদর্শিতা দেখাইয়াছে। ইহা দ্বারা তাহারা দেশের মুখ উজ্জল করিয়াছে। 'পতিতের সেবা' অথবা 'ডিপ্রেস্‌ড্ মিশনে'ও অনেকের ঐকান্তিক উৎসাহ দেখা যাইতেছে। ইহা বিশেষ শুভ লক্ষণ। ইহা সম্বন্ধেও কিছু ভাবিবার আছে। শৈশবকালে পিতৃদেব আমাকে বাংলা স্কুলে প্রেরণ করেন। তখন সন্তানদিগকে ইংরেজি স্কুলে প্রেরণ আভিজাত্যের লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইত। স্কুলে দক্ষিণ দিকে আমার পিতার মুসলমান চাপরাশির পুত্র এবং বামে এক ধীবরপুত্র আমার সহচর ছিল। তাহাদের নিকট আমি পশুপক্ষী ও জলজন্তুর জীবনবৃত্তান্ত স্তব্ধ হইয়া শুনিতাম। সম্ভবতঃ প্রকৃতির কার্য অনুসন্ধানে অনুরাগ এই সব ঘটনা হইতেই আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। ছুটির পর যখন বয়স্যদের সহিত আমি বাড়ি ফিরিতাম তখন মাতা আমাদের আহার্য বণ্টন করিয়া দিতেন। যদিও তিনি সেকেলে এবং একান্ত নিষ্ঠাবতী ছিলেন, কিন্তু এই কার্যে যে তাঁহার নিষ্ঠার ব্যতিক্রম হয় তাহা কখনও মনে করিতেন না। ছেলেবেলায় সখ্যতা-হেতু ছোটো জাতি বলিয়া যে এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর প্রাণী আছে এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে এক সমস্যা আছে তাহা বুঝিতেও পারি নাই। সেদিন বাঁকুড়ায় 'পতিত অস্পৃশ্য' জাতির অনেকে ঘোরতর দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইতেছিল। যাঁহারা যৎসামান্য আহার্য লইয়া সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, অনশনে শীর্ণ পুরুষেরা সাহায্য অস্বীকার করিয়া মুমূর্ষু স্ত্রীলোকদিগকে দেখাইয়া দিল। শিশুরাও মুষ্টিমেয় আহার্য পাইয়া তাহা দশজনের মধ্যে বণ্টন করিল। ইহার পর প্রচলিত ভাষার অর্থ করা কঠিন হইয়াছে। বাস্তবপক্ষে কাহারা পতিত, উহারা না আমরা?

আর এক কথা। তুমি ও আমি যে শিক্ষালাভ করিয়া নিজেকে উন্নত করিতে পারিয়াছি এবং দেশের জন্য ভাবিবার অবকাশ পাইয়াছি, ইহা কাহার অনুগ্রহে? এই বিস্তৃত রাজ্যরক্ষার ভার প্রকৃতপক্ষে কে বহন করিতেছে? তাহা জানিতে সমৃদ্ধিশালী নগর হইতে তোমাদের দৃষ্টি অপসারিত করিয়া দুঃস্থ পল্লীগ্রামে স্থাপন করো। সেখানে দেখিতে পাইবে পঙ্কে অর্ধনিমজ্জিত, অনশনক্লিষ্ট, রোগে শীর্ণ, অস্থিচর্মসার এই 'পতিত' শ্রেণীরাই ধন-ধান্য দ্বারা সমগ্র জাতিকে পোষণ করিতেছে। অস্থিচূর্ণ দ্বারা নাকি ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। অস্থিচূর্ণের বোধশক্তি নাই; কিন্তু যে জীবন্ত অস্থির কথা বলিলাম, তাহার মজ্জায় চির-বেদনা নিহিত আছে।

শিল্পোদ্ধার

সম্প্রতি এই বিষয় লইয়া অনেক আন্দোলন হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, সরকারী একজন ডিরেক্টর নিযুক্ত হইলেই আমাদের দেশের শিল্পোদ্ধার হইবে। ডিরেক্টর মহোদয় সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান নহেন। এই সমস্ত গুণের সমন্বয়েও বিধাতা-পুরুষ আমাদের দুর্গতি দূর করতে পারেন নাই। ইহা হইতে মনে হয়, আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে যাহাতে আমরা একান্ত বিমুখ। জাপানে অবস্থানের কালে দেখিলাম যে, ভারতবাসী-ছাত্রগণ তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়াছে। অথচ কার্যক্ষেত্রে ভারতবাসীর কোনো স্থান নাই। জাপানী কিন্তু ঐ অবস্থাতেই সিদ্ধমনোরথ না হইয়া ক্ষান্ত হয় না। সে নিজের নিষ্ফলতার কারণ অন্যের উপর ন্যস্ত করে না। আমাদের দুরবস্থার প্রকৃত কারণ কি? কারণ এই যে, চরিত্রে আমাদের বল নাই, 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন' এ কথা আমরা কেবল মুখেই বলিয়া থাকি। আমি জানি যে, আমার বন্ধুদের মধ্যে কেহ কেহ স্বদেশী শিল্পের জন্য সর্বস্ব অর্পণ করিয়াছেন। বহুদিনের চেষ্টার পর তাঁহারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে নানাবিধ ব্যবহার্য বস্তু উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তথাপি তাঁহাদের ব্যবসা যে স্থায়ী হইবে তাহার কোনো সম্ভাবনা দেখা যায় না। তাহার প্রকৃত কারণ এই যে, এ-পর্যন্ত তাঁহারা একজনও কর্মকুশল ও কর্তব্যশীল পরিচালক দেখিতে পাইলেন না।

কেরানিবাবু শত শত পাওয়া যাইতেছে; তাহাদের কেবল কলমের ও মুখের জোর। বিদেশে দেখিয়াছি, ক্রোড়পতির পুত্রও ব্যবসায় শিক্ষার সময় আপিসে সর্বাপেক্ষা নিম্নতম কার্য গ্রহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে সেখানকার সমস্ত কার্য স্বহস্তে করিয়া সম্যক্ শিক্ষালাভ করে। আমাদের দেশে অল্পতেই লোকেরা মান ক্ষয় হয়। আমাদের দেশের ছাত্র, যাহারা আমেরিকা যাইয়া সেখানকার রীতি অনুসারে কোনো কার্যহীন জ্ঞান করে নাই; এমন-কি, দারোয়ানী করিয়া এবং বাসন ধুইয়া বহু কষ্টে শিক্ষালাভ করিয়াছে, এখানে আসিয়াই তাহারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব ভুলিয়া বিদেশীর বাহ্য ধরন-ধারণ অবলম্বন করে। তখন তাহাদের পক্ষে অনেক কার্য অপমানকর মনে হয়।

এ সব সম্বন্ধে সম্প্রতি জাপান হইতে প্রত্যাগত জনৈক বন্ধুর নিকট শুনিলাম যে, সেখানে আমাদের সম্বন্ধে দুই-একটি আমোদজনক কথা চলিতেছে। তাহাদিগের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে নাকি আমাদের গৃহিণীদের পট্টবস্ত্র হইতে হাতের চুড়ি পর্যন্ত সংগ্রহ হয় না। এখন বাঙালী বাবুদের জন্য তাহাদিগকে হুকার কল্কে পর্যন্তও প্রস্তুতের ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এতদিন পর্যন্ত তোমরা ইউরোপের উপেক্ষা বহন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছ, এখন হইতে এশিয়ারও হাস্যাস্পদ হইতে চলিলে! আমাদের দুর্বলতা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ না করিলে কোনোদিন কি শিল্পে সার্থকতা লাভ করিতে পারিবে?

মানসিক শক্তির বিকাশ

শিল্পের উন্নতির আর-এক প্রতিবন্ধক এই যে, বিদেশে শিক্ষা করিয়া উহার ঠিক সেইমত কারখানা এ দেশের ভিন্ন অবস্থায় পরিচালন করিতে গেলে তাহা সফল হয় না। অনেক কষ্টে এবং বহু বৎসর পরে যদি বা তাহা কোনো প্রকারে কার্যকরী হয় তাহা হইলেও অতিদিনে পূর্বপ্রচলিত উপায় পরিবর্তিত হইয়া যায়। পরের অনুকরণ করিতে গেলে চিরকালই এইরূপ ব্যর্থমনোরথ হইতে হইবে। কোনোদিন কি আমাদের দেশে প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা বর্ধিত হইবে না, যাঁহারা কেবল শ্রুতিধর না হইয়া স্বীয় চিন্তা বলে উদ্ভাবন এবং আবিষ্কার করিতে পারিবেন ?

যদি ভারতকে সঞ্জীবিত রাখিতে চাও তবে তাহার মানসিক ক্ষমতাকে অপ্রতিহত রাখিতে হইবে। ভারতের সমকক্ষ প্রতিযোগী বহু প্রাচীন জাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দেহের মৃত্যুই আমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ নহে। ধ্বংসশীল শরীর মৃত্তিকায় মিশিয়া গেলেও জাতীয় আশা ও চিন্তা ধ্বংস হয় না। মানসিক শক্তির ধ্বংসই প্রকৃত মৃত্যু, তাহা একেবারে আশাহীন এবং চিরন্তন।

তখনই আমরা জীবিত ছিলাম যখন আমাদের চিন্তা ও জ্ঞান-শক্তি ভারতের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশ-বিদেশে ব্যাপ্ত হইত। বিদেশ হইতে জ্ঞান আহরণ করিতেও তখন আমাদিগকে হীনতা স্বীকার করিতে হইত না। এখন সেদিন চলিয়া গিয়াছে, এখন কেবল আমরা পরমুখাপেক্ষী। জগতে ভিক্ষুকের স্থান নাই। কত কাল এই অপমান সহ্য করিবে ? তুমি কি চিরকাল ঋণীই থাকিবে ? তোমার কি কখনও দিবার শক্তি হইবে না ? ভাবিয়া দেখো, এক সময়ে দেশদেশান্তর হইতে জগতের বহু জাতি তোমার নিকট শিষ্যভাবে আসিত। তক্ষশিলা, কাঞ্চী ও নালন্দার স্মৃতি কি ভুলিয়া গিয়াছ ? বিক্রমপুর যে শিক্ষার পীঠস্থান ছিল তাহা কি স্মরণ নাই ? ভারতের দান ব্যতিরেকে জগতের জ্ঞান যে অসম্পূর্ণ থাকিবে, সম্প্রতি তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা দেবতার করুণা বলিয়া মানিতে হইবে ; এই সৌভাগ্য যেন চিরস্থায়ী হয়, ইহা কি তোমাদের অভিপ্রেত নহে ? তবে কোথায় সেই পরীক্ষাগার কোথায় সেই শিষ্যবৃন্দ ? এই সব আশা কি কেবল স্বপ্নমাত্রই থাকিবে ? আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, চেষ্টার বলে অসম্ভবও সম্ভব হয়, ইহা আমি জীবনে বারংবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অজ্ঞ হিন্দুরমণী কেবল বিশ্বাসের বলেই বহু দেবমন্দির স্থাপন করিয়াছেন। জ্ঞানমন্দির স্থাপন কি এতই অসম্ভব ?

মুষ্টিমেয় ভিক্ষার ফলে ভারতের বহু স্থানে বিশাল বৌদ্ধবিহার স্থাপিত হইয়াছে। অজ্ঞানই যে ভেদসৃষ্টির মূল এবং তোমাতে ও আমাতে যে কোনো পার্থক্য নাই, ইহা কেবল ভারতই সাধনা দ্বারা লাভ করিয়াছে। আমাদের এই বিশাল একত্বের ভাব কি জ্ঞান ও সেবার দ্বারা জগৎকে পুনঃ প্লাবিত করিবে না ?

ভয় করিতেছে কি, সমস্ত জীবন দিয়াও এই অভীষ্ঠ লাভ করিতে পারিবে না ? তোমার কি কিছুমাত্র সাহস নাই ? দ্যূতক্রীড়কও সাহসে ভর করিয়া জীবনের সমস্ত ধন পণ করিয়া পাশা নিক্ষেপ করে। তোমার জীবন কি এক মহাক্রীড়ার জন্য ক্ষেপণ করিতে পার না ? হয় জয় কিংবা পরাজয় !

বিফলতা

যদিই বা পরাজিত হইলে, যদিই বা তোমার চেষ্টা বিফল হইল, তাহা হইলেই বা কি ? তবে এক বিফল জীবনের কথা শোনো—ইহা অর্ধ শতাব্দীর পূর্বের কথা। যাঁহার কথা বলিতেছি তিনি অতদিন পূর্বেও দিব্যচক্ষে দেখিয়াছিলেন যে, শিল্প, বাণিজ্য এবং কৃষি উদ্ধার না করিলে দেশের আর কোনো উপায় নাই। দেশে যখন কাপড়ের কল প্রথম স্থাপিত হয় তাহার জন্য তিনি জীবনের প্রায় সমস্ত বিসর্জন দিয়াছিলেন। যাহারা প্রথম পথপ্রদর্শক হন তাঁহাদের যে গতি হয়, তাঁহার তাহাই হইয়াছিল। বিবিধ নূতন উদ্যমে তিনি বহু ক্ষতিগ্রস্ত হন। কৃষকদের সুবিধার জন্য তাঁহারই প্রযত্নে সর্বপ্রথমে ফরিদপুরে লোন্ আপিস স্থাপিত হয়। এখানে তাঁহার সমস্ত স্বত্ব পরকে দিয়াছিলেন। এখন তাহাতে শতগুণ লাভ হইতেছে। তাঁহারই প্রযত্নে কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য ফরিদপুরে মেলা স্থাপিত হয়। তিনি আসামে স্বদেশী চা বাগান স্থাপন করেন। তাহাতেও তাঁহার অনেক ক্ষতি হইয়াছিল ; কিন্তু তাঁহার অংশীদারগণ এখন বহুগুণ লাভ করিতেছেন। তিনিই প্রথমে নিজ ব্যয়ে টেক্‌নিক্যাল স্কুল স্থাপন করেন এবং তাহার পরিচালনে সর্বস্বান্ত হন। জীবনের শেষ ভাগে দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার সমস্ত জীবনের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ব্যর্থ ? হয়তো এ কথা তাঁহার নিজ জীবনে প্রযোজ্য হইতে পারে ; কিন্তু সেই ব্যর্থতার ফলে বহু জীবন সফল হইয়াছে। আমি আমার পিতৃদেব ৺ভগবানচন্দ্র বসুর কথা বলিতেছিলাম। তাঁহার জীবন দেখিয়া শিখিয়াছিলাম যে, সার্থকতাই ক্ষুদ্র এবং বিফলতাই বৃহৎ। এইরূপে যখন ফল ও নিষ্ফলতার মধ্যে প্রভেদ ভুলিতে শিখিলাম, তখন হইতেই আমার প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হইল। যদি আমার জীবনে কোনো সফলতা হইয়া থাকে তবে তাহা নিষ্ফলতার স্থির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

হে বঙ্গবাসী, বর্তমান দুর্দিনের কথা এখন ভাবিয়া দেখো। তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ যে, অকূল জলধি এবং হিমাচল তোমাদিগকে সমগ্র পৃথিবী হইতে নিঃসম্পর্ক রাখিতে পারিবে না ? তুমি কি বুঝিতে পার না যে, অতিমানুষী শক্তি ও জ্ঞানসম্পন্ন পরাক্রান্ত জাতির প্রতিযোগিতার দরুন সংঘর্ষের মধ্যে তুমি নিক্ষিপ্ত হইয়াছ ? তুমি কি তোমার ক্ষীণশক্তি ও জীবন লইয়া জাতীয় জীবন চিরজীবনের মতো প্রবাহিত রাখিবে আশা করিতেছ ? তুমি কি জান না যে, ধরিত্রীমাতা যেমন পাপভার বহন করিতে অসমর্থ, প্রকৃতি-জননীও সেইরূপ অসমর্থ জীবনের ভার বহন করিতে বিমুখ ? প্রকৃতি-মাতায় এই আপাতক্রূর নির্মম প্রকৃতিতেই তাঁহার স্নেহের পরাকাষ্ঠা ব্যক্ত হইয়াছে। রুগ্ণ ও দুর্বল কতকাল জীবনের যন্ত্রণা বহন করিবে ? বিনাশেই তাহার শান্তি, ধ্বংসই তাহার পরিণাম। আসিরিয়া, বেবিলন, মিশর ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে ! তোমার কী আছে, যাহার বলে তুমি জগতে চিরজীবী হইতে আকাঙ্ক্ষা কর ? বোধ হয় পূর্বপিতৃগণের অর্জিত পুণ্য এখনও কিয়ৎপরিমাণে সঞ্চিত আছে ; সেই পুণ্যবলেই বিধাতা তোমার অবসন্ন মস্তক হইতে তাঁহার অমোঘ বজ্র সংহত করিয়া রাখিয়াছেন।

এই দেশে এখনও ভগবান তথাগতের মন্দির ও বিহারের ভগ্ন চিহ্ন স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। যখন ভগবান বুদ্ধদেবের সম্মুখে বহু তপস্যালব্ধ নির্বাণের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল তখন সুদূর জগৎ হইতে উত্থিত জীবের কাতর ক্রন্দনধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সিদ্ধ পুরুষ তখন তাঁহার দুষ্কর তপস্যালব্ধ মুক্তি প্রত্যাখান করিলেন। যতদিন পৃথিবীর শেষ ধূলিকণা দুঃখচক্রে পিষ্ট হইতে থাকিবে ততদিন বহুযুগ ধরিয়া তিনি তাহার দুঃখভার স্বয়ং বহন করিবেন। কথিত আছে, পঞ্চশত জন্মপরম্পরায় সুগত জীবের দুঃসহ দুঃখভার বহন করিয়াছিলেন। এইরূপে যুগে যুগে দেবোপম মহাপুরুগগণ মানবের ক্লেশভার লাঘব করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন। সেই যুগ কি চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে? নরের দুঃখপাশ ছেদন করিবার জন্য ঈশ্বরের লীলাভূমি এই দেশে কি মহাপুরুষগণের পুনরায় আবির্ভাব হইবে না? পূর্বপিতৃগণের সঞ্চিত পুণ্যবল ও দেবতার আশীর্বাদ হইতে আমরা কি চিরতরে বঞ্চিত হইয়াছি? যখন নিশির অন্ধকার সর্বাপেক্ষা ঘোরতম তখন হইতেই প্রভাতের সূচনা। আধারের আবরণ ভাঙিলেই আলো। কোন্ আবরণে আমাদের জীবন আঁধারময় ও ব্যর্থ করিয়াছে? আলস্যে, স্বার্থপরতায় এবং পরশ্রী-কাতরতায়! ভাঙিয়া দাও এসব অন্ধকারের আবরণ! তোমাদের অন্তর্নিহিত আলোকরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া দিগ্‌দিগন্ত উজ্জ্বল করুক।

ইংরেজী-১৯১৫ সালে বিক্রমপুর সম্মিলনে জগদীশবসু প্রদত্ত সভাপতির ভাষণটি বাংলা ১৩২২ সালের মাঘ মাসের প্রবাসী পত্রিকায় মুদ্রিত হয়।

বিক্রমপুর সম্মিলনী কর্তৃক এই সম্বর্ধনা উপলক্ষে কুন্তলীন প্রেস থেকে "বিক্রমপুরের প্রীতি উপহার" নামে বিজ্ঞানীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি স্মারক হিসাবে একটি ছোট পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল। বিস্মৃতপ্রায় পুস্তিকাটির নির্বাচিত অংশবিশেষ পাঠকদের উদ্দেশে তুলে ধরা হল।

বিক্রমপুর সম্মিলনী কর্তৃক
বিজ্ঞানাচার্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের অভ্যর্থনা উপলক্ষে—

তোমারি গরবে গরবী আমরা তোমারি মানে মানী,
মেঘনার কল-কল্লোল-নাদে তোমারি কীর্ত্তিবাণী!
জড়ের জীবনে কি গোপন কথা,
বিটপীর কানে কি যে কহে লতা
কেন হাসে ফুল পুলকে আকুল জান সে নিগূঢ় বাণী!
জয় জগদীশ! রাখ জগদীশে
সুখে স্বাস্থ্যে সদা স্বদেশে বিদেশে।
নাচিছে পদ্মা শত তরঙ্গে বহিয়া সুযশ-কাহিনী।
জয় জন্মভূমি বিক্রমপুর! জয় জগদীশ জননী!

বিক্রমপুরের (জগদীশচন্দ্রের পিতৃপুরুষের জন্মভূমি) মহিমা বর্ণনা করিয়া একটি সঙ্গীত প্রকাশিত হইয়াছিল।

নিবেদন

বাইশ বৎসর পূর্বে যে স্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহাতে দেবতার করুণা জীবনে বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলাম। সেদিন যে মানস করিয়াছিলাম তাহা এতদিন পরে দেবচরণে নিবেদন করিতেছি। আজ যাহা প্রতিষ্ঠা করিলাম তাহা মন্দির, কেবলমাত্র পরীক্ষাগার নহে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য পরীক্ষা দ্বারা নির্ধারিত হয়; কিন্তু ইন্দ্রিয়েরও অতীত দুই-একটি মহাসত্য আছে, তাহা লাভ করিতে হইলে কেবলমাত্র বিশ্বাস আশ্রয় করিতে হয়।

বৈজ্ঞানিক-সত্য পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। তাহার জন্যও অনেক সাধনার আবশ্যক। যাহা কল্পনার রাজ্যে ছিল তাহা ইন্দ্রিয়গোচর করিতে হয়। যে আলো চক্ষুর অদৃশ্য ছিল তাহাকে চক্ষুগ্রাহ্য করা আবশ্যক। শরীর-নির্মিত ইন্দ্রিয় যখন পরাস্ত হয় তখন ধাতু নির্মিত অতীন্দ্রিয়ের শরণাপন্ন হই। যে জগৎ কিয়ৎক্ষণ পূর্বে অশব্দ ও অন্ধকারময় ছিল এখন তাহার গভীর নির্ঘোষ ও দুঃসহ আলোকরাশিতে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ি।

এই সকল একেবারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও মনুষ্য-নির্মিত কৃত্রিম ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা যাইতে পারে; কিন্তু আরও অনেক ঘটনা আছে যাহা সেই ইন্দ্রিয়েরও অগোচর, তাহা কেবল বিশ্বাসবলেই লাভ করা যায়। বিশ্বাসের সত্যতা সম্বন্ধেও পরীক্ষা আছে; তাহা দুই-একটি ঘটনার দ্বারা হয় না, তাহার প্রকৃত পরীক্ষা করিতে সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনার আবশ্যক। সেই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই মন্দির উত্থিত হইয়া থাকে।

কি সেই মহাসত্য যাহার জন্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল? তাহা এই যে, মানুষ যখন তাহার জীবন ও আরাধনা কোনো উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, সেই উদ্দেশ্য কখনও বিফল হয় না; তখন অসম্ভবও সম্ভব হইয়া থাকে। সাধারণের সাধুবাদ শ্রবণ আজ আমার উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু যাঁহারা কর্মসাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন এবং প্রতিকূল তরঙ্গাঘাতে মৃতকল্প হইয়া অদৃষ্টের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আমার কথা বিশেষভাবে কেবল তাঁহাদেরই জন্য।

পরীক্ষা

যে পরীক্ষার কথা বলিব তাহা শেষ করিতে দুইটি জীবন লাগিয়াছে। যেমন একটি ক্ষুদ্র লতিকার পরীক্ষায় সমস্ত উদ্ভিদ্-জীবনের প্রকৃত সত্য আবিষ্কৃত হয়, সেইরূপ একটি মনুষ্যজীবনের বিশ্বাসের ফল দ্বারা বিশ্বাস-রাজ্যের সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জন্যই স্বীয় জীবনে পরীক্ষিত সত্য সম্বন্ধে যে দুই-একটি কথা বলিব তাহা ব্যক্তিগত কথা ভুলিয়া সাধারণভাবে গ্রহণ করিবেন। পরীক্ষার আরম্ভ পিতৃদেব স্বর্গীয় ভগবানচন্দ্র বসুকে লইয়া; তাহা অর্ধ শতাব্দী পূর্বের কথা। তাঁহারই নিকট আমার

শিক্ষা ও দীক্ষা। তিনি শিখাইয়াছিলেন, অন্যের উপর প্রভুত্ব-বিস্তার অপেক্ষা নিজের জীবন শাসন বহুগুণে শ্রেয়স্কর। জনহিতকর নানা কার্যে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে তিনি তাঁহার সকল চেষ্টা ও সর্বস্ব নিয়োজিত করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। সুখ-সম্পদের কোমল শয্যা হইতে তাঁহাকে দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। সকলেই বলিত, তিনি তাঁহার জীবন ব্যর্থ করিয়াছেন। এই ঘটনা হইতেই সফলতা কত ক্ষুদ্র এবং কোনো কোনো বিফলতা কত বৃহৎ, তাহা শিখিতে পারিয়াছিলাম। পরীক্ষার প্রথম অধ্যায় এই সময় লিখিত হইয়াছিল।

তাহার পর বত্রিশ বৎসর হইল শিক্ষকতার কার্য গ্রহণ করিয়াছি। বিজ্ঞানের ইতিহাস ব্যাখ্যায় আমাকে বহু দেশবাসী মনস্বিগণের নাম স্মরণ করাইতে হইত। কিন্তু তাহার মধ্যে ভারতের স্থান কোথায় ? শিক্ষাকার্যে অন্যে যাহা বলিয়াছে সেই সকল কথাই শিখাইতে হইত। ভারতবাসীরা যে কেবল ভাবপ্রবণ ও স্বপ্নাবিষ্ট, অনুসন্ধানকার্য কোনোদিনই তাহাদের নহে, সেই এক কথাই চিরদিন শুনিয়া আসিতাম। বিলাতের ন্যায় এদেশে পরীক্ষাগার নাই, সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মাণও এদেশে কোনোদিন হইতে পারে না, তাহাও কতবার শুনিয়াছি। তখন মনে হইল, যে ব্যক্তি পৌরুষ হারাইয়াছে কেবল সে-ই বৃথা পরিতাপ করে। অবসাদ দূর করিতে হইবে, দুর্বলতা ত্যাগ করিতে হইবে। ভারতই আমাদের কর্মভূমি, সহজ পন্থা আমাদের জন্য নহে। তেইশ বৎসর পূর্বে অদ্যকার দিনে এই সকল কথা স্মরণ করিয়া একজন তাহার সমগ্র মন, সমগ্র প্রাণ ও সাধনা ভবিষ্যতের জন্য নিবেদন করিয়াছিল। তাহার ধনবল কিছুই ছিল না, তাহার পথপ্রদর্শকও কেহ ছিল না। বহু বৎসর ধরিয়া একাকী তাহাকে প্রতিদিন প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুঝিতে হইয়াছিল। এতদিন পরে তাহার নিবেদন সার্থক হইয়াছে।

জয়-পরাজয়

তেইশ বৎসর পূর্বে অদ্যকার দিনে যে আশা লইয়া কার্য আরম্ভ করিয়াছিলাম, দেবতার করুণায় তিন মাসের মধ্যে তাহার প্রথম ফল ফলিয়াছিল। জার্মানীতে আচার্য হার্টস বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্বন্ধে যে দুরূহ কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার বহুল বিস্তার ও পরিণতি এখানেই সম্ভাবিত হইয়াছিল। কিন্তু এদেশের কোনো এক প্রসিদ্ধ সভাতে আমার আবিষ্ক্রিয়ার সংবাদ যখন পাঠ করি তখন সভাস্থ কোনো সভ্যই আমার কার্য সম্বন্ধে কোনো মতবাদ প্রকাশ করিলেন না। বুঝিতে পারিলাম, ভারতবাসীর বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা একান্ত সন্দিহান। অতঃপর আমার দ্বিতীয় আবিষ্কার বর্তমান কালের সর্বপ্রধান পদার্থবিদের নিকট প্রেরণ করি। আজ বাইশ বৎসর পরে তাহার উত্তর পাইলাম। তাহাতে অবগত হইলাম যে, আমার আবিষ্ক্রিয়া রয়েল সোসাইটি দ্বারা প্রকাশিত হইবে এবং এই তথ্য ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক উন্নতির সহায়ক হইবে বলিয়া পার্লিয়ামেণ্ট কর্তৃক প্রদত্ত বৃত্তি আমার গবেষণাকার্যে নিয়োজিত

হইবে। সেই দিনে ভারতের সম্মুখে যে দ্বার অর্গলিত তাহা সহসা উন্মুক্ত হইল। আর কেহ সেই উন্মুক্ত দ্বার রোধ করিতে পারিবে না। সেই দিন যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে তাহা কখনও নির্বাপিত হইবে না।

এই আশা করিয়াই আমি বৎসরের পর বৎসর অক্লান্ত মন ও শরীর লইয়া কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছিলাম। কিন্তু মানুষের প্রকৃত পরীক্ষা এক দিনে হয় না, সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া তাহাকে আশা ও নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিত হইতে হয়। যখন আমার বৈজ্ঞানিক প্রতিপত্তি আশাতীত উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল তখনই সমস্ত জীবনের কৃতিত্ব ব্যর্থপ্রায় হইতেছিল।

তখন তারহীন সংবাদ ধরিবার কল নির্মাণ করিয়া পরীক্ষা করিতেছিলাম। দেখিলাম, হঠাৎ কলের সাড়া কোনো অজ্ঞাত কারণে বন্ধ হইয়া গেল। মানুষের লেখাভঙ্গী হইতে তাহার শারীরিক দুর্বলতা ও ক্লান্তি যেরূপ অনুমান করা যায়, কলের সাড়ালিপিতে সেই একই রূপ চিহ্ন দেখিলাম। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বিশ্রামের পর কলের ক্লান্তি দূর হইল এবং পুনরায় সাড়া দিতে লাগিল। উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগে তাহার সাড়া দিবার শক্তি বাড়িয়া গেল এবং বিষ প্রয়োগে তাহার সাড়া একেবারে অন্তর্হিত হইল। যে সাড়া দিবার শক্তি জীবনের এক প্রধান চিহ্ন বলিয়া গণ্য হইত, জড়েও তাহার ক্রিয়া দেখিতে পাইলাম। এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা আমি রয়েল সোসাইটির সমক্ষে পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম ; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রচলিত মত-বিরুদ্ধ বলিয়া জীবতত্ত্ববিদ্যার দুই-একজন অগ্রণী ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তদ্ভিন্ন আমি পদার্থবিৎ, আমার স্বীয় গণ্ডি ত্যাগ করিয়া জীবতত্ত্ববিদের নূতন জাতিতে প্রবেশ করিবার অনধিকার চেষ্টা রীতিবিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইল। তাহার পর আরও দুই-একটি অশোভন ঘটনা ঘটিয়াছিল। যাঁহারা আমার বিরুদ্ধপক্ষে ছিলেন তাঁহাদেরই মধ্যে একজন আমার আবিষ্কার পরে নিজের বলিয়া প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। ফলে, বহু বৎসর যাবৎ আমার সমুদয় কার্য পণ্ডপ্রায় হইয়াছিল। এতকাল একদিনের জন্যও মেঘরাশি ভেদ করিয়া আলোকের মুখ দেখিতে পাই নাই। এই সকল স্মৃতি অতিশয় ক্লেশকর। বলিবার একমাত্র আবশ্যকতা এই যে, যদি কেহ কোনো বৃহৎ কার্যে জীবন উৎসর্গ করিতে উন্মুখ হন, তিনি যেন ফলাফলে নিরপেক্ষ হইয়া থাকেন। যদি অসীম ধৈর্য থাকে, কেবল তাহা হইলেই বিশ্বাস-নয়নে কোনোদিন দেখিতে পাইবেন, বারংবার পরাজিত হইয়াও যে পরাঙ্মুখ হয় নাই সে-ই একদিন বিজয়ী হইবে।

পৃথিবী পর্যটন

ভাগ্য ও কার্যচক্র নিরন্তর ঘুরিতেছে—তাহার নিয়ম—উত্থান, পতন, আবার পুনরুত্থান। দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া যে ঘন দুর্দিন আমাকে ম্রিয়মাণ করিয়াও সম্পূর্ণ পরাভব করিতে পারে নাই, সে দুর্যোগও একদিন অভাবনীয়রূপে কাটিয়া গেল। আমার নূতন আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রচার করিবার জন্য ভারত-গভর্নমেণ্ট ১৯১৪ খৃস্টাব্দে আমাকে পৃথিবী পর্যটনে প্রেরণ করেন। সেই উপলক্ষে লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, প্যারিস, ভিয়েনা, হার্ভার্ড, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, ফিলাডেলফিয়া

সিকাগো, কালিফোর্নিয়া, টোকিও ইত্যাদি স্থানে আমার পরীক্ষা প্রদর্শিত হয়। এই সকল স্থানে জয়মাল্য লইয়া কেহ আমার প্রতীক্ষা করে নাই, বরং আমার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিগণ আমার ত্রুটি দেখাইবার জন্য দলবদ্ধ হইয়া উপস্থিত ছিলেন। তখন আমি সম্পূর্ণ একাকী ; অদৃশ্যে কেবল সহায় ছিলেন ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মী। এই অসম সংগ্রামে ভারতেরই জয় হইল এবং যাঁহারা আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাঁহারা পরে আমার পরম বান্ধব হইলেন।

বীরনীতি

বর্তমান উদ্ভিদবিদ্যার অসীম উন্নতি লাইপজিগের জার্মান অধ্যাপক ফেফারের অর্ধ শতাব্দীর অসাধারণ কৃতিত্বের ফল। আমার কোনো কোনো আবিষ্ক্রিয়া ফেফারের কয়েকটি মতের বিরুদ্ধে। তাঁহার অসন্তোষ উৎপাদন করিয়াছি মনে করিয়া আমি লাইপজিগ না গিয়া ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। সেখানে ফেফার তাঁহার সহযোগী অধ্যাপককে আমায় নিমন্ত্রণ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, আমার প্রতিষ্ঠিত নূতন তত্ত্বগুলি জীবনের সন্ধ্যার সময় তাঁহার নিকট পেঁছিয়াছে ; তাঁহার দুঃখ রহিল যে, এই সকল সত্যের পরিণতি তিনি এ-জীবনে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। যাঁহার বৈরীভাব আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তিনিই মিত্ররূপে আমাকে গ্রহণ করিলেন। ইহাই তো চিরন্তন বীরনীতি, যাহা আপনার পরাভবের মধ্যেও সত্যের জয় দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হয়। তিন সহস্র বৎসর পূর্বে এই বীরধর্ম কুরুক্ষেত্রে প্রচারিত হইয়াছিল। অগ্নিবাণ আসিয়া যখন ভীষ্মদেবের মর্মস্থান বিদ্ধ করিল তখন তিনি আনন্দের আবেগে বলিয়াছিলেন, সার্থক আমার শিক্ষাদান! এই বাণ শিখণ্ডীর নহে, ইহা আমার প্রিয়শিষ্য অর্জুনের।

পৃথিবী পর্যটন ও স্বীয় জীবনের পরীক্ষার দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছি যে, নূতন সত্য আবিষ্কার করিবার জন্য সমস্ত জীবন পণ ও সাধনার আবশ্যক। জগতে তাহার প্রচার আরও দুরূহ। ইহাতে আমার পূর্বসংকল্প দৃঢ়তর হইয়াছে। বহুদিন সংগ্রামের পর ভারত বিজ্ঞানক্ষেত্রে যে স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা যেন চিরস্থায়ী হয়। আমার কার্য যাঁহারা অনুসরণ করিবেন তাঁহাদের পথ যেন কোনোদিন অবরুদ্ধ না হয়!

বিজ্ঞান-প্রচারে ভারতের দান

বিজ্ঞান তো সার্বভৌমিক, তবে বিজ্ঞানের মহাক্ষেত্রে এমন-কি কোনো স্থান আছে যাহা ভারতীয় সাধক ব্যতীত অসম্পূর্ণ থাকিবে? তাহা নিশ্চয়ই আছে। বর্তমান-কালে বিজ্ঞানের প্রসার বহুবিস্তৃত হইয়াছে এবং প্রতীচ্যদেশে কার্যের সুবিধার জন্য তাহা বহুবিস্তৃত হইয়াছে এবং বিভিন্ন শাখার মধ্যে অভেদ্য প্রাচীর উত্থিত হইয়াছে। দৃশ্যজগৎ অতি বিচিত্র এবং বহুরূপী। এত বিভিন্নতার মধ্যে যে কিছু সাম্য আছে তাহা বোধগম্য হয় না। সতত চঞ্চল প্রাণী, আর এই চিরমৌন অবিচলিত উদ্ভিদ,

ইহাদের মধ্যে কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। আর এই উদ্ভিদের মধ্যে একই কারণে বিভিন্নরূপে সাড়া দেখা যায়। কিন্তু এত বৈষম্যের মধ্যেও ভারতীয় চিন্তাপ্রণালী একতার সন্ধানে ছুটিয়া জড়, উদ্ভিদ ও জীবের মধ্যে সেতু বাঁধিয়াছে। এতদর্থে ভারতীয় সাধক কখনও তাহার চিন্তা কল্পনার উন্মুক্ত রাজ্যে অবাধে প্রেরণ করিয়াছে এবং পরমুহূর্তেই তাহাকে শাসনের অধীনে আনিয়াছে। আদেশের বলে জড়বৎ অঙ্গুলিতে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে এবং যে স্থলে মানুষের ইন্দ্রিয় পরাস্ত হইয়াছে তথায় কৃত্রিম অতীন্দ্রিয় সৃজন করিয়াছে। তাহা দিয়া এবং অসীম ধৈর্য সম্বল করিয়া অব্যক্ত জগতের সীমাহীন রহস্যের পরীক্ষাপ্রণালীতে স্থির প্রতিষ্ঠা করিবার সাহস বাঁধিয়াছে। যাহা চক্ষুর অগোচর ছিল তাহা দৃষ্টিগোচর করিয়াছে; কৃত্রিম চক্ষু পরীক্ষা করিয়া মনুষ্যদৃষ্টির অভাবনীয় এমন এক নূতন রহস্য আবিষ্কার করিয়াছে যে, তাহার দুইটি চক্ষু এক সময়ে জাগরিত থাকে না; পর্যায়ক্রমে একটি ঘুমায়, আর-একটি জাগিয়া থাকে। ধাতুপাত্রে লুক্কায়িত স্মৃতির অদৃশ্য ছাপ প্রকাশিত করিয়া দেখাইয়াছে। অদৃশ্য-আলোক সাহায্যে কৃষ্ণপ্রস্তরের ভিতরের নির্মাণকৌশল বাহির করিয়াছে। আণবিক কারুকার্য ঘূর্ণ্যমান বিদ্যুৎ-ঊর্মির দ্বারা দেখাইয়াছে। বৃক্ষজীবনে মানবীয় জীবনের প্রতিকৃতি দেখাইয়া নির্বাক জীবনের উত্তেজনা মানবের অনুভূতির অন্তর্গত করিয়াছে। বৃক্ষের অদৃশ্য বৃদ্ধি মাপিয়া লইয়াছে এবং বিভিন্ন আহার ও ব্যবহারে সেই বৃদ্ধিমাত্রার পরিবর্তন মুহূর্তে ধরিয়াছে। মনুষ্যস্পর্শেও যে বৃক্ষ সংকুচিত হয়, তাহা প্রমাণ করিয়াছে। যে উত্তেজক মানুষকে উৎফুল্ল করে, যে মাদক তাহাকে অবসন্ন করে, যে বিষ তাহার প্রাণনাশ করে, উদ্ভিদেও তাহাদের একই বিধ ক্রিয়া প্রমাণিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিষে অবসন্ন মুমূর্ষু উদ্ভিদকে ভিন্ন বিষ প্রয়োগ দ্বারা পুনজীবিত করিয়াছে। উদ্ভিদপেশীর স্পন্দন লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাতে হৃদয়স্পন্দনের প্রতিচ্ছায়া দেখাইয়াছে। বৃক্ষশরীরে স্নায়ুপ্রভাব আবিষ্কার করিয়া তার বেগ নির্ণয় করিয়াছে। প্রমাণ করিয়াছে যে, যে সকল কারণে মানুষের স্নায়ুর উত্তেজনা বর্ধিত বা মন্দীভূত হয় সেই একই কারণে উদ্ভিদ স্নায়ুর আবেগও উত্তেজিত অথবা প্রশমিত হয়। এই সকল কথা কল্পনাপ্রসূত নহে। যে সকল অনুসন্ধান আমার পরীক্ষাগারে গত তেইশ বৎসর ধরিয়া পরীক্ষিত এবং প্রমাণিত হইয়াছে ইহা তাহারই অতি সংক্ষিপ্ত ও অপরিপূর্ণ ইতিহাস। যে সকল অনুসন্ধানের কথা বলিলাম তাহাতে নানাপথ দিয়া পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, এমন-কি মনস্তত্ত্ববিদ্যাও এক কেন্দ্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। বিধাতা যদি বিজ্ঞানের কোনো বিশেষ তীর্থ ভারতীয় সাধকের জন্য নির্দেশ করিয়া থাকেন তবে এই চতুর্বেণী-সংগমেই সেই মহাতীর্থ।

আশা ও বিশ্বাস

এই সকল অনুসন্ধান বিজ্ঞানের বহু শাখা লইয়া। কেহ কেহ মনে করেন, ইহাদের বিকাশে নানা ব্যবহারিক বিদ্যার উন্নতি এবং জগতের কল্যাণ সাধিত হইবে। যে সকল আশা ও বিশ্বাস লইয়া আমি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলাম তাহা কি একজনের জীবনের সঙ্গেই সমাপ্ত হইবে? একটিমাত্র বিষয়ের জন্য বীক্ষণাগার নির্মাণে অপরিমিত ধনের আবশ্যক হয়; আর এইরূপ অতি বিস্তৃত এবং বহুমুখী জ্ঞানের বিস্তার যে আমাদের দেশের পক্ষে অসম্ভব, একথা বিজ্ঞজন মাত্রেই বলিবেন। কিন্তু আমি অসম্ভাব্য বিষয়ের উপলক্ষে কেবলমাত্র বিশ্বাসের বলেই চিরজীবন চলিয়াছি; ইহা তাহারই মধ্যে অন্যতম। 'হইতে পারে না' বলিয়া কোনোদিন পরাঙ্মুখ হই নাই; এখনও হইব না। আমার যাহা নিজস্ব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম তাহা এই কার্যেই নিয়োগ করিব। রিক্তহস্তে আসিয়াছিলাম, রিক্তহস্তেই ফিরিয়া যাইব; ইতিমধ্যে যদি কিছু সম্পাদিত হয় তাহা দেবতার প্রাসাদ বলিয়া মানিব। আর একজনও এই কার্যে তাঁহার সর্বস্ব নিয়োগ করিবেন, যাঁহার সাহচর্য আমার দুঃখ এবং পরাজয়ের মধ্যেও বহুদিন অটল রহিয়াছে। বিধাতার করুণা হইতে কোনদিন একেবারে বঞ্চিত হই নাই। যখন আমার বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বে অনেকে সন্দিহান ছিলেন তখনও দুই-এক জনের বিশ্বাস আমাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল। আজ তাঁহারা মৃত্যুর পরপারে।

আশঙ্কা হইয়াছিল, কেবলমাত্র ভবিষ্যতের অনিশ্চিত বিধানের উপরেই এই মন্দিরের স্থায়িত্ব নির্ভর করিবে। অল্পদিন হইল বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমি যে আশায় কার্য আরম্ভ করিয়াছি তাহার আহ্বান ভারতের দূরস্থানেও মর্ম স্পর্শ করিয়াছে। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, আমি যে বৃহৎ সংকল্প করিয়াছিলাম তাহার পরিণতি একেবারে অসম্ভব নহে। জীবিত থাকিতেই হয়তো দেখিতে পাইব যে, এই মন্দিরের শূন্য অঙ্গন দেশবিদেশ হইতে সমাগত যাত্রী দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে।

আবিষ্কার এবং প্রচার

বিজ্ঞান অনুশীলনের দুইটি দিক আছে। প্রথমত নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার; ইহাই এই মন্দিরের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহার পর, জগতে সেই নূতন তত্ত্ব প্রচার। সেইজন্যেই এই সুবৃহৎ বক্তৃতাগৃহ নির্মিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা ও তাহার পরীক্ষার জন্য এইরূপ গৃহ বোধ হয় অন্য কোথাও নির্মিত হয় নাই। দেড় সহস্র শ্রোতার এখানে সমাবেশ হইতে পারিবে। এস্থানে কোনো বহুচর্বিত তত্ত্বের পুনরাবৃত্তি হইবে না। বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই মন্দিরে যে সকল আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে সেই সকল নূতন সত্য এস্থানে পরীক্ষা সহকারে সর্বাগ্রে প্রচারিত হইবে। সর্বজাতির সকল নরনারীর জন্য এই মন্দিরের দ্বার চিরদিন উন্মুক্ত থাকিবে। মন্দির হইতে প্রচারিত পত্রিকা দ্বারা নব নব প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জগতে পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট বিজ্ঞাপিত হইবে এবং হয়তো তদ্দারা ব্যবহারিক বিজ্ঞানেরও উন্নতি সাধিত হইবে।

আমার আরও অভিপ্রায় এই যে, এ মন্দিরের শিক্ষা হইতে বিদেশবাসীও বঞ্চিত হইবে না। বহুশতাব্দী পূর্বে ভারতে জ্ঞান সার্বভৌমিকরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। এই দেশে নালান্দা এবং তক্ষশিলায় দেশদেশান্তর হইতে আগত শিক্ষার্থী সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। যখনই আমাদের দিবার শক্তি জন্মিয়াছে তখনই আমরা মহৎরূপে দান করিয়াছি—ক্ষুদ্রে কখনই আমাদের তৃপ্তি নাই। সর্বজীবনের স্পর্শে আমাদের জীবন প্রাণময়। যাহা সত্য, যাহা সুন্দর, তাহাই আমাদের আরাধ্য। শিল্পী কারুকার্যে এই মন্দির মণ্ডিত করিয়াছেন এবং চিত্রকর আমাদের হৃদয়ের অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা চিত্রপটে বিকশিত করিয়াছেন।

আমি যে উদ্ভিদ-জীবনের কথা বলিয়াছি তাহা আমাদের জীবনেরই প্রতিধ্বনি। সে জীবন আহত হইয়া মুমূর্ষুপ্রায় হয় এবং ক্ষণিক মূর্ছা হইতে পুনরায় জাগিয়া উঠে। এই আঘাতের দুইটি দিক আছে; আমরা সেই দুইয়ের সংযোগস্থলে বর্তমান। এক দিকে জীবনের, অপর দিকে মৃত্যুর পথ প্রসারিত। জীবের স্পন্দন আঘাতেরই ক্রিয়া, যে আঘাত হইতে আমরা পুনরায় উঠিতে পারি। প্রতি মুহূর্তে আমরা আঘাত দ্বারা মুমূর্ষু হইতেছি পুনরায় সঞ্জীবিত হইতেছি। আঘাতের বলেই জীবনের শক্তি বর্ধিত হইতেছে। তিল তিল করিয়া মরিতেছি বলিয়াই আমরা বাঁচিয়া রহিয়াছি।

একদিন আসিবে যখন আঘাতের মাত্রা ভীষণ হইবে; তখন যাহা হেলিয়া পড়িবে তাহা আর উঠিবে না; অন্য কেহও তাহাকে তুলিয়া ধরিতে পারিবে না। ব্যর্থ তখন স্বজনের ক্রন্দন, ব্যর্থ তখন সতীর জীবনব্যাপী ব্রত ও সাধনা। কিন্তু যে মৃত্যুর স্পর্শে সমুদয় উৎকণ্ঠা ও চাঞ্চল্য শান্ত হয় তাহার রাজত্ব কোন্ কোন্ দেশ লইয়া? কে ইহার রহস্য উদ্ঘাটন করিবে? অজ্ঞান-তিমিরে আমরা একেবারে আচ্ছন্ন। চক্ষুর আবরণ অপসারিত হইলেই এই ক্ষুদ্র বিশ্বের পশ্চাতে অচিন্তনীয় নূতন বিশ্বের অনন্ত ব্যাপ্তিতে আমরা অভিভূত হইয়া পড়ি।

কে মনে করিতে পারিত, এই আর্তনাদবিহীন উদ্ভিদজগতে, এই তুষ্ণীম্ভূত অসীম জীবসঞ্চারে অনুভূতিশক্তি বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। তাহার পর কি করিয়াই বা স্নায়ুসূত্রের উত্তেজনা হইতে তাহারই ছায়ারূপিণী অশরীরী স্নেহমমতা উদ্ভূত হইল! ইহার মধ্যে কোন্‌টা অজর, কোন্‌টা অমর? যখন এই ক্রীড়াশীল পুত্তলিদের খেলা শেষ হইবে এবং তাহাদের দেহাবশেষ পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে তখন সেই সকল অশরীরী ছায়া কি আকাশে মিলাইয়া যাইবে, অথবা অধিকতররূপে পরিস্ফুট হইবে?

কোন্ রাজ্যের উপর তবে মৃত্যুর অধিকার? মৃত্যুই যদি মনুষ্যের একমাত্র পরিণাম তবে ধনধান্যে পূর্ণা পৃথিবী লইয়া সে কী করিবে? কিন্তু মৃত্যু সর্বজয়ী নহে; জড়-সমষ্টির উপরই কেবল তাহার আধিপত্য। মানব-চিন্তাপ্রসূত স্বর্গীয় অগ্নি মৃত্যুর আঘাতেও নির্বাপিত হয় না। অমরত্বের বীজ চিন্তায়, বিত্তে নহে। মহাসাম্রাজ্য দেশ-বিজয়ে কোনোদিন স্থাপিত হয় নাই। তাহার প্রতিষ্ঠা কেবল চিন্তা ও দিব্যজ্ঞান প্রচার দ্বারা সাধিত হইয়াছে। বাইশ শত বৎসর পূর্বে এই ভারতখণ্ডেই অশোক যে

মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা কেবল শারীরিক বল ও পার্থিব ঐশ্বর্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সেই মহাসাম্রাজ্যে যাহা সঞ্চিত হইয়াছিল তাহা কেবল বিতরণের জন্য, এবং জীবের কল্যাণের জন্য। জগতের মুক্তি-হেতু সমস্ত বিতরণ করিয়া এমন দিন আসিল যখন সেই সসাগরা ধরণীর অধিপতি অশোকের অর্ধ আমলক মাত্র অবশিষ্ট রহিল। তখন তাহা হস্তে লইয়া তিনি কহিলেন—এখন ইহাই আমার সর্বস্ব, ইহাই যেন আমার চরম দানরূপে গৃহীত হয়।

অর্ঘ্য

এই আমলকের চিহ্ন মন্দিরগাত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। পতাকা-স্বরূপ সর্বোপরি বজ্র-চিহ্ন প্রতিষ্ঠিত—যে দৈবঅস্ত্র নিষ্পাপ দধীচি মুনির অস্থি দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। যাঁহারা পরার্থে জীবন দান করেন তাঁহাদের অস্থি দ্বারাই বজ্র নির্মিত হয়, যাহার জ্বলন্ত তেজে জগতে দানবত্বের বিনাশ ও দেবত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। আজ আমাদের অর্ঘ্য অর্ধ আমলক মাত্র ; কিন্তু পূর্বদিনের মহিমা মহত্তর হইয়া পুনর্জন্ম লাভ করিবেই করিবে। এই আশা লইয়া অদ্য আমরা ক্ষণকালের জন্য এখানে দাঁড়াইলাম কল্য হইতে পুনরায় কর্মস্রোতে জীবনতরী ভাসাইব। আজ কেবল আরাধ্যা দেবীর পূজার অর্ঘ্য লইয়া এখানে আসিয়াছি। তাঁহার প্রকৃত স্থান বাহিরে নহে, হৃদয়মন্দিরে। তাঁহার প্রকৃত উপকরণ ভক্তের বাহুবলে, অন্তরের শক্তিতে এবং হৃদয়ের ভক্তিতে। তাহার পর সাধক কি আশীর্বাদ আকাঙ্ক্ষা করিবে? যখন প্রদীপ্ত জীবন নিবেদন করিয়াও তাহার সাধনার সমাপ্তি হইবে না, যখন পরাজিত ও মুমূর্ষু হইয়া সে মৃত্যুর অপেক্ষা করিবে, তখনই আরাধ্যা দেবী তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন। এইরূপ পরাজয়ের মধ্য দিয়াই সে তাহার পুরস্কার লাভ করিবে।

ইং ১৯১৭ সালের ৩০শে নভেম্বর বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আচার্য জগদীশচন্দ্রের ভাষণ। ১৩২৪ সালের পৌষসংখ্যা প্রবাসী পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। সেকালের "নারায়ণ" ও "সাহিত্য" পত্রিকায়ও ভাষণটি মুদ্রিত হয়েছিল।

প্রশ্নোত্তর বিভাগে আচর্য জগদীশচন্দ্রের উত্তর ঃ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'ভাণ্ডার পত্রিকার' জ্যৈষ্ঠ ১৩১২

শিক্ষার আদর্শ দুরূহতর ও পরীক্ষা কঠিনতর করা সম্বধে "ভাণ্ডারে" যে প্রশ্ন তোলা হইয়াছে, আমি কেবল বিজ্ঞানের পক্ষ হইতে সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিব।

একথা সকলেই জানেন যে, আমাদের দেশে শিক্ষিতদের মধ্যেও বিজ্ঞানচর্চা তেমন করিয়া ছড়াইয়া পড়ে নাই। দেশী ভাষায় সাহিত্যের যেমন উন্নতি হইয়াছে, বিজ্ঞানের তেমন হয় নাই। ইহা তাহার একটি প্রমাণ।

এমন স্থলে, এ দেশের য়ুনিভার্সিটিকে এ দেশের অবস্থা ও অভাব বিশেষভাবে বিচার করিয়া কাজ করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই;—অন্য দেশের অনুকরণ করিতে গেলে, সে দেশের লোক যে ফল পাইতেছে তাহাও পাইব না, আমরা যে ফল আশা করিতে পারিতাম তাহা হইতেও বঞ্চিত হইব। যে ব্যক্তি চলিতে শিখিলেই আপাতত খুশি হওয়া যায়, তাহাকে একদমে লাফ দিতে শিখাইতে হইবে এমন পণ করিয়া বসিলে, লাফ দেওয়া ত হইবে না, মাঝে হইতে চলাই দুর্ঘট হইবে।

দেশে যাহারা একটা নূতন ব্যবসা চালাইতে চায়, তাহারা কি উপায় গ্রহণ করে? ভারতীয়দের মধ্যে চায়ের ব্যবসা জাকাইয়া তুলিবার জন্য কি করা হইয়াছে? দেশের যথাসম্ভব লোক যাহাতে চায়ের স্বাদ পায়, চা পান করিতে অভ্যস্ত হয়, তাহার জন্য দেশ জুড়িয়া সস্তায় চা-বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। অত্যন্ত সেরাজাতের দামী চা চড়াদরে বাজারে বাহির করা, দেশে চা-প্রচলনের পক্ষে ভাল উপায় বলিয়া গণ্য হয় নাই।

দেশে নূতন বিদ্যা চালাইবারও এই একই উপায়। প্রথম পরিচয়ের স্বাদ বিস্তার করিবার জন্য শিক্ষার প্রণালীকে সরল করা চাই;—যখন অনেক লোকের মধ্যে শিক্ষার গোড়াপত্তন হইয়া যাইবে, দেশের লোক যখন এই বিদ্যার রস পাইতে থাকিবে, তখন যোগ্যতার বাছাই করিবার জন্য এখনকার চেয়ে কড়াক্কড়ি চলিতে পারিবে।

বিদেশী য়ুনিভার্সিটির চেয়ে আমাদের আদর্শে খাটো হইয়া পড়িবে, এই মিথ্যা লজ্জার কোন মূল্য নাই। সেখানকার আদর্শও চিরদিন একইভাবে ছিল না—জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে।

যাই হোক না কেন, রাজবাড়ীতে সকলে ক্ষীর খাইতেছে বলিয়া, দরিদ্র বেচারাকে সেই আদেশে লজ্জার বলে দুধ খাওয়া ছাড়িতে কেহ পরামর্শ দিবে না—আপাতত যাহা আমাদের পুষ্টির পক্ষে প্রয়োজন সেই দিকে মন দিতে হইবে—গৌরবের কথা পরে ভাবা যাইবে।

তাছাড়া, আর একটি কথা বলিবার আছে। বিজ্ঞানের কূটতত্ত্ব ও কঠিন সমস্যা

লইয়া নাড়াচাড়া করিলেই যে উদ্ভাবনী শক্তি বাড়ে তাহা নহে। প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়, ভাল করিয়া দেখিতে শেখাই, বিজ্ঞান সাধকের মুখ্য সম্বল। বিজ্ঞান পাণ্ডিত্যে যাহারা যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহারা যে বিদ্যালয়ে অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা দিয়া বড় হইয়াছেন তাহা নহে।

আমাদের দেশে আমরা যদি যথার্থ বিজ্ঞানীদের অভ্যুদয় দেখিতে চাই, তবে শিক্ষার আদর্শ দুরূহ ও পরীক্ষা কঠিন করিলেই সে ফল পাইব না। তাহার জন্য দেশে বিজ্ঞানের সাধারণ ধারণা ব্যপ্ত হওয়া চাই, এবং ছাত্ররা যাহাতে পুঁথিগত বিদ্যার শুষ্ক পাঠানোর মধ্যে বদ্ধ না থাকিয়া, প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য বিজ্ঞান দৃষ্টি চালনার চর্চা করিতে পারে, তহার উপায় করিতে হইবে।

এরূপ শিক্ষা ভাগ্যদোষে দুর্লভ হইতে পারে, কিন্তু দুরূহ নহে।

ভারতের যুবকগণের প্রতি জগদীশচন্দ্র

জাতীয় আত্মশক্তি উদ্বোধনে সংবাদপত্রের কর্ত্তব্য

১৯২৬ ও ১৯২৭ সালে জগদীশচন্দ্র আনন্দবাজার পত্রিকাতে নিম্নলিখিত দুইটি বিশেষ বাণী দেন। (আনন্দবাজার পত্রিকায় আচার্যের বাণী)

যুবক গণের দুঃসাধ্য দায়িত্ব

'বাঙ্গালার আশা আকাঙ্ক্ষা, উদ্যম ও উৎসাহ আনন্দবাজার পত্রিকায় অভিব্যক্ত হইতেছে দেখিয়া আশান্বিত হইয়াছি।

জগতের সকল দেশেই মানুষ জীবনের পথে জয়যাত্রা করিয়াছে। তাহারা কেবলই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, পশ্চাতে চাহিবার অবসর কাহারও নাই। কেবল ভারতবর্ষ, যাহার পশ্চাতে পাঁচ হাজার বৎসরের সভ্যতা সঞ্চিত রহিয়াছে, সেই আমাদের দেশ সকলের পশ্চাতে পড়িয়া আছে। জগৎ সভার মাঝে সে আজ অবজ্ঞাত উপেক্ষিত।

যুবকেরাই আজ এই লজ্জা দূর করিবে। এবং জাতির কলঙ্ক মোচন করিবে যুবকেরাই সকল দেশে দুঃসাধ্য দায়িত্বভার গ্রহণ করে। ভয়ের অতীত হইয়া দুর্গম পথে অগ্রবর্ত্তী হয়। জাতির পুঞ্জীভূত জড়তা ও ঔদাসীন্য ঘুচাইয়া নব শক্তির প্রেরণা আনয়ন করে।

ভারতের যুবকদলই এই মহৎ আদর্শের পতাকা বহন করিবে—পুঞ্জীভূত দুঃখ ও নৈরাশ্যের অন্ধকারে আশার বর্তিকা হস্তে অগ্রসর হইবে। নিশ্চয়ই তাহার জয়যুক্ত হইবে।

দুস্কর সাধনা ও তপস্যা ব্যতীত কখনই কোন মহৎ ব্রত উদযাপন করা যায় না। হাই আমাদের পূর্ব পিতৃগণের বাণী। ভারতের সাধনা ও তপস্যার সুদীর্ঘ

ইতিহাসের মধ্য দিয়া এই বাণীই বিঘোষিত হইয়াছে। লক্ষ্য সাধনের জন্য দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রম, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় প্রয়োজন। সর্বপ্রকার বাধাবিঘ্ন, দুঃখ বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া বীরের মত অগ্রসর হইতে পরাজয় ও বিফলতায় আশাহীন হইও না। যে সহস্রবার পরাজিত হইয়াছে, কেবল সেই একবার জয়যুক্ত হইবে।

আমাদের যুবকেরা অনেক সময়ে অল্পেই নিরাশ হইয়া পড়ে। সামান্য আঘাতেই নুইয়া পড়ে, সহজেই সিদ্ধিলাভ করিতে চায় কিন্তু জগতে যে সব মহৎ কার্য হইয়াছে, বৃহৎ আবিষ্কার হইয়াছে, তাহার মূলে কত ত্যাগ, কত সাধনা, কত সুদীর্ঘকালের অধ্যবসায়, কত চিন্তা ও উদ্বেগপূর্ণ বিনিদ্র রজনী নিহিত রহিয়াছে।

যাহারা দুঃখ স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ তাহারা কোনদিনও জাতির দুর্গতি দূর করিতে সমর্থ হইবে না। যাঁহারা ভগীরথের মত তেজোময় দুর্দ্ধর্ষ গঙ্গাপ্রবাহ চালিত করিয়াছেন তাঁহারা কেহই সহজে ও অল্পায়াসে সেই দুঃসাধ্য ব্রত উদ্‌যাপন করিতে পারেন নাই। পদে পদে পরাজিত ও বিফল হইয়াও তাঁহারা অবিচল চিত্তে অগ্রসর হইয়াছেন। সহস্র বিঘ্ন বিপদের মধ্যেও শির উন্নত করিয়া রাখিয়াছেন। হয়ত আমাদের তপস্যায় সিদ্ধিলাভ হইবে না, ইষ্টলাভ এ জীবনে দেখিব না; কিন্তু তাহাতেই বা কি? লক্ষ লক্ষ সন্তানের জীবনব্যাপী সাধনার ফলেই জাতি শক্তিশালী হইবে। আমরা মরিলেও জাতীয় জীবন অমর হইবে।

কাপুরুষেরাই সর্বদা আশাহীন। এরূপ কি বিভীষিকা আছে যাহা দ্বারা আমাদিগকে লক্ষ্যপথ হইতে ভ্রষ্ট করিবে! যে জাতির পূর্বপুরুষেরা মৃত্যুকে জয় করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছে, মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের দেবতা, তাহারা কোন ভয়েই মনুষ্যত্বের সাধনার পথ হইতে ভ্রষ্ট হইবে না। আনন্দবাজার পত্রিকার মধ্য দিয়া আজ এই কথাই আমি নবীন বাংলাকে বলিতে চাই। আমি অনেক দিনের চেষ্টার দ্বারা জীবনের রহস্য মূলে যাহা দেখিতে পাই তাহার মূল কথা এই জীবের শক্তি কেবল বাহিরের আঘাতের দ্বারাই উদ্বেলিত ও উত্তেজিত হয়। ইহাই জীবনের শক্তির মূল উৎস, ইহার অভাবে জীবন নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে এবং মৃত্যু আসিয়া তাহাকে পরাজিত করে। সুতরাং জীবনের মহৎ বিকাশের জন্য সুখ ও সম্পদ আমাদের সহায় নহে কেবল আঘাত ও দুঃখ দ্বারাই মানুষ শক্তি সঞ্চয় করিয়া সমস্ত জগতের উপর তাহার প্রভাব বিস্তার করে।

সংবাদপত্রের কর্তব্য আত্মশক্তি উদ্বোধন

তোমাদের কাগজ এবার পঞ্চমবর্ষে পদার্পণ করিবে শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। সংবাদপত্রের দায়িত্ব বড় গুরুতর তাহা সর্বদা স্মরণ রাখিবে। আমাদের দেশে চারিদিকে একটা জড়ত্ব ও অবসাদ দেখা যাইতেছে, জীবন সংগ্রামে সর্বত্র আমরা পিছাইয়া পড়িতেছে। এ অবস্থায় জনমতের মুখপত্ররূপে সংবাদপত্রের কর্তব্য জাতির আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা,—তাহাদের সর্বপ্রকার দুর্বলতাকে অনাবৃত করিয়া নির্মম-ভাবে সত্যের আলোকে তুলিয়া ধরা। কারণ অসত্যের পথ মৃত্যুর পথ।

আমাদের পূর্ব পুরুষেরা এক মহান গৌরবান্বিত জাতি ছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা তাঁহাদের সে গৌরব রক্ষা করিতে পারি নাই। করিবার চেষ্টাও করিতেছি না, কেবল অতীতের কথা কীর্ত্তন করিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছি এবং দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিতেছি।

এরূপভাবে জাতীয় উন্নতি হইবে না। আমাদের মানুষ হইতে হইবে—দৃঢ় ও শক্তি সম্পন্ন হইতে হইবে। ভয়ের অতীত হইতে হইবে। সহস্র প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে—পাহাড় পর্বত লঙ্ঘন করিয়া সিদ্ধি লাভ করিতে হইবে। তবেই এই দৈন্য এই দুর্দশা ঘুচিবে, জীবনের শক্তি মৃত্যুঞ্জয়ী হইবে।

বিজ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য মানুষের দুর্বহভার লাঘব করা। দৈন্য এবং অভাব আসিয়া জীবনকে মৃত্যুপথে লইয়া যাইতেছে। দেশের আর্থিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে কৃষি এবং শিল্প উভয়েরই উন্নতি সাধন করা আবশ্যক। ইহা করিতে হইলে বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করিতেই হইবে। অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের ফলে ভারতবাসী যে বিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতি সাধন করিতে পারে একথা আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি। যেমন আর্থিক দুরবস্থা ইয়োরোপে অশান্তি আনয়ণ করিয়াছে, ভারতের আর্থিক সমস্যাও ভারতের সমস্ত অশান্তির মূল। দেশের মৃত্তিকা নিহিত স্বাভাবিক ঐশ্বর্য উদ্ধার করিবার একমাত্র উপায় দেশের বহু সংখ্যক যুবককে উন্নত প্রণালীর বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তাহাদিগকে দেশের কাজে ব্যাপৃত করা। উদ্যোগী-শক্তিশালী ব্যক্তির পক্ষে বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র রহিয়াছে। দেশের লোক যখন বৃথা আত্ম-কলহে ব্যাপৃত, সেই সুযোগে বাহির হইতে উদ্যমশালী বহু জাতি আসিয়া ভারতের ধনরত্ন অধিকার করিতেছে।

আমরা কি বিস্মৃত হইয়াছি যে, অকুল জলধি এবং হিমাচল সমগ্র পৃথিবীর প্রতিযোগিতা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না? মাতা ধরিত্রী যেমন পাপভার বহিতে অক্ষম, প্রকৃতি জননীও সেইরূপ অসমর্থ জীবের ভার বহন করিতে বিমুখ। দেহের মৃত্যুই আমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ নহে। ধ্বংসশীল শরীর মৃত্তিকায় মিশিয়া গেলেও জাতীয় আশা ও আকাঙ্খা ধ্বংস হয় না। মানসিক শক্তির ধ্বংসই প্রকৃত মৃত্যু; তাহা একেবারে আশাহীন এবং চিরন্তন।

অবিরাম চেষ্টা ও বিরুদ্ধ শক্তির সহিত যুদ্ধ করিয়া এবং মনের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াই দেশের ও জগতের কল্যাণ সাধন করিতে পারিব—নিচেষ্ট হইয়া নহে। যে দুর্বল, জীবন সংগ্রাম হইতে পিছাইয়া পড়ে সে কাপুরুষ। সে দান করিবার অধিকারী নহে, কারণ, তাহার দিবার কিছুই নাই, যে বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়াছে এবং জয়যুক্ত হইয়াছে, কেবল সেই-ই তাহার জয়লব্ধ বিত্ত দান করিতে পারে এবং সেই দান দ্বারা জগৎকে সমৃদ্ধিশালী করিতে পারে। এই সত্যই যেন আমাদের চির সাধনা হয়।

শ্রদ্ধা-অর্ঘ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সপ্ততিতম জন্মবার্ষিকি উপলক্ষ্যে দেশবাসীর পক্ষ থেকে জগদীশচন্দ্র বসু।

কবিগুরু,

তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।

তোমার সপ্ততিতম বর্ষশেষে একান্তমনে প্রার্থনা করি জীবন বিধাতা তোমাকে শতায়ুঃ দান করুন ; আজিকার এই জয়ন্তী উৎসবের স্মৃতি জাতির জীবনে অক্ষয় হৌক।

বাণীর দেউল আজি গগন স্পর্শ করিয়াছে। বঙ্গের কত কবি, কত শিল্পী, কত না সেবক ইহার নির্মাণকল্পে দ্রব্যসম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছেন ; তাঁহাদের স্বপ্ন ও সাধনার ধন, তাঁহাদের তপস্যা তোমার মধ্যে আজি সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তোমার পূর্ববর্তী সকল সাহিত্যাচার্যগণকে তোমার অভিনন্দনের মাঝে অভিনন্দিত করি।

আত্মার নিগূঢ় রস ও শোভা, কল্যাণ ও ঐশ্বর্য তোমার সাহিত্যে পূর্ণ বিকশিত হইয়া বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়াছে। তোমার সৃষ্টির সেই বিচিত্র ও অপরূপ আলোকে স্বকীয় চিত্তের গভীর ও সত্য পরিচয়ে কৃতকৃতার্থ হইয়াছি।

হাতপাতিয়া জগতের কাছে আমরা নিয়াছি অনেক, কিন্তু তোমার হাত দিয়া দিয়াছিও অনেক।

হে সার্বভৌম কবি, এই শুভদিনে তোমাকে শান্তমনে নমস্কার করি। তোমার মধ্যে সুন্দরের পরম প্রকাশকে আজি বারম্বার নতশিরে নমস্কার করি।

ইতি

রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব পরিষদ পক্ষে
শ্রীজগদীশ চন্দ্র বসু
সভাপতি

কলিকাতা
রবিবার, কৃষ্ণা তৃতীয়া
১১ই পৌষ, ১৩৩৮ সাল
(বঙ্গাব্দ)

---

* "বসুধারা" পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড দিতীয় সংখ্যা অগ্রহায়ন ১৩৬৫ সালে পুনঃমুদ্রিত।

লুপ্ত নগরী

ইটালীর দক্ষিণ প্রদেশ অতি রমণীয়,—সমস্ত প্রদেশটি যেন একটি উদ্যান। এইরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সচরাচর দেখা যায় না।

রোমানরা এই প্রদেশে সমুদ্রের উপকূলে সমৃদ্ধিশালী নগর নির্মাণ করিয়া অবকাশের সময় সে স্থানে আমোদ প্রমোদ করিতে আগমন করিত। এই সব নগরের মধ্যে হেরাক্লিয়াম এবং পম্পেই বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল।

ভিসুভিয়স্ পর্বত ইহাদের অতি সন্নিহিত ; এই পর্বত হইতে কোনও বিপদ ঘটিতে পারে, লোকে এরূপ আশঙ্কা করে নাই। তাহারা নির্ভয়ে তাহার চারিপার্শ্বে সুন্দর ফুলফল পূর্ণ বাগান ও সুশোভন বাসস্থান নির্মাণ করিয়া বাস করিতেছিল। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন ভিসুভিয়স্ অগ্নিবৃষ্টি করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে এই দুইটি নগরী পৃথিবী হইতে মুছিয়া লইল !

৭৯ খৃঃ অব্দে ২৩শে আগষ্ট তারিখে প্রথম ভূমিকম্প হইতে আরম্ভ হয়, ভূমিকম্প সাধারণ ঘটনা বলিয়া অধিবাসীরা কিছু মনে করে নাই। পূর্ববৎ সব কার্যই চলিতে লাগিল।

রাত্রে নাট্যশালাতে গীতবাদ্য হইতেছে,—অতি প্রকান্ড আম্পিথিয়েটারে সিংহ ও মানুষে লড়াই হইবে। দর্শকে আমোদভবন পূর্ণ-সকলেই আমোদে মত্ত! এমন সময়ে অকস্মাৎ ভিসুভিয়সের শিখর হইতে অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল। মুহূর্তে আকাশ অগ্নিময় হইয়া গেল! বজ্রধ্বণিতে পৃথিবী পুনঃ পুনঃ কম্পিত হইতে লাগিল! ভিসুভিয়াসের গহ্বর হইতে অগণ্য জলন্ত প্রস্থর চতুর্দিকে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, তারপর উত্তপ্ত কর্দমবৃষ্টি, তারপর ভস্মবৃষ্টি।

নগরবাসীরা হঠাৎ বজ্রধ্বনি ও অগ্নিপাতে ভীত হইয়া যে যেখানে পারিল পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কোথায় পুত্র, কোথায় কন্যা, কোথায় স্ত্রী সকলে ভীতস্বরে ডাকাডাকি করিতে লাগিল। বাহিরে অন্ধকার, তাড়াতাড়ি প্রদীপ জ্বালিয়া রাস্তায় বাহির হইল, কিন্তু হায়! যে আলোকের সাহায্যে তাহারা পলায়ন করিবে ভাবিয়াছিল, সে আলোক ভস্মপাতে নিবিয়া গেল। তখন লোক স্রোতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহারা পথ ভুলিয়া অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কেবল যখন ভিসুভিয়সের অগ্নিশিখায় মুহূর্তের জন্য দিক আলোকিত হইতেছিল, তখন সকলে পরস্পরকে দেখিতে পাইতেছিল। তখন তাহারা বুঝিতে পারিতেছিল, যাহাদের লইয়া একত্রে বাহির হইয়াছিল, তাহারা কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। কাতর আহ্বানে কেহ আর প্রিয়জনের উত্তর পাইল না।

ক্রমে লোকেরা ক্লান্ত ও হতাশ্বাস হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িল—তখনও ভস্ম পতনের

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে শান্তি নিকেতনের আম্রকুঞ্জে বাংলার সাহিত্য সেবীদের তরফ থেকে রবীন্দ্রনাথকে যে অভিনন্দন জানানো হয় তার সভাপতিও ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। সেই অনুষ্ঠানে জগদীশচন্দ্র নিজের সাধনার প্রতীক চিহ্ন হিসেবে ছোট গাছ সমেত একটি মাটির টব উপহার দেন রবীন্দ্রনাথকে। গাছটি ছিল একটি সতেজ লজ্জাবতী লতা। এ প্রসঙ্গে আরও স্মরণীয়, ১৯২৮ সালের ১লা ডিসেম্বর বসু বিজ্ঞান মন্দিরে আচার্য জগদীশচন্দ্রের সপ্ততিতম জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। শারীরিক কারণে উৎসবে রবীন্দ্রনাথ যোগ দিতে পারেন নি। উৎসবে বন্ধু জগদীশচন্দ্রের উদ্দেশ্যে লেখা "যেদিন ধরণী ছিল ব্যাথাহীন বাণীহীন মরু..." কবিতাটি ('গণবানী' গ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতা। পরে রবীন্দ্ররচনাবলী পঞ্চদশ খণ্ডে স্থান পায়) সভায় পাঠ করেন ডঃ কালিদাস নাগ। জগদীশচন্দ্রের এই সপ্ততিতম জন্মজয়ন্তীতে দেশ বিদেশের বহু বিদগ্ধ ব্যক্তি যোগ দিন। শুভেচ্ছা পাঠান বহু পৃথিবীখ্যাত মনীষী। অভিনন্দন বার্তা আসে বিভিন্ন কালজয়ী প্রতিষ্ঠান থেকেও। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ছাত্রদের তরফ থেকেও জগদীশচন্দ্রকে তাম্রপত্র উপহার দেওয়া হয়। প্রাক্তন ছাত্রদের তরফ থেকে অভিনন্দন জানান রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। "কিন্তু এই সার্থক জয়ন্তী উৎসবের প্রস্তুতির ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সক্রিয় ভূমিকার সাক্ষী নিচের এই বিজ্ঞপ্তিটি।

It is proposed to hold the 70th birth day celebration of Sri Jagadish Chandra Bose on the 1st December between 4-6 P.M. at the Bose Institute. On the occasion the numerous pupils and admirers feel it a great privilege to convey to Sir Jagadish Chandra Bose their Sincerest appreciation of his life long services to the cause of advancement of learning in India. In the darkest hour of India's intellectual degradation, he has set a fire a flame which shows us the path to a greater future. His spirit of deep scientific inquiry, his profound love of universal humanity, his serene hopefulness have ever been a source of inspiration to all who have come near him. It is only in the fitness of things that his pupils and admirers should assemble on his 70th birthday and express their feelings in a suitable manner. All communication in this connection should be addressed to Mr. Ashok Chatterjee,
91, Upper Circular Road, Calcutta.

S/d Rabindranath Tagore

ভ্রমণ বিষয়ক রচনা

বিরাম নাই। স্তরে স্তরে ভগ্নস্তুপ উন্নত হইয়া পলাতকদিগের অপাদমস্তক প্রোথিত করিল।

পলাতকদের ত এই ভীষণ পরিণাম! কেবল কয়েকজন পলায়ন করিতে চেষ্টা করে নাই,—নগরের রোমান প্রহরীরা নগর রক্ষাতে নিযুক্ত ছিল, তাহাদের নির্দিষ্ট স্থান ত্যাগ করিবার আদেশ পায় নাই। সুতরাং স্বস্থানে সশস্ত্রে দণ্ডায়মান রহিল। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পর তাহাদের প্রস্তরমূর্তিবৎ নিশ্চল দেহ পাওয়া গিয়াছে।

শত শত বৎসর পূর্বে এই নগরের দুইটির চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছিল। ইহাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল। খনন করিতে করিতে দৈবাৎ প্রোথিত গৃহের চিহ্ন বাহির হইয়া পড়ে। তখন হইতে ইটালীয় গভর্ণমেণ্ট নিয়মিতরূপে খনন করিয়া ভস্ম ও কর্দমের স্তুপ পরিস্কার করিয়াছেন। দুই সহস্র বৎসর পূর্বের নগর এখন মনুষ্যগোচর হইয়াছে।

নেপল্‌স হইতে আমরা পম্পেই দেখিতে যাই, কি আশ্চর্য! দুই সহস্র বৎসর ইহার উপর দিয়া গিয়াছে, তবু মনে হয় না, ইহা এত পুরাতন।

এই যে রাস্তা দিয়া চলিতেছি এই রাস্তায় সহস্রাধিক বৎসর পূর্বের গাড়ী চাকার দাগ স্পষ্ট রহিয়াছে। বৃষ্টি হইলে রাস্তার জল জমিত, জুতা যাহাতে না ভিজিয়া যাইতে পারে, সেজন্য রাস্তার মাঝে মাঝে পাথর বসান ছিল, এখনও সেই পাথরগুলি যথাস্থানে রহিয়াছে, রাস্তার পাশ দিয়া জলের পাইপের নলগুলি এখনও দেখা যাইতেছে।

পূর্বে বলিয়াছি, ভস্মচাপে অনেক জীবন্তই সমাহিত হইয়াছিল। তাহাদের দেহ ভস্মে আবৃত হইয়া এতকাল অবিকৃত অবস্থায় রক্ষিত ছিল। একটি গৃহে অনেকগুলি মৃতদেহ দেখিলাম। তাহা দেখিয়া সেই দুর্দিনের ঘটনা যেন চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইলাম। এই যে পুরুষটি দেখিতেছ, সে একান্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল, হাত তুলিয়া ভস্মপাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা পাইয়াছিল। তাহার নিকটেই একটি কুকুর যেন যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে।

নগরের একস্থানে দেখিলাম, রন্ধন-গৃহ হইতে পাচক বাহির হইতে পারে নাই; সে সেস্থানেই রহিয়াছে—উননে রন্ধনের বস্তু রহিয়াছে, কেবল একটু পুড়িয়া গিয়াছে। রুটি খানি পর্যন্ত যেমন তেমনি রহিয়াছে। অন্যস্থানে একটি স্ত্রীলোক হস্তে অলঙ্কারের বাক্স লইয়া পালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ছাদ চাপা পড়িয়া রহিয়াছে। স্কুলের ছাত্র সঙ্গীদিগকে বিদ্রূপ করিয়া প্রাচীরে কি লিখিয়াছিল, সে লেখা এখনও স্পষ্ট রহিয়াছে। রাস্তায় "আমার জন্য ভোট দাও" এরূপ অণুনয় প্রার্থনা আছে। একটি বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম, সম্মুখে বাহির-বাড়ী, তারপর ভিতরে বৈঠকখানার, আহারের গৃহ, শয়ন গৃহ, পূজার গৃহ, রন্ধন গৃহ। বৈঠকখানার প্রাচীরে নানাপ্রকার চিত্র, আজ পর্যন্ত সে চিত্রের বর্ণ ম্লান হয় নাই। ভাণ্ডার গৃহে জালায় শস্য রক্ষিত হইত সে জালাগুলি তেমনিই আছে!

ঘরের প্রদীপ আমাদের দেশের মাটির প্রদীপের ন্যায়, প্রদীপদানগুলিও সেইরূপ। বাড়ীর পশ্চাতে বাগান।

সে কালের থিয়েটার দেখিতে গেলাম; বসিবার বেঞ্চগুলি পাথরের। স্ত্রীলোকের বসিবার জন্য স্থান স্বতন্ত্র ও প্রবেশদ্বার স্বতন্ত্র। থিয়েটারের অনতিদূরেই সৈন্যাগার। চারিজন সৈন্য কি অপরাধে কারাগারে বন্দী ছিল। দেওয়াল সংলগ্ন লৌহশৃঙ্খলে তাহাদের পদ আবদ্ধ ছিল; সেই হতভাগ্যদের কঙ্কাল সেইরূপে শৃঙ্খলিত অবস্থাতেই পাওয়া গিয়াছে।

তারপর রোমনদের স্নানাগারগুলি দেখিতে গেলাম। তাহাদের স্নান করিবার বিশেষ আড়ম্বর ছিল, কখনও কখনও তাহারা দিনের মধ্যে সাতবার পর্যন্ত স্নান করিত। অনেকে সমস্ত দিন এখানে কাটাইত। স্নানাগারের সর্বপ্রথমে একটি বৈঠকখানা গৃহ, এই গৃহে শহরের যে স্থানে যে আমোদ প্রমোদ হইত ; তাহার বিজ্ঞাপন থাকিত। স্নানাগারে স্নানের বিভিন্ন প্রকার সরঞ্জাম। এক ঘরে মার্বেলের কৃত্রিম জলাশয়ে শীতল জল পূর্ণ থাকিত; অন্য ঘরে উষ্ণবাষ্প-স্নানের বান্দোবস্ত। স্নানাগারের নিকটেই ব্যায়াম-গৃহ। এই সকল দেখিয়া আমরা সেকালের এক ডাক্তারের গৃহ দেখিতে গেলাম। এই গৃহে অস্ত্রচিকিৎসার বিবিধ অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে ; সে সব অস্ত্র এখানকার অস্ত্র হইতে কোন অংশে হীন নহে।

তারপর যেখানে বাজার বসিত সে স্থান দেখিতে গেলাম। এখানে দোকানির দাঁড়িপাল্লা, নানা রকমের অলঙ্কার। বেশভূষার দ্রব্যাদি, পাশা খেলার সরঞ্জাম, এমন কি থিয়েটারের টিকিট পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। নগরের অনেক অংশ এখনও মাটির নীচে, প্রত্যহ খনন করিতে করিতে নূতন নূতন গৃহ বাহির হইতেছে। যেস্থানে খনন হইতেছে আমরা সেস্থানে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিলাম। মজুরেরা ভস্মস্তূপ অতি সাবধানে খনন করিয়া দূরে ফেলিতেছে, ছাদ হইতে আরম্ভ করিয়া নীচের দিকে অগ্রসর হইতেছে, প্রথমে প্রাচীরের একটু চিহ্ন দেখা যায়, তারপর ক্রমে ক্রমে সমস্ত গৃহ বাহির হইতে থাকে। একে একে গৃহস্থালীর দ্রব্য, বাসনপত্র, অলঙ্কার, এমনকি গৃহস্বামীকে পর্যন্ত পাওয়া যাইতেছে। একস্থানে গৃহস্বামী কুড়ালী দ্বারা দরজা ভাঙ্গিয়া পালাইবার চেষ্টা করিতেছিল—তাহার কঙ্কালের সম্মুখে কুড়ালী পাওয়া গিয়াছে।

আমরা সমস্তদিন পর্যটন করিয়া এই লুপ্ত নগরী দেখিলাম। সন্ধ্যা হইলে ক্ষণিক কাল একটি উচ্চস্থানে বসিয়া নগরটি শেষবার দেখিয়া লইলাম। অদূরে ভিসুভিয়সের শিখর হইতে ধূম উত্থিত হইতেছিল। আমাদের সম্মুখের সমস্ত নগরীটি প্রসারিত। এই স্থান হইতে সমস্ত পথগুলি দেখা যাইতেছিল। রাস্তার দুধারে গৃহশ্রেণী, অট্টালিকা ও মন্দির দেখিতে পাইতেছিলাম। কিন্তু রাজপথে লোক সমাগম নাই। ছেলেবেলা গল্পে এক রাজার দেশের কথা শুনিয়াছিলাম। সে রাজ্যে অশ্বশালায় অশ্ব, হাতীশালায় হাতী, রাজগৃহে রাজপুত্র ও রাজকন্যা রহিয়াছে, কিন্তু সকলেই মৃত। তখন সেই গল্পের কথা মনে হইল। মনে হইতে লাগিল, যাহা দেখিতেছি, সবই যেন কল্পনা। এরূপ নিশ্চল, এরূপ জীবনহীন, এরূপ মনুষ্যহীন দেশ কেবল গল্পেই শুনা যায়। কিন্তু হঠাৎ এই পম্পেইর একটি দৃশ্যের কথা মনে হইল। একটি গৃহ ক্রমে ক্রমে ভস্মে ঢাকিয়া যাইতেছিল সেই গৃহে একটি নারী দুহাতে তাহার শিশুটিকে উচ্চে ধরিয়া

রহিয়াছিল। ভস্মস্তূপ ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া দুঃখিনী মাতাকে নিমর্জ্জিত করিতেছিল। কিন্তু সেই অগ্নির প্রসার হইতে শিশুকে রক্ষা করিতে হইবে। জ্বলন্ত ভস্মস্তূপ তিল-তিল করিয়া দগ্ধ করিয়াও জননীকে একেবারে অবসন্ন করিতে পারে নাই; কি যেন এক মহাশক্তি, দুঃসহ যন্ত্রণা দমন করিয়া রাখিয়াছিল! মাতার হস্তদুইটি মৃত্যু-যন্ত্রণাতেও অবশ হইয়া পড়ে নাই। দুই সহস্র বৎসর পরে সেই ঊর্দ্ধোত্থিত করপুটে সন্তানটিকে পাওয়া গিয়াছে। সেই মাতার স্নেহস্পর্শে যেন অতীত বর্তমানের সহিত মিলিয়া গেল। একই দুঃখে, একই স্নেহে, একই মমতায় সেকাল ও একাল, পূর্ব ও পশ্চিম যেন বান্ধা পড়িল। তখন পম্পেইর মৃত রাজ্য সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল, এবং রাজপথ আমার চক্ষে অকস্মাৎ লোকজনে পূর্ণ হইল!

আগ্নেয়গিরি দর্শন

আমরা রোম নগর দর্শন করিয়া ইটালীর পশ্চিম উপকূলে স্থিত নেপল্‌স্ সহরে উপস্থিত হইলাম। নেপল্‌স্ সমুদ্রতীরে স্থিত। এরূপ সুন্দর সহর ইউরোপে আর নাই। আমরা যেস্থানে ছিলাম তাহার সম্মুখেই সমুদ্র। ঘোর নীল জলরাশির উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা পাল ভরে যাইতেছে। অনতিদূরে কেপ্রি দ্বীপ।

দুই সহস্র বৎসর পূর্বে রোমের ধনী লোকেরা ইহার নিকটবর্তী স্থানে সুন্দর সুন্দর উদ্যান ও প্রমোদ ভবন প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এখনও তাহা নেপল্‌সের সৌন্দর্যবৃদ্ধি করিতেছে।

নেপল্‌স্ সহর এখনও নানাবিধ আমোদ প্রমোদ এবং জনকোলাহলে পরিপূর্ণ। কিন্তু অদূরেই ভিস্মুভিয়স আগ্নেয়গিরি এই সুখের মধ্যে মৃত্যুর বিভীষিকা দেখাইতেছে!

আমরা একদিন প্রত্যুষে ভিস্মুভিয়স দেখিতে রওনা হইলাম। ভিসুভিয়স নেপল্‌স্ হইতে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত; চারি হাজার ফিট উচ্চ।

আমরা ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া আগ্নেয়গিরির পাদদেশে উপস্থিত হইলাম; এ-স্থানের দৃশ্য অতি ভয়ানক। আগ্নেয়গিরি হইতে গলিত প্রস্তরের ঢেউ আসিয়া চারিদিক ঢাকিয়াছে। এখন সেই ঢেউগুলি জমিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু স্থানে স্থানে পাথরগুলি হইতে এখনও ধূম উঠিতেছে। পূর্বে এস্থান হইতে উপরে উঠিতে অশ্ব-পৃষ্ঠে বা পদব্রজে যাইতে হইত, বন্ধুর পথ ও আগ্নেয়গিরির ভস্মের উপর দিয়া যাইতে অত্যন্ত কষ্ট হইত এবং প্রায় একটি দিন লাগিত। এখন একপ্রকার নূতন ফিউনি-কিউলার বা তারের রেল হওয়াতে আধ ঘণ্টার মধ্যে উপরে উঠা যায়।

এক এক গাড়ীতে বারজন লোক বসিতে পারে; এইরূপ একখানা গাড়ী উপরে যায় আর একখানা নীচে আসে। পাহাড়ের গা দিয়া সোজাসুজি উপরে উঠিতে ভয় হয়, তার ছিঁড়িয়া গেলে কি ভয়ানক অবস্থা হয় বুঝিতে পার। এই গাড়ী

যেখানে থামে; সেখান হইতে অগ্নিকুণ্ড পর্যন্ত হাঁটিয়া যাইতে হয়; সে প্রায় ৫।৭ মিনিটের পথ।

একে ত ভস্মের উপর পা দিয়া স্থির রাখা দুষ্কর, তাহাতে আবার আমরা যেদিন গিয়াছিলাম, সেদিন প্রবল বেগে ঝড় বহিতেছিল, আমাদের দাঁড়াইয়া থাকাই দুঃসাধ্য মনে হইতেছিল। বাতাস এরূপ ঠাণ্ডা; যে হাত, পা ও মুখ একেবারে অবশ হইয়া যাইতে লাগিল।

বহুদিনের আকাঙ্খিত এই স্থান দর্শন করিতে আসিয়া; সুখের পরিবর্তে আমার কষ্টই বোধ হইতে লাগিল ; একদিকে আমার সঙ্গী—অন্যদিকে আমাদের পথ প্রদর্শক সজোরে আমার হাত ধরিয়া উপরে না লইয়া গেলে, আমার অগ্নিকুণ্ড দেখাই হইত না। অনেক দেশ দেখিয়াছি, অনেক পাহাড়ে উঠিয়াছি এবং অনেক ভ্রমণ-ক্লেশ সহ্য করিয়াছি, কিন্তু এই ক্ষুদ্র পাহাড় দেখিবার ক্লেশ চিরদিন স্মরণে থাকিবে। ইতালীয় গভর্ণমেণ্টের আদেশে এখানে কয়েকজন পথপ্রদর্শক নিযুক্ত আছে, তাহাদের সঙ্গে অগ্নিকুণ্ড দেখিতে যাইবার আদেশ। পথপ্রদর্শকদিগকে সঙ্গে না লইয়া কেহ উঠিতে পারে না। তাহার কারণ এই যে; কয়েক বৎসর পূর্বে দুইজন আমেরিকান ভ্রমনণকারী কাহাকেও সঙ্গে না লইয়া গহ্বরে দেখিতে গিয়া অগ্নিকুণ্ঠে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন। আমরা অতি কষ্ঠে, উঠিয়া দেখিলাম; উপরে গহ্বর হইতে গন্ধকের ধূম উঠিতেছে, এক স্থান দিয়া গলিত গন্ধক স্রোত বহিয়া যাইতেছে। আমরা যখন দেখতে যাই, তখন আগ্নেয়গিরি নিস্তেজ ছিল, তথাপি গন্ধকের ধূমে চারিদিক আচ্ছন্ন ছিল।

আঠারশত বৎসর পূর্বে এই নিদ্রিত গিরি একবার অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিয়াছিল। সেই ভয়ানক অগ্নিবৃষ্টিতে সাতটি নগর পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

লণ্ডনের গল্প

এখন লণ্ডনের কথা না জানে এমন লোক অতি অল্পই আছে। পূর্বে যেখানে যাইতে একমাস লাগিত, এখন সেস্থানে ১৮ দিনে যাওয়া যায়। এখন আর বিলাতকে বেশী দূর বলিয়া মনে হয় না,—জাহাজ এবং রেল হওয়াতে অত দূরবর্তী স্থানও আমাদের সন্নিকট হইয়াছে।

জাহাজে চড়িয়াই ইংরাজের শৃংখলা ও কার্যকুশলতার শত পরিচয় পাইয়াছিলাম। একটি ছোট খাট রাজপুরীর ন্যায় সুসজ্জিত জাহাজ শত শত প্রাণী বক্ষে করিয়া, দিন রাত্রি অবিশ্রান্ত চলিয়া অতল সমুদ্র লঙ্ঘন করিতেছে, দেখিলে শতমুখে মানুষের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে হয়। সাত শত লোক জাহাজে বাস করিতেছে, অথচ ঠিক সময়ে স্নান আহারাদি সমুদয় চলিতেছে। জাহাজের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক কুঠুরী, এক একটিতে তিন চারি জনের শয়ন করিবার বন্দোবস্ত আছে। তিন চারি শত লোকের

একসঙ্গে আহার করিবার গৃহ, বৈঠকখানা (Drawnig room) প্রভৃতি সুন্দর মখমলে সাজান। টবের মধ্যে ফুলগাছ এই সব গৃহের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। সাত শতলোকের আহার্য ও আবশ্যকীয় সমুদয় দ্রব্যই জাহাজে থাকে। চারি পাঁচদিন অন্তর কোন বন্দরে জাহাজ আসিলে, কেবল এঞ্জিনের কয়লা ও আহারের জন্য খাদ্য সামগ্রী লওয়া হয়।

ইংরাজেরা জাহাজে নানা প্রকার খেলা ও আমোদে সময় কাটান। সেখানেও ক্রিকেট খেলা, তীর ছোঁড়া, কইটস্ প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত আছে। কখনও কখনও মাশুলের উপর বোতল রাখিয়া, বন্দুক ছুঁড়িয়া তাহা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করা হয়। এই সকল খেলাতে আবার জাহাজের কর্মচারীদের সহিত জাহাজের আরোহীগণের প্রতিদ্বন্দিতা হয়। রাত্রে নানা প্রকার ঐকতানিক বাদ্য, সঙ্গীত, আবৃত্তি, নাচ প্রভৃতি হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া জাহাজের গতি লইয়াও আন্দোলনের বিরাম নাই। প্রতিদিন জাহাজ কতটা অগ্রসর হয়, তাহা জানিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত। গন্তব্যস্থানে পেঁছিবার পূর্বে যাঁহারা যাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে চাঁদা করিয়া প্রাইজ দেওয়া হয়।

ইংরাজজাতির কাজের সময় যেমন একাগ্রতা, খেলার মধ্যে সেইরূপ একাগ্রতা ও উৎসাহ। তাঁহারা যেখানেই যান, যাহাই করুণ, শারীরিক ব্যায়াম ও আমোদ প্রমোদ কখনই পরিত্যাগ করেন না।

জাহাজ হইতে নামিয়া ষ্টেশনে উঠিয়া দেখিলাম, অন্য এক পৃথিবীতে আসিয়াছি। আমাদের দেশের ষ্টেশনের মত এখানে গোলমাল চীৎকার কিছুই নাই। এখানেও নিঃশব্দে কলের মত কাজ চলিতেছে। আমরা জিনিষ পত্র নামাইলাম, একজন মুটে আসিয়া সেগুলি একটা টানা গাড়ীতে চাপাইয়া বাহিরে লইয়া গেল এবং যে গাড়ীখানি সম্মুখে ছিল তাহাতে চাপাইয়া দিয়া নিজের পয়সা লইয়া চলিয়া গেল। আমরা আমাদের গন্তব্য স্থান নির্দেশ করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। ভাড়াটে গাড়ীগুলি সারি সারি রহিয়াছে, যেখানা আগে, তাহারই আগে ভাড়া হইতেছে, এ স্থানেও কোন গোলমাল নাই।

লণ্ডন শহরে সমুদয় কার্যেই এরূপ নিয়ম ও শৃঙ্খলা দেখিলাম, রাস্তায় অসংখ্য গাড়ীঘোড়া, লোকজন, বাইসিকল, ছোট ছেলেদের পিরাম্বুলোর, এবং বৈদ্যুতিক গাড়ী যাতায়াত করিতেছে। প্রথমে এত জনতা দেখিয়া গাড়ীতে উঠিতে আমার ভয় হইত। সর্বদাই মনে হইত কখন কোন দুর্ঘটনা হয়। কিন্তু সকলেই নিয়ম রক্ষা করিয়া চলেন বলিয়া, দুর্ঘটনা খুব অল্পই ঘটে। গাড়ী চালাইবার যে নিয়ম আছে, সে নিয়ম ভঙ্গ করিবার কাহারও সাধ্য নাই, রাস্তার জনতা তোমরা কল্পনা করিতে পার না। এত গাড়ীঘোড়া যাতায়াত করে, যে সময় সময় চৌরাস্তার মোড় ভিন্ন অন্য স্থান দিয়া রাস্তার অপর পারে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। আমি কতবার এইরূপ রাস্তা পার হইতে গিয়া বিপদে পড়িয়াছি।

চৌরাস্তার মোড়ে পার হইবার বেশ সুবিধা। সে স্থানে সর্বদাই একজন পুলিশ

থাকে। পাঁচ ছয় জন লোক একত্র হইবামাত্র সে তাহার এক হাত তুলিয়া অঙ্গুলি উর্দ্ধে নির্দেশ করিয়া থাকে। অমনি যত গাড়ীঘোড়া মুহূর্তের মধ্যে থামিয়া যায়। উভয় পার্শ্বেই লোক সরিয়া গেলে, পুলিশের লোক হাত নামাইবামাত্র গাড়ীঘোড়া পূর্ববৎ চলিতে থাকে। আমি পুলিশের লোকের এই অংগুলি নির্দেশের শক্তি দেখিয়া বিশেষ বিস্মিত হইয়াছিলাম। কথা নাই; বার্তা নাই, অংগুলি সঙ্কেত দেখিবামাত্র শত শত গাড়ী থামিয়া যাইতেছে; স্বয়ং মহারাণীর গাড়ী পর্যন্ত এই সংকেতের আজ্ঞা পালন করতে বাধ্য। সাধারণের যাতায়াতের অসুবিধার জন্য কত অগ্নিবাস ও ট্রামগাড়ি আছে; তথাপি লণ্ডনের রাস্তায় লোকজনের ভীড় কমে না। মাটির নীচে সুড়ংগ প্রস্তুত করিয়া রেলের রাস্তা করা হইয়াছে। প্রতি পাঁচ মিনিটে রেলের গাড়ী চলে, তাহাতেও অসংখ্য লোক যাতায়াত করিতেছে, ইহা হইতেই লণ্ডনের জনতার কতক পরিচয় পাইবে।

লণ্ডন শহরের জাঁকজমক দেখিয়া আশ্চর্য বোধ হয়। মনে হয় ইংরেজ জাতি সমস্ত পৃথিবী হইতে ধন আহরণ করিয়া এই রাজনগরে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন।

ইংরাজকে বেণে বণিকের জাত অথবা দোকানীর জাত বলে, একথা সত্য ; কারণ এমন সুসজ্জিত দোকান শ্রেণী আর কোথাও দেখা যায় না। সব দোকানেই আয়নার দরজা, সুতরাং তাহার ভিতর দিয়া সমুদয় দেখা যায়। এই সকল দোকান দেখিয়া জিনিষ কিনিতে যাহার লোভ না হয় সে মানুষ নহে। প্রতি রাস্তায় কত গহনার দোকান, কত পরিচ্ছদের দোকান, কত মনোহারী জিনিষের দোকান, ঔষধের দোকান, ফুলের দোকান; তাহার সংখ্যা নাই। তাহা ছাড়া চা খাইবার জন্য এবং আহারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হোটেলও আছে।

ফলফুলের দোকানের শোভা ও পরিচ্ছন্নতা বর্ণনা করিতে পারি না। মাছের দোকানগুলিতেও একটুকু গন্ধ নাই,—নানা প্রকার মাছ সুন্দর মার্বেল পাথরের উপর বরফে রক্ষিত।

ইংরাজ জাতি যে সৌন্দর্যের সেবক তাহা সকল কার্যেই দেখিতে পাইলাম। গৃহপালিত পশুপক্ষী প্রভৃতির প্রতি ইহাদের অত্যন্ত যত্ন। কঙ্কালসার জন্তু সেদেশে আমি কখনও দেখি নাই; ঘোড়া, গরু, গাধা, ভেড়া প্রভৃতি সব জন্তু দেখিতে সুশ্রী ও হৃষ্টপুষ্ট। পশুপক্ষী প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তুরা সেখানে সন্তানবৎপ্রতিপালিত হয়। আমাদের ইডেন গার্ডেনের ন্যায় লণ্ডনের অনেকগুলি উদ্যান আছে। তাহাতে কত সুন্দর সুন্দর পশুপক্ষী প্রতিপালিত হয়। অপরাহ্নে বালক বালিকারা সেই সকল উদ্যানে বেড়াইতে গিয়া, ইহাদিগকে নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য খাইতে দেয়। উদ্যানস্থ সরোবরে ক্ষুদ্র জাহাজ ভাসাইয়া বালক বালিকারা নানা প্রকার খেলা করিয়া থাকে।

দুই প্রহরের সময় এই সকল বাগানে এক অপরূপ দৃশ্য হয়। তখন বালক বালিকাদের সহিত অতি বৃদ্ধও বৃদ্ধাদের সম্মিলন হইয়া থাকে। একদিকে যেমন ঠেলা গাড়ীতে ক্ষুদ্র শিশুরা বেড়াইতে আসে, অপর দিকে তেমনই অতি বৃদ্ধ বৃদ্ধারাও ঠেলা-গাড়ীতে এই সময় বায়ু সেবন করিতে বাহির হয়।

লণ্ডনে দেখিবার ও শিখিবার অনেক জিনিষ আছে ;—কত প্রকার মিউজিয়ম;

কত প্রকার পাঠাগার বা লাইব্রেরী, কত প্রকার চিত্রলীলা; গানবাদ্যের জন্য কত প্রকার হল, বড় বড় লোকের কত স্মৃতিচিহ্ন, জাতীয় জীবন উপযোগী কতপ্রকার পুরাতন স্মৃতিপূর্ণ গৃহ। এক একটি স্থান দেখিতে একদিন করিয়া যায়। এই সকল স্থানের বর্ণনা করা সম্ভব নহে; তবে "ব্রিটিশ মিউজিয়াম"; "ন্যাশনাল গ্যালারী", ও "ওয়েষ্টমিনিষ্টার এবি"; এই তিনটি স্থানের নাম না করিয়া লণ্ডনের কথা শেষ করা যায় না। ব্রিটিশ মিউজিয়ম নামক পুস্তকাগারে পৃথিবীর অতি পুরাতন ও বহুমূল্য পুস্তক সকল রক্ষিত হয়। তাহা ছাড়া নানা ভাষায় প্রধান পুস্তক এমনকি, বঙ্গভাষায় প্রধান পুস্তকও এখানে পাওয়া যায়।

ন্যাশানাল গ্যালারী বা জাতীয় চিত্রশালাতে বহুব্যয়ে ইংরাজ চিত্রকরদিগের চিত্রগুলি রক্ষিত হইয়াছে।

ওয়েষ্টমিনিষ্টার এবি—এখানে ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভ হইতে এ পর্যন্ত যত রাজা ও যত বীরগণ জন্মিয়াছিলেন; তাঁহাদের সমাধিস্তম্ভ ও স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত আছে। আমরা লণ্ডনের এক অংশের একখানি চিত্র প্রকাশ করিলাম।

ওয়েষ্টমিনিষ্টার এবি

তোমাদের মধ্যে যাহারা বয়সে বড়, তাহারা হয়ত কবি লংফেলোর জীবন-সঙ্গীত নিম্নের লাইন কয়টি পড়িয়াছ—

Lives of great man all remind us.
We can make our lives sublime ;
And departing, leave behind us
Footprints on the sands of time.

আমার ওয়েষ্টমিনিষ্টার এবি দেখিয়া স্মরণ হইল, আজ এক বৎসর হইল এস্থানটি দেখিয়াছি, কিন্তু সেই প্রশস্ত ও গাম্ভীর্যপূর্ণ দৃশ্য আজও আমার হৃদয়ে জাগিতেছে। এই প্রকাণ্ড সমাধিমন্দির দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম; যে দেশের মহত্ত্বের এরূপ সম্মান, সে দেশে মহৎ চরিত্র গঠিত হওয়া কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নহে।

এই সীমাবদ্ধ স্থানটির মধ্যে ইংলণ্ডের আট নয় শত বৎসরব্যাপী ইতিহাসের চিহ্ন দেখা যায়। একদিকে ইংলণ্ডের সমস্ত রাজাদের সমাধি বা স্মৃতিস্তম্ভ, মহাকবি, লেখক, বহুমনীষা সম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ, মন্ত্রীবাগ্মী; ধর্মবীর এককথায় গত আট নয় শতাব্দীর বিখ্যাত ইংলণ্ডবাসীদের দেহাবশেষ এই মহা সমাধি ক্ষেত্রে রক্ষিত হইয়াছে। ইংরেজ বালকদিগের অল্পবয়স হইতে এই সকল স্মৃতি চিহ্ন দেখিয়া, হৃদয়ে মহত্ত্বের অনুকরণ স্পৃহা হওয়া স্বাভাবিক। বিদেশবাসী হইয়াও এই স্থান দর্শন করিয়া আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। যদি ইংরেজ হইতাম, তবে এস্থান দর্শন করিয়া, জন্মভূমির জন্য

আমারও অনুরাগ বৃদ্ধি হইত তাহার সন্দেহ নাই; মহৎ ব্যক্তিদিগের জীবন সীমাবন্ধ নহে। তাঁহাদের কীর্তি অনন্তকাল জীবিত থাকিয়া স্বদেশবাসীর হৃদয়কে সঞ্জীবিত করে।

আমাদের দেশেও কি মহৎলোক জন্মগ্রহণ করেন নাই? করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মহত্ব আমরা প্রকৃতরূপে পূজা বা অনুকরণ করিতে শিখি নাই।

আমাদের দোষেই তাহারা মৃত। কিন্তু এই ওয়েষ্টমিনিষ্টার এবিতে শত শত অমরগণ এখনও বিচরণ করিতেছেন এবং তাঁহাদের প্রিয় দেশবাসীদের অন্তরে প্রবেশ করিয়া পুনর্জন্ম লাভ করিতেছেন।

ইংলণ্ডের ইতিহাসে ইহার শত শত প্রমাণ পাওয়া যায়। যে উইল্‌বারফোর্স বিদেশবাসীর জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহার লুপ্ত জীবন ব্রাইট্‌, ব্রাড্‌ল ও ব্রসেটের জীবনে পুনর্জীবিত দেখা যায়।

এখন আমরা যে ওয়েষ্টমিনিষ্টার দেখি পূর্বে ইহা একটি সামান্য মন্দির মাত্র ছিল। ইতিহাসে কথিত আছে, যে ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব রাজা এড্‌ওয়ার্ড দি কন্‌ফেসারের সময় পুরাতন মন্দিরের স্থানে বর্তমান মন্দিরটি নির্মিত হয়। এড্‌ওয়ার্ড যখন নর্মাণ্ডী দেশে নির্বাসিত ছিলেন, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে পুরাতন রাজ্য প্রাপ্ত হইলে, রোমে সেণ্টপিটারের মন্দিরে তীর্থ করিতে যাইবেন। এই প্রতিজ্ঞা পালনের সময় আসিলে, প্রধান পুরোহিত পোপ তাঁহাকে অব্যাহতি দিয়া তৎপরিবর্তে ইংলণ্ডে সেণ্টপিটারের নামে এক মন্দির নির্মাণ করিতে আদেশ করেন। প্রবাদ এই যে, এড্‌-ওয়ার্ড স্বপ্নে সেণ্টপিটারের নিকট হইতে এই স্থানে মন্দির নির্মাণের আদেশ পান। সে যাহা হউক ১০৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি পুরাতন মন্দিরটির নিকট নূতন একটি মন্দির নির্মাণ করিলেন। তারপর ইংলণ্ডে নানাবিধ অন্তর্বিপ্লব হওয়াতে কোন রাজাই ইহার উন্নতির প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করেন নাই। তৃতীয় হেন্‌রির সময় রাজ্যে কতকটা শান্তি স্থাপন হওয়াতে, তিনি এই মন্দিরের শোভা বৃদ্ধি করিতে যত্নশীল হন।

সেই সময় হইতে ভিন্ন ভিন্ন রাজাদিগের সময় ইহার শ্রীবৃদ্ধি পাইতে থাকে, সেইজন্য এই মন্দিরে আট শতাব্দীর ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীর স্হাপিত কার্যের সমাবেশ দেখা যায়। সেই সকল কারুকার্যের বর্ণনা অসম্ভব। স্হানে স্থানে এইরূপ কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে যে, সে সকল দর্শন করিয়া হৃদয় মহান ভাবে পূর্ণ হয়, এবং মনে হয় প্রতি-যুগের শিল্পীগণ হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ ভাবগুলিকে যেন মূর্তিমতী করিয়া এই স্থানকে পরমেশ্বরের অর্চ্চনার উপযোগী করিয়াছেন।

ইংলণ্ডে কত কত উপাসনা মন্দির আছে, কিন্তু তথাপি বহুদূর হইতে লোকে এই পুরাতন স্মৃতিপূর্ণ মন্দিরে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে আসিতেছেন। রাজ্ঞী এলিজা-বেথের সময় এই মন্দিরের সংসৃষ্টে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়; এখনও তাহা চলিতেছে। পূর্বে এই মন্দিরের রোমান ক্যাথলিক পুরোহিতেরা বাস করিতেন, এখন সেই সকল স্থান শূন্য হইয়া রহিয়াছে। কারণ এলিজাবেথের সময় হইতে প্রটেষ্টা-ণ্টদের উপর ইহার সম্পূর্ণ ভার অর্পিত হয়, এখন তাঁহারই এবি সংলগ্ন গৃহে বাস

করেন। কেবল যে, মহাপুরুষের সমাধি ক্ষেত্র বলিয়া এবি প্রসিদ্ধ তাহা নহে, পৃথিবীর কোন মন্দিরেই এরূপ পার্থিব ও অপার্থিব ভাবের সমাবেশ দেখা যায় না। বহুশতাব্দী পূর্বে এস্থান রাজনৈতিক ও ধর্মসম্প্রদায়ের তুমুল আন্দোলনের ক্ষেত্র ছিল আবার এই পার্থিব মন্দিরের আশ্রয়ে কত পলায়নপর রাজকুমার এবং যোদ্ধা লুক্কায়িত থাকিতেন। এই স্থানে মহাসমারোহে রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। কয়েকজন রাজার বিবাহও এই স্থানেই হইয়াছে, আবার এই স্থানেই তাঁহাদের অনন্ত নিদ্রা-ক্ষেত্র।

আমরা প্রধান দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া প্রথমেই বর্তমান উপাসনালয়ে উপস্থিত হইলাম; ইহার চতুর্দিকে স্মৃতিস্তম্ভ, মধ্যস্থলে পুরোহিতের জন্য উচ্চ বেদী; তারপর তিন চারিশত লোকের বসিবার উপযুক্ত আসন, পশ্চাতে সঙ্গীতের জন্য প্রকাণ্ড অর্গাণ যন্ত্র ও গায়কদের বসিবার স্থান। ইহার অদূরে ক্যানিং—ওয়ারেন হেষ্টিংস্ প্রভৃতি ইংরেজ-সাম্রাজ্য বিস্তারে সাহায্যকারী ইংরেজের স্মৃতিস্তম্ভ দেখিলাম। একটু অগ্রসর হইয়া আমরা কবিদিগের সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম। ইংরাজীতে এই স্থানকে Poets Corridor বলে। এস্থানেই নাকি এবি দর্শকেরা সর্বাপেক্ষা অধিক সময় যাপন করেন, তাহা আশ্চর্য নহে। কারণ অন্যান্য বীরদিগের কীর্তি স্মরণ করিয়া আমাদের হৃদয় বিপ্লব পূর্ণ হয়, কিন্তু কবিদিগের স্মৃতি স্তম্ভ দেখিয়া মনে হয় যে, আমাদের অনেকদিনের পরিচিত বন্ধুদিগেয় সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। এখানে চসার হইতে আরম্ভ করিয়া টেনিসন পর্যন্ত প্রধান কবিদিগের সমাধিক্ষেত্র দেখিলাম। এস্থান হইতে আমরা সপ্তম হেনরীর মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। ইহা এবির সর্বোৎকৃষ্ট মন্দির, ইহা নির্মাণ করিয়া সপ্তম হেনরী ইংলণ্ডে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। এখানে রাজ্যাভিষেকের অতি পুরাতন আসন রক্ষিত আছে, এখনও সেই আসন ব্যবহৃত হয়। কিয়দ্দূরে রাজা জনের লিখিত মেগ্নাকার্টা (magnacharta) দেখিলাম।

এস্থানে অন্যান্য যে সকল স্মৃতিস্তম্ভ দেখিলাম, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা বর্ণনা করা যায় না। দেখিয়া মনে হইল ইংলণ্ড হইতে বহুদূরে, বিদেশে, বিপদে অতি সামান্য সৈন্য যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ দিবার সময় কেন ওয়েলিংটন ও নেলসনের কথা স্মরণ করে। এই স্থানে তাঁহাদের যে ছিন্ন-পতাকা রক্ষিত হইয়াছে, সেই পতাকার গৌরব তাহারা বিপদেও রক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হয়। এইরূপ নামহীন, খ্যাতিহীন অজ্ঞাত সামান্য সৈনিকের রক্তে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইতেছে। ইহার মূলে জাতীয় গৌরবের স্মৃতি এবং এই ওয়েষ্টমিনিষ্টার এবিতে সেই জাতীয় মহিমার স্মৃতি জাজ্বল্যমান!

পার্লেমেণ্ট দর্শন

টেম্‌স্‌ নদী ইংলণ্ডের রাজধানীর গৌরব রক্ষা করিবার উপযুক্ত। শহরের নিকট তাহার দুই পার্শ্বই বাঁধান, দুইদিকে সুন্দর পাকা রাস্তাতে গাড়ী ঘোড়া লোকজন যাতায়াত করিতেছে, এদিকে লণ্ডনের দুর্গ প্রভৃতি নানা সুসজ্জিত হর্ম্য বিরাজ করিতেছে। অন্যদিকে হাঁসপাতাল ও কলকারখানার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গৃহ রহিয়াছে। নদীর দুই পার্শ্বে—গমনাগমনের জন্য বহু সংখ্যক সেতু নির্মিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত অল্প পয়সাতে যাতায়াতের উপযোগী জাহাজেরও অভাব নাই। লণ্ডনের এই অংশের একখানি চিত্র দেওয়া হইল।

লণ্ডন শহর হইতে দূরে টেম্‌স্‌ নদীতে তীরের শোভা অপূর্ব, নানা বৃক্ষলতা ও গ্রাম্য ছবি তাহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিতেছে।

এই সকল দর্শনীয় স্থানের মধ্যে অদূরবর্তী পার্লেমেণ্ট মহাসভাগৃহ যে কারুকার্য সম্বন্ধে সর্বোৎকৃষ্ট তাহার সন্দেহ নাই। শিল্প-নৈপুণ্যে ইহা শুধু লণ্ডনের কেন, ইয়োরোপের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান ভুক্ত।

অনেকদূর হইতে এই গৃহের ঘড়ি থাকিবার উচ্চ চূড়াটি ও অন্যান্য চূড়াগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে যাইবার পূর্বে এই গৃহ এবং সভার কার্য দেখিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ ছিল; কিন্তু আমাদের পৌঁছিবার কিয়ৎকাল পরেই গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে সভার কার্য স্থগিত হয়, সুতরাং আমি উক্ত সভার কার্য দেখিবার আশা এক প্রকার ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। ঘটনাক্রমে আমাদের ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিতে বিলম্ব হইল, তাহাতেই সভার নূতন সেসনের কার্য আরম্ভ হইলে, আমি প্রবেশের পাশ সংগ্রহ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম।

দর্শকদের সভাগৃহে প্রবেশের জন্য পাশ সংগ্রহ করা আবশ্যক। প্রত্যেক সভ্যের তিনখানা পাশ দিবার অধিকার আছে। পুরুষ দর্শকদের বসিবার স্থানটি প্রশস্থ থাকাতে, তাঁহাদের পাশ সংগ্রহ করিতে অধিক কষ্ট হয় না, কিন্তু স্ত্রী-দর্শকদের স্থানটি অতিশয় সঙ্কীর্ণ, তাই—তাহাদের পাসের জন্য সভ্যদের মধ্যে সুরতি খেলা (ballot) হয়। যে যে সভ্যের ভাগ্যে নাম উঠে, তাঁহারাই কেবল পাশ দিতে পারেন। এই জন্য কখন কখন পাশ—প্রার্থিনীকে অনেকদিন অপেক্ষা করিতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে সার জন লাবক (Sir John Lubbock) মহাশয়ের নিকট হইতে আমি দুইখানা পাশ পাইয়াছিলাম।

পূর্বেই ভারতের মঙ্গলাকাঙ্খী পার্লেমেণ্টের সভ্য সোয়ান সাহেবের পত্নী আমাকে উক্ত সভাতে লইয়া যাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। নির্দিষ্ট দিনে তিনি নিজের গাড়ীতে আমাকে লইয়া গেলেন। মহাসভা গৃহটি একটি প্রাসাদ বিশেষ, কোথা হইতে

কোথায় প্রবেশ করিলাম; বুঝিতে পারিলাম না; গাড়ী খিলান দরজার নীচ দিয়া প্রকোষ্ঠ হইতে প্রকোষ্ঠান্তরে প্রবেশ করিয়া, অবশেষে এক ক্ষুদ্র দরজার নিকট থামিল। আমরা নামিয়া একটা কল (lift) দ্বারা ত্রিতলে উঠিলাম সেখানে পাশ দেখাইয়া স্ত্রীলোকদের নির্দিষ্ট স্থানে বসিলাম। সে স্থানটি দেখিয়া লক্ষ্ণৌ নবাবদের প্রাসাদের অন্তঃপুরের কথা মনে পড়িল। ঠিক তেমনি ছিদ্র বিশিষ্ট প্রাচীর ; যাহারা সম্মুখে বসেন, তাঁহারাই কেবল সেই ছিদ্র দিয়া নীচের সমুদয় কার্য দেখিতে পান, পিছনের আসন হইতে দেখিবার সুবিধা নাই, হলের এক পার্শ্বে রক্ষণশীল, অন্যপার্শ্বে উন্নতিশীল সভ্যদের বসিবার স্থান। পশ্চাতের দিকে সভাপতির (speaker) বসিবার উচ্চস্থান। তাঁহার সম্মুখে টেবিলের পার্শ্বে কাগজ-পত্র লইয়া কর্মচারীগণ উপবিষ্ট। উপরে দর্শকের ও খবরের কাগজের রিপোর্টারদের বসিবার গ্যালারি।

সভ্যেরা সকল সময় সভাগৃহে উপস্থিত থাকেন না, যাঁহারা আলোচনা (debate) করেন, তাঁহারা এবং যে বিষয়ে যাঁহাদের বক্তব্য আছে, সে সভ্যেরাই সাধারণতঃ উপস্থিত থাকেন। অন্যান্য সভ্যেরা সর্বদাই ভিতর বাহিরে যাওয়া আসা করেন। যাঁহারা গৃহে উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ বা সেখানে বসিয়া টুপী বা রুমাল মুখের উপর রাখিয়া নিদ্রা যান; কেহ বা নোট লেখেন, কেহ বা অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় আলোচনা শ্রবণ করেন, বেচারা সভাপতিকে কিন্তু সমস্ত সময় সেখানে বসিয়া থাকিতে হয়।

প্রত্যেক সভ্যই নিজ নিজ স্থানে দাঁড়াইয়া, কথা বলিবার মত অতি সহজ ভাবে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার মধ্যে কেবল দরকারী ও জ্ঞাতব্য বিষয় বলিতে হয়—তাহা না হইলে সেখানে চলে না। আমি যে দিন যাই, সেদিন কলকারখানা সম্বন্ধীয় আইন লইয়া আলোচনা চলিতেছিল (Factory Bill)। দেখিলাম, বক্তা প্রকাণ্ড একতাড়া কাগজ হাতে লইয়া বক্তৃতা করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে কাগজ হইতে দৃষ্টান্ত তুলিতেছেন। শুনিলাম, বক্তা শ্রমজীবীদের প্রতিনিধি। অতি সামান্য অবস্থা হইতে তিনি স্বীয় অধ্যবসায় বলে পার্লামেণ্টের সভ্য হইয়া, গরীবদের দুঃখ নিবারণে সর্বদা চেষ্টা করেন। বক্তৃতার বিষয় এই, যে গভর্ণমেণ্ট আপত্তি না করাতে, কলকারখানার স্বত্বাধিকারীগণ অধিক লাভের প্রত্যাশায়, অল্পব্যয়ে সামান্য রকমের গৃহাদি নির্মাণ করিয়া থাকেন, সে সকল গৃহ চাপা পড়িয়া বৎসর বৎসর অনেক লোক মারা যায়। অতএব এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের একটা আইন থাকা উচিত।

বক্তা কোন্ কোন্ বৎসর কত লোক মারা পড়িয়াছে, কত লোক পঙ্গু হইয়াছে, এই সমস্ত উল্লেখ করিয়া তাঁহার মত সমর্থন করিলেন। বিপক্ষীয় সভ্য প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন, যে গভর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে হাত দেবার আবশ্যক নাই।

বৎসরে সাত আটটি লোক হয়ত মারা পড়িতেছে তাহার জন্য এত আন্দোলন! আমরা হইলে ভ্রূক্ষেপ করিতাম না; অদৃষ্টের দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতাম।

এখানকার আলোচনা প্রণালী অতি সুন্দর। বক্তা স্বপক্ষে বলিয়া যাইতেছেন; এমন সময় বিপক্ষীয় সভ্যের কিছু বলিবার আবশ্যক হইলে, তিনি উঠিয়া দাঁড়ান, বক্তা অমনি

বসিয়া পড়েন। বিপক্ষীয় সভ্যের বক্তব্য শেষ হইলে; পূর্ব বক্তা উঠিয়া তাহার যুক্তি খণ্ডণ করিয়া (অথবা স্বপক্ষীয় কেহ সেই যুক্তি খণ্ডণ করিলে পর) আবার নিজ বক্তব্য বলিতে থাকেন।

এ বিষয়ের বাদানুবাদ শেষ পর্যন্ত শুনিতে আমার যেরূপ আগ্রহ হইয়াছিল, তাহাতে বেশ বুঝিতে পারিলাম, সভ্যেরা সমস্ত রাত্রি জাগিয়াও কিরূপে অক্লান্তভাবে বাদানুবাদ করিয়া করিয়া সময় কাটান।

আমাকে সমুদয় প্রাসাদটি দেখিতে হইবে, তাই সঙ্গিনীর ইঙ্গিতে অযথা বাধ্য হইয়া সে স্থান ছাড়িলাম। বাহিরে আসিলে সোয়ান সাহেব আমাদের পথ প্রদর্শক হইয়া সঙ্গে চলিলেন। তিনি এতগুলি ঘরের মধ্য দিয়া লইয়া গেলেন, যে আমার আশ্চর্যবোধ হইতে লাগিল, আমি নিজে নিশ্চয়ই পথ ভুলিতাম।

অবশেষে অনেক ঘুরিয়া আমরা মহাসভার "লবি" (Lobby) নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। পার্লামেণ্ট সভার সমুদয় গৃহের মধ্যস্থিত গুম্বুজাকার স্থানটিকে 'লবি' বলে। এই মধ্যস্থিত স্থান হইতে 'লর্ডদের' সভাগৃহে, 'কমন' বা সাধারণের সভাগৃহে এবং অন্যান্য সমুদয় গৃহে যাওয়া যায়। এখানে অনেক সভ্যের দর্শন পাইলাম, কেহ বা গল্প পরিহাস্য করিতেছেন; কেহ কেহ হাঁটিতে হাঁটিতে নানা প্রকার তর্ক করিতেছেন— মন্ত্রণা-সভা হইতে এখানেই অধিক সভ্য উপস্থিত ছিলেন। ইহার নিকট 'পোল' (Poll) দিবার ঘর। কোন আলোচ্য বিষয় লইয়া যখন মতভেদ হয়; তখন সভ্যেরা এখানে আসিয়া নিজ নিজ 'ভোট' দিন।

'লবি পার হইয়া লর্ডদের সভাগৃহে গেলাম। পথে পুরাতন রাজাদের সময় করে নানা রকম ছবি দেখিলাম।

লর্ডদের গৃহটি সাধারণদের গৃহ অপেক্ষা ভালরূপে সজ্জিত। বসিবার আসনগুলি লাল মখমলে মণ্ডিত, আয়নাগুলিতে নানা বর্ণের ছবি আঁকা। মহারাণীর জন্য সুন্দর মখমলে-মণ্ডিত সিংহাসন একধারে রক্ষিত। অনেক এই আসন ব্যবহার হয় না।

সাধারণ সভ্যেরা তাহাদের সজ্জাহীন সামান্য গৃহই অধিক পছন্দ করেন। তাঁহারা বলেন, ঐরূপ গৃহেই বেশ কার্য সম্পন্ন করা যায়।

এই স্ত্রী সাধের মধ্যে 'ওয়েষ্টমিনিষ্টার হল' (West-minister Hall) সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। যে মোকদ্দমায় গভর্ণমেণ্ট বাদী, এখানে তাহার বিচার হয়। আমরা যখন গিয়াছিলাম, তখন এখানে দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে বিচার চলিতেছিল।

এই স্থানেই ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিচার হইয়াছিল, বিখ্যাত বাগ্মী 'বার্ক' (Burke) এবং 'সেরিডেন' (Sheridan) ভারতবাসীদের পক্ষ হইয়া এই স্থানেই ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে বক্তৃতা ধরিয়াছিলেন। প্রাসাদটি দেখিয়া আমরা নীচে আহারের স্থানে গেলাম। ইংরাজ জাতির আহারের বন্দোবস্ত সব স্থানেই আছে; সভ্যেরা এখানে যাহা আহার করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাই কিনিতে পান। আমরা এখানে 'কফি' পান করিয়া টেমস্ নদীতীরস্থ মহাসভা গৃহের সুন্দর বারান্দায় বেড়াইতে গেলাম।

গ্রীষ্মকালে অনেক সভ্য বন্ধু বান্ধবসহ এই স্থানে গল্প-স্বল্প ও আহারাদি করিয়া থাকেন। এখন এই বারান্দাটি সভ্যদের বন্ধু সমাগমে পূর্ণ হইয়া এক অপূর্ব শোভা ধারণ করে।

যে পার্লামেন্টের মন্ত্রণা দ্বারা পৃথিবীর অনেক স্থানের ভাগ্য নির্দিষ্ট হইতেছে, যে পার্লামেন্ট ইংরাজ জাতীর ইতিহাস ও সৌভাগ্যের কারণ, সেই পার্লামেন্ট দেখিবার ইচ্ছা অনেক-দিন হইতে ছিল, তাহা পূর্ণ করিয়া গৃহে ফিরিলাম।

চিতোর দর্শন

এদেশে ভ্রমণ করিতে বাহির হইলে সর্বত্রই একটা ক্লেশ হয়। প্রায় প্রত্যেক বড় বড় স্থানেই দেখা যায়, মুসলমান রাজারা হিন্দুদের প্রাচীন কীর্তি সকল পেশ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। কাশীতে গেলে দেখিবে, পুরাতন বিশ্বেশ্বরের মন্দিরটি ভাঙ্গিয়া একজন মুসলমান রাজা সেই স্থানে মস্‌জিদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এইরূপে কোথাও বা হিন্দুদের দেবমন্দির ভাঙ্গিয়া সেই প্রস্তর দিয়া মস্‌জিদ হইয়াছে, অথবা মুসলমান রাজাদের গোরস্থান হইয়াছে; কোথাও বা সেই প্রস্তর দিয়া শহরের দরজা নির্মিত হইয়াছে। গুজরাটের রাজধানী আমেদাবাদ শহরে একবার দেখা গেল যে একটি রাস্তার যে পাথরখানি তোলা যায়, তাহাই এক একটি হিন্দুদের দেবমূর্তি। কোথাও মুসলমান রাজা পাথর উল্টাইয়া দেবমূর্তিগুলি নীচের দিকে রাখিয়া এই রাস্তাটি বাঁধাইয়াছিলেন। এইরূপ সর্বত্রই হিন্দু কীর্তির ভগ্নাবশেষ দেখিয়া প্রাণে এক প্রকার ক্লেশ হয়; এবং বর্তমান রাজারা যে কত ভাল তাহা বারবার মনে হয়। তাঁহারা কেমন যত্ন করিয়া হিন্দুর ও মুসলমানদিগের প্রাচীন কীর্তি সকল রক্ষা করিতেছেন। এইরূপ যত স্থান দেখিয়া আমাদের মনে ক্লেশ হইয়াছে, তাহার মধ্যে চিতোর সর্বপ্রধান। চিতোর দেখিয়া আমরা চক্ষের জল রাখিতে পারি নাই। বাল্যকাল হইতে যে চিতোর-বাসী রাজপুতদিগের বীরত্বের কথা শুনিয়া আসিতেছি, যে চিতোরের গুণকাহিনী কতই পড়িয়াছি, যে চিতোরের নাম যেন কর্ণে লাগিয়াই রহিয়াছে, সেই চিতোর যখন দেখিলাম, তখন চক্ষের জল ফেলিয়া বলিলাম, "হায়রে, এই কি সেই চিতোর!" বোধ হইল যেন কোনও ঘুমের দেশে আসিলাম! যেন পাহাড় পর্বত, বাড়ীঘর, গাছপালা, মানুষ পশু সকলেই ঘুমাইতেছে, সকলেই যেন মরিয়া আছে।

তোমরা মধ্য ভারতবর্ষের ম্যাপে চিতোর নগর দেখ। সমুদয় নগরটি একটি পাহাড়ের উপরে দুর্গের দ্বারা বেষ্টিত। এই দুর্গে বাস করিয়া রাজপুত বীরগণ দিল্লীর সম্রাটদিগকেও কাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন। সে সব অদ্ভুত কথা এখানে বলিবার অবসর নাই। তোমাদের মধ্যে যাহাদের বয়স কিছু অধিক, তাহারা টড্ সাহেবের

প্রণীত "রাজস্থান" নামক গ্রন্থের অনুবাদ পাইলে, তাহাতে চিতোরের রাজপুতদিগের বীরত্বের বিবরণ পড়িয়া দেখিও।

চিতোরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম সুরম্য রাজপুরী বিদ্যমান ; উদ্যানে বৃক্ষসকল ফলফুলে ভরিয়া রহিয়াছে ; রাজপুরীর সম্মুখে সুন্দর দেবমন্দির, তাহার গায়ে বিচিত্র শিল্পকার্য, মধ্যে মহাদেবের মূর্তি ; সন্নিকটে একটি সুন্দর জলাশয় ; তাহার পার্শ্বে প্রকান্ড আম্র-কানন স্থানটিকে ছায়ায় ঢাকিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু সকলই মৃত। রাজবাড়ী, দেবমন্দির, আম্রকানন সমুদয় জন শূন্য। নগরে রাস্তাঘাট গৃহাদি সমুদয়ই বর্তমান, কিন্তু জন প্রাণীর দেখা নাই ; যেন কে মরণ—কাঠি ছোঁয়াইয়া শহরটিকে মারিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু মনুষ্যহীন হইলেও রাজপুত বীরপুরুষ ও রমণীদিগের কীর্তি চিতোরকে জাগ্রত রাখিয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে একস্থানে এত বীরকীর্তি একত্রিত দেখা যায় না।

চিতোর-দুর্গে উঠিবার পূর্বে চিতোরের পাহাড়ের নিম্নে একটি প্রকান্ড মাঠ পার হইয়া যাইতে হয়। এই মাঠেই মুসলমান রাজারা তাঁবু গাড়িয়া চিতোর অবরোধ করিতেন। এখনও এই মাঠে যুদ্ধে হত মুসলমান সৈনিকদিগের সমাধি সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। চিতোর নগর ৫০০ ফিট উচ্চ এক পাহাড়ের উপর স্থিত। উপরে উঠিবার একটি ভিন্ন পথ নাই ; এই জন্যই মুসলমান রাজারা এই দুর্গম ও দুর্ভেদ্য দুর্গ সহজে অধিকার করিতে পারিতেন না।

রাজপুতনার অন্তর্গত মিবারের সূর্যবংশীয় রানারা চিতোরকে তাঁহাদের প্রধান গৌরব স্থল মনে করিতেন। চিতোর শত্রু-হস্তে পড়িলে যতদিন তাহা পুনরায় অধিকার করিতে না পারিতেন ততদিন গভীর দুঃখ ও ক্লেশে কাল যাপন করিতেন। রাণা প্রতাপ সিংহ চিতোর হারাইয়া কিরূপ দুঃখে কাল যাপন করিতেন, তাহার বিবরণ তোমরা হয়ত পাঠ করিয়াছ। প্রতাপ সিংহ যে কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়া, পর্ণ-শয্যায় শয়ন করিতেন, এবং স্বর্ণ পাত্রের পরিবর্তে বৃক্ষপত্রে আহার করিতেন, তাঁহার বংশধরগণ আজিও সেই নিয়মের অণুকরণ করিয়া বিছানার নীচে একগাছি তৃণ এবং স্বর্ণ থালার নীচে বৃক্ষপত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন একথাটাও তোমরা জান।

আমরা দুর্গে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই রাজপ্রাসাদগুলি দেখিলাম, যে হ্রদের সম্মুখে ভীমসিংহ ও পদ্মিনীর প্রাসাদ, সে হ্রদ এখন শুষ্কপ্রায়, হ্রদের মধ্যে পদ্মিনীর বিশ্রাম-ভবন, তাহার চতুর্দিকে এখনও অল্প অল্প জল আছে। এই পদ্মিনীর উপাখ্যান হয়ত তোমরা অনেকেই শুনিয়া থাকিবে। তাহা এই,—দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দিন পদ্মিনীকে হরণ করিবার উদ্দেশে প্রথম চিতোর অবরোধ করেন, অনেকবার অকৃতকার্য হইয়া পরিশেষে ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে চিতোর অধিকার করেন। এই ভীষণ সময়ে রাণা লক্ষণসিংহ বংশ রক্ষার নিমিত্ত একমাত্র পুত্র রাখিয়া এগারটি পুত্রের সহিত রণে প্রান দান করেন। দুর্গের পূর্বদিকে কুম্ভ রাণা ও রাণা সঙ্গসংগ্রাম সিংহের প্রাসাদ ; ইহা যে নানাপ্রকার শিল্পকার্যে শোভিত ছিল তাহা এখনও বোঝা যায়।

রাণা সংগ্রামসিংহের সহিত বাবরের যুদ্ধ হয়, বাবর কয়েকবার যুদ্ধে পরাজিত হন; কিন্তু শেষে রাণা সঙ্গের জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষের বিশ্বাসঘাতকতায় জয়লাভ করেন।

নগরের মধ্যস্থলে রাণা কুম্ভের জয়স্তম্ভ এখনও আকাশ ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। রাণা কুম্ভ ১৪৩৯ খৃষ্টাব্দে মালবদেশের রাজা মহম্মদের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া এই কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ করেন। এই নব তল স্তম্ভটি ১২০ ফিট উচ্চ; এই কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ করিতে দশ বৎসর লাগিয়াছিল। স্তম্ভের গাত্রে বহুবিধ সুন্দর প্রস্তর খোদিত রহিয়াছে। কুম্ভ রাণার পত্নী মীরাবাই-এর নাম এদেশে বিখ্যাত। মীরা অতিশয় ভক্তিমতী ও ধর্মপরায়ণা নারী ছিলেন। তিনি নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া চিতোরে প্রত্যাগত হইয়া পুনরায় দ্বারকাপুরী দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহার জন্য এই স্তম্ভ নির্মিত হয়, এরূপ প্রবাদ প্রচলিত থাকাতে, কেহ কেহ ইহাকে মীরাবাই-এর স্তম্ভও বলিয়া থাকেন।

আমরা চিতোরের বহুবিধ পুরাতন মন্দির প্রভৃতি দেখিয়া অবশেষে এমন এক স্থানে উপস্থিত হইলাম, যেখানে আসিয়া আর চক্ষের জল রাখিতে পারিলাম না। এই স্থানে পর্বতের গাত্রে এক ক্ষুদ্র মন্দির? পর্বতের গাত্র হইতে নিরন্তর স্ফটিকধারা সমান জলধারা বহির্গত হইয়া মন্দিরস্থিত মহাদেবের মস্তকে পড়িতেছে। এই প্রস্রবণের জল দ্বারা সম্মুখের একটি বাঁধান পুষ্করিণী সর্বদা পূর্ণ হইতেছে। ইহার দক্ষিণে একটি সুরঙ্গ পথ দেখিলাম। রাজবাটী হইতে সুড়ঙ্গটি আসিয়াছে। চিতোরের স্বাধীনতার দিনে রাজকন্যাগণ এই পথ দিয়া এখানে আসিয়া পূজা ও স্নান সমাপন করিতেন। তৎপরে যাহা ঘটিয়া ছিল, তাহা এই ঃ—১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে আকবর অসংখ্য সৈন্য লইয়া চিতোর আক্রমণ করিলেন। দুর্গস্থ রাজপুতগণ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রাণ দিয়া দুর্গরক্ষা করিবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞ হইলেন, একদিকে যেমন মুসলমানগণ বার বার দুর্গ প্রাচীর ভগ্ন করিতে লাগিলেন, অপরদিকে রাজপুতেরাও রাত্রের মধ্যেই তাহা পুনরায় সংস্কার করিয়া লইতে লাগিলেন। বহুকাল এই রূপ চলিল। পরিশেষে রাজপুত সৈন্যাধ্যক্ষ জয়মল্ল ও পুত আকবর কর্তৃক নিহত হইলেন, তখন নেতাশূন্য হইয়া আর অধিককাল দুর্গ রক্ষা করিতে পারা যাইবে না জানিয়া, দুর্গস্থিত সমস্ত নরনারী শত্রুর হস্তে আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়স্কর মনে করিল। তখন আট হাজার রাজপুত বীর হরিদ্রাবর্ণের পরিচ্ছদ পরিয়া জন্মের মত আত্মীয় স্বজনের নিকট বিদায় লইয়া ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রদলের ন্যায় শত্রু সৈন্য মধ্যে পতিত হইলেন; ও অসামান্য বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এদিকে রাজপুত নারীগণ দলবদ্ধ হইয়া জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিলেন। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া একজন বাঙ্গালী কবি যে সুন্দর কবিতাটি লিখিয়াছেন তাহা হইতে আমরা কয়েকটী পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ, পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা,
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুন; জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা।
শোন্‌রে যবন, শোন্‌রে তোরা, যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,
সাক্ষী হ'লেন দেবতা তার, এর প্রতিফল ভুগিতে হবে।

"জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ দ্বিগুণ, অনলে আহুতি দিব এ প্রাণ,
জ্বলুক জ্বলুক, চিতার আগুন, পশিব চিতায় রাখিতে মান।
দেখ্‌রে যবন, দেখ্‌রে তোরা, কেমনে এড়াই কলঙ্ক-ফাঁসি,
জ্বলন্ত অনলে হইব ছাই, তবু না হইব তোদের দাসী।"
দেখ্‌রে জগৎ, মেলিয়া নয়ন; দেখ্‌রে চন্দ্রমা, দেখ্‌রে গগন;
স্বর্গ হতে সব দেখ দেবগণ, জলদ-অক্ষরে রাখগো লিখে।
স্পর্দ্ধিত যবন; তোরাও দেখ্‌রে, সতীত্ব-রতন করিতে রক্ষণ,
রাজপুত-সতী আজিকে কেমন, সঁপিছে পরাণ অনল-শিখে।

আমরা যে মন্দিরের নিকট বসিয়াছিলাম তাহার সম্মুখেই এই মহা চিতা স্থান। এই দারুণ ঘটনার পর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আকবর শাহ যখন চিতোরে প্রবেশ করিলেন, তখন রাজপুর বীরগণের বীরত্বের কথা ভাবিয়া তাঁহার প্রাণ মোহিত হইল। তিনি দেখিলেন; চিতোরে বাধা দিতে আর কেহ নাই। পুরুষেরা সকলে রণক্ষেত্রে মরিয়াছে ও রমনীরা চিতানলে দগ্ধ হইয়াছে। শুনা যায়, এই ঘটনাতে আকবরের প্রাণে এত ক্লেশ হইয়াছিল, যে তিনি দিল্লীতে ফিরিয়া আসিয়া জয়মল্লের ও পুত্তের প্রস্তর নির্মিত মূর্তি গড়াইয়া নিজের প্রাসাদ সমীপে স্থাপন করিয়াছিলেন।

লক্ষ্ণৌ ভ্রমণ

অযোধ্যার নাম কে না জানে? রামায়ণ যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহাদের মনে অযোধ্যার নাম জন্মের মত গাথিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। এখন অযোধ্যা বা আউড্ প্রদেশে অযোধ্যা নামে একটি পুরাতন নগর পড়িয়া আছে। সেটি হিন্দুদের একটি তীর্থস্থান। সেখানে গেলে সেখানকার পান্ডারা রাম-সীতার অনেক চিহ্ন দেখায়। বলে; ঐখানে শ্রীরামচন্দ্র জন্মিয়াছিলেন, ঐ ঘরে সীতাদেবী রন্ধন করিতেন ইত্যাদি। সে সকল কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয় না। যাহা হউক যে অযোধ্যা নগরের নাম হইতে অযোধ্যা প্রদেশের নাম হইয়াছে, অনেকদিন হইল সে অযোধ্যা নগর নিবিয়া গিয়াছে, মরিয়া গিয়াছে। তাহার পরিবর্তে লক্ষ্ণৌনগর জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এই লক্ষ্ণৌ নগরের বিষয় কিছু বলিতেছি। লক্ষ্ণৌ শহর গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত। গোমতী গঙ্গারই শাখা; খালের মত শহরটির একপাশ দিয়া বহিয়া যাইতেছে।

প্রবাদ আছে, রামচন্দ্র বনবাসের পর অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া, এই স্থানের শাসন ভার লক্ষ্মণের উপর দেন, লক্ষ্মণের নাম অনুসারে এই স্থানের নাম লক্ষণপুর হয়, পরে তাহা হইতে লক্ষ্ণৌ হয়। হিন্দু রাজাদের সময়ে লক্ষ্ণৌ তত বিখ্যাত ছিল না। মুসলমান রাজাদের রাজত্ব সময়েই ইহার শ্রীবৃদ্ধি হয়।

মোগল সম্রাটগণের রাজত্ব কালে অযোধ্যা তাঁহাদের শাসনাধীন ছিল। পরে মোগল সাম্রাজ্যের পতন হইলে, বাহাদুর শাহ নাম-মাত্র দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। ইহাঁরই সময়ে সদৎখাঁ নামক একজন পারস্য-দেশীর বণিক সম্রাটের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র হইয়া, অযোধ্যার শাসনভার প্রাপ্ত হন। বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হয়। অনেক রক্তপাতের পর মহম্মদশাহ নামে একব্যক্তি সম্রাট হয়। এই সময়ে সদৎ আলী খাঁ সুযোগ বুঝিয়া স্বাধীনভাবে নবাব উপাধি গ্রহণ করিয়া, অযোধ্যাতে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। ইনিই অযোধ্যার প্রথম নবাব। সদৎ আলীখাঁর বংশের লোকেরা ইংরাজদিগের অধিকার সময় পর্যন্ত একশত বৎসর নিরুপদ্রবে অযোধ্যায় রাজত্ব করেন। ক্রমে ইংরাজদের সঙ্গে তাঁহাদের বিবাদ বাঁধিয়া ইংরাজেরা প্রসিদ্ধ বক্সারের যুদ্ধে লক্ষ্নৌ এর তখনকার নবাব সুজাউদ্দৌলাকে পরাস্ত করেন। বলিতে গেলে সেই সময় হইতেই ইংরাজেরা অযোধ্যার রাজকার্যে হাত দিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তখনও দিল্লীর সহিত অযোধ্যার নামমাত্র সম্বন্ধ ছিল। ক্রমে ক্রমে সেই সম্বন্ধ ঘুচাইয়া ইংরাজেরা অযোধ্যার নবাবকে আপনাদের করদ রাজরূপে পরিণত করেন। অবশেষে নবাবেরা করপ্রদানে অসমর্থ হওয়াতে এবং অন্যান্য কারণে ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে নবাব ওয়াজেদ আলী-শা লর্ড ক্যানিং কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হন ; এবং অযোধ্যাকে সম্পূর্ণরূপে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের রাজ্যভুক্ত করা হয়। ওয়াজেদ আলীখাঁ অত্যন্ত সৌখিন ও সঙ্গীতপ্রিয় লোক ছিলেন। তিনি লক্ষ্নৌঠুংরী নামে এক বিখ্যাত নূতন সুরের সৃষ্টি কর্তা। ইংরাজেরা তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া কলিকাতার নিকট মেটিয়াবুরুজে বন্দী করিয়া রাখেন। সে সময়ে তাঁহার প্রজারা শোক করিয়া নিম্নলিখিত গানটি বাঁধিয়া ছিল।

"নিমক হারামে মুলুক ডবায়,
হজরত প্রাযে হে লণ্ডন কো।
ওয়াজদালসী যুগ যুগ জীয়ে,
যিসনে বনায়ি লক্ষ্নৌ নগরী।
মহলমে মহলমে বেগম রোয়ে,
গলি গলি রোয়ে পাথুরিয়া।"

ওয়াজেদ আলী-শা মৃত্যু পর্যন্ত গঙ্গাতীরে মেটিয়াবুরুজ নামক স্থানে বাস করিতেন। বন্দী অবস্থায়ও তাঁহার আড়ম্বর প্রিয়তা ও সখের হ্রাস হয় নাই। প্রকাণ্ড অট্টালিকা উপরে পায়রাদিগের বাসস্থান নির্মিত ছিল। পায়রার খেলা দেখিতে ওয়াজেদ আলী শা বড় ভালবাসিতেন। হাজার হাজার পায়রা ঝাঁকে ঝাঁকে নবাবের অট্টালিকার উপরে উড়িত। তাঁহার সুন্দর উদ্যানটিও একটি দেখিবার স্থান ছিল। তখনও আলীপুরের পশুশালা হয় নাই। নবাবের বাগানের জন্তু সংখ্যা আলীপুরের পশুশালা হইতে সংখ্যায় অল্প হইলেও সেখানে হাঁস ও অন্যান্য পাখীর সংখ্যা অনেক অধিক ও নানা প্রকারের ছিল। লক্ষ্নৌএর নবাবের বাড়ী, ঘর, পশুশালা প্রভৃতি দেখিয়া তাঁহার আদিস্থান লক্ষ্নৌ দেখিবার ইচ্ছা অনেক দিন হইতে মনে ছিল। লক্ষ্নৌ-এর বাগান, রাজবাড়ী, প্রভৃতি সমুদয় নবাবদের বিলাসিতা ও ঐশ্বর্যের পরিচয় দেয়।

লক্ষ্ণৌ শহরের অনেকগুলি উদ্যান আছে ; তাহার মধ্যে কাইসারবাগ নামক উদ্যানটি বিশেষ প্রসিদ্ধ। ওয়াজেদ আলী-শা এই উদ্যানটিকে ইন্দ্রভবন তুল্য করিয়া তাহাতে বাস করিতেন। এখন আর ইহার তেমন শোভা নাই। পূর্বে যেখানে বেগমদিগের বাসস্থান ছিল এখন তাহা সৈনিকদের জেল হইয়াছে ও উদ্যানের মধ্যে ক্যানিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লক্ষ্ণৌএর পুরাতন রাজভবন 'ছত্রমুঞ্জিলে' এখন সরকারী কাছারী হয়।

'মচ্ছিবাওয়ান' ও 'ইমামবাড়া' লক্ষ্ণৌ এর দুইটি প্রধান দেখিবার উপযুক্ত স্থান। 'মচ্ছিবাওয়ান' একটি মসজিদ্। প্রবাদ এই যে এখানে লক্ষণের বাসস্থান ছিল বলিয়া, হিন্দুরা ইহাকে পবিত্র স্থান বলিয়া গণ্য করিতেন, এজন্য হিন্দুদ্বেষী আওরঙ্গজেব এখানে এই মস্‌জিদ্ নির্মাণ করেন। ইহাতে ৫২ টি মাছের ছবি আছে বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে। এখানে একটি কূপ আছে তাহা প্রায় দ্বিতল গৃহের সমান উচ্চ। 'ইমামবাড়া' আসকউদ্দৌলা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইঁহার পিতা সুজাউদ্দৌলা ইংরাজদিগের নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন। ইহার 'রুমীদরজা' নামক প্রকাণ্ড ফটক কনষ্টান্টিনোপল নগরের প্রকাণ্ড ফটকের অনুকরণে নির্মিত। ইহার নিকটে হোসেনাবাদ নামক একটি মস্‌জিদ্। আদিল শা নামে এক নবাব ছিলেন, তিনি নিজ সমাধির জন্য এই মসজিদ্ নির্মাণ করিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে এখানে নৃত্য গীতাদি আমোদ হইত। উপরে বেগমদিগের বসিবার জন্য সুন্দর বন্দোবস্ত ছিল। এত বড় প্রকাণ্ড গৃহ আমরা আর দেখি নাই। আমাদের কলিকাতা টাউন হল হইতেও অনেক বড়। এখন ইহা অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়া আছে দেখিয়া বড় দুঃখ হইল। লা মার্টি-নিয়ার কলেজের গৃহ লক্ষ্ণৌ-এর আর একটি দর্শনীয় স্থান। মার্টিনিয়ার সাহেব নবাবের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি নবাবের বিশেষ প্রিয় পাত্র ছিলেন ; এবং অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়া যান। প্রথমে এই অট্টালিকা নবাবের ব্যবহারের জন্য নির্মিত হইয়াছিল, পরে ইহাতে মার্টিনিয়ার সাহেবের সমাধি হয়। মার্টিনিয়ারের সমাধির উপরে ছয়তালা গৃহ দুর্গের ন্যায় উঠিয়াছে, দুই পার্শ্বে কলেজ গৃহ। অট্টালিকাটি ইটালিয়ান ধরনে নির্মিত।

এই সকল অট্টালিকা ব্যতীত সিপাহীবিদ্রোহের ভগ্নাবশেষ বেলিগার্ড বা পুরাতন রেসিডেন্সী একটি দর্শনীয় স্থান। এই স্থানটি একটি উচ্চ ভূমির উপরে স্থাপিত। এখানে স্যার হেন্‌রী লরেন্স সাহেব লক্ষ্ণৌবাসী ইংরাজদিগকে লইয়া বিদ্রোহী সিপাহীদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই স্যার হেন্‌রী লরেন্সের নাম এদেশে বিখ্যাত। তিনি যেমন বীর তেমনিই কর্তব্যপরায়ণ ও তেমনি সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। বেলিগার্ডের ভগ্ন গৃহগুলি ঠিক সেইরূপ ভাবেই রক্ষিত হইতেছে। কামানের গলা যেখানে যেখানে লাগিয়াছিল, সেখানে সেখানে বড় বড় ছিদ্র আজিও রহিয়াছে। যে গৃহে কামানের গোলা লাগিয়া লরেন্সের মৃত্যু হইয়াছিল, যেখানে অস্ত্র-শস্ত্র রাখা হইয়াছিল, আহতদিগের জন্য সেখানে হাঁসপাতাল হইয়াছিল, সে সকল স্থান দেখিলাম। মৃত্তিকার নিম্নে একটি ঘরে শিশু ও রমণীদিগকে রাখা হইয়াছিল ;

কিন্তু সেখানেও কামানের গোলা প্রবেশ করিয়া কয়েকজনকে বিনষ্ট করে। সেই ঘরে এখনও স্থানে স্থানে রক্তের দাগ দেখা যায়। ইহার নিকটেই যুদ্ধে হত বীরগণের সমাধি স্থান। নীল, আউটরাম, প্রভৃতি বিখ্যাত যোদ্ধাগণের স্মৃতিস্তম্ভ দেখিলাম। ইংরাজদিগকে বিদ্রোহী সিপাহীদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে গিয়া সার হেনরী লরেন্সের প্রাণ যায়। তাঁহার সমাধির উপরে শুদ্ধ এই কথা লিখিত আছে "ইনি স্বীয় কর্তব্য পালন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।" এই সকল দেখিতে দেখিতে মনে গভীর বিষাদের আবির্ভাব হইল, আমরা বিষাদপূর্ণ হৃদয়ে গৃহে ফিরিলাম।

মান্দ্রাজ ভ্রমণ

ম্যাপে দেখিয়া বুঝিতে পারিবে, বঙ্গদেশ হইতে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি কত দূরে। ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভাগ প্রায় সমুদয়ই মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী, তিন দিকে সমুদ্র। উত্তরে দাক্ষিণাত্যের কিয়দংশ। এই সীমার অন্তর্গত দেশগুলিকে মান্দ্রাজ প্রেসীডেন্সী কহে। প্রধান নগর মান্দ্রাজ শহরটি সমুদ্রতীরে অবস্থিত। মান্দ্রাজ যাইবার দুইটি পথ আছে, স্থলপথে যাইতে হইলে, হাওড়া ষ্টেশনে রেলগাড়ীতে উঠিয়া পুনা পর্যন্ত যাইয়া, সেখান হইতে পুনরায় রেল গাড়ীতে মান্দ্রাজ যাইতে হয়। ইহাতে পথ কষ্ট অধিক, এবং যাইতে প্রায় ছয় দিন লাগে, সমুদ্র পথে বিশেষ কোন কষ্ট নাই, কলিকাতায় জাহাজ উঠিয়া চারিদিনের দিন মান্দ্রাজ পেঁছান যায়। যাঁহাদের পূর্বে সমুদ্র দেখা হয় নাই, তাঁহারা এই সুযোগে সমুদ্র দেখিয়া লইতে পারেন। বাল্যকালে সমুদ্রের বর্ণনা পড়িয়া ও শুনিয়া সমুদ্র দেখিবার ইচ্ছা আমার মনে খুব প্রবল ছিল। সুতরাং সমুদ্র পথেই মান্দ্রাজ যাত্রা করিলাম।

জাহাজ চড়িয়া ক্রমে যখন সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী হইলাম, তখনকার আনন্দ বর্ণনা করিতে পারি না। নদীর জল যেখানে সমুদ্রের গাঢ় নীল জলের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে, সে স্থানে স্পষ্ট দুইটি বিভিন্ন জলস্রোত দেখা যায়,—একদিকে নদীর কর্দমময় জল, অপর দিকে সমুদ্রের পরিষ্কার গাঢ় নীল জল, গঙ্গাসাগর ছাড়াইলেই জাহাজের লোকদের তীরের সহিত শেষ দেখা,—তার পরই অকূল সমুদ্র! পার নাই, কিনারা নাই—যেদিকে চাই কেবল তরঙ্গময় জলরাশি! ঝড় না থাকিলে সমুদ্র যাত্রা বড় সুখকর। রাত্রিতে সমুদ্রের যাত্রা বড় সুখকর। রাত্রিতে সমুদ্রের জলে আশ্চর্য দৃশ্য দেখা যাইত! জাহাজের সংঘর্ষণে জলে যেন শত শত আলো জ্বলিয়া উঠিত। সমুদ্রে একপ্রকার জীবাণু আছে; তাহারা জাহাজের আঘাতে জোনাকীর ন্যায় জ্বলিয়া উঠে, তিনদিন, দিন রাত্রি চলিয়া রাত্রিতে জাহাজ মান্দ্রাজ পেঁছিল। রাত্রিতে বন্দরে প্রবেশ করিবার নিয়ম নাই; এজন্য বন্দরের বাহিরে নঙ্গর ফেলিয়া রহিল, আমরা সেই রাত্রেই কেবিনের গবাক্ষ দিয়া মান্দ্রাজের আলোক স্তম্ভ দেখিলাম। মান্দ্রাজ উপকূলস্থ

জলমগ্ন বালুকা দ্বীপের উপর পতিত হইয়া অনেক জাহাজ বিনষ্ট হয় বলিয়া এই আলোক স্তম্ভটি নির্মিত হইয়াছে। পরদিন প্রাতে জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করিল; আমরা তাড়াতাড়ি ডেকের উপর উঠিয়া দেখিলাম; নূতন দেশে আসিয়াছি। ক্ষুদ্র নৌকার সারি পিপীলিকার ন্যায় জাহাজখানিকে ঘিরিয়া ফেলিল। নৌকাগুলি নূতন ধরনের, লোকগুলির চেহারাও বেশ নূতন ধরনের। ছবিতে ইহাদের বেশ ও নৌকার আকৃতি দেখিতে পাইবে। যে নৌকাগুলিতে ৮/১০ জন মাঝি দেখিতেছ, সেগুলি আরোহীদের জন্য, আর পাশাপাশি তিন চারিটা তালগাছ বাঁধা ছোট ছোট নৌকাগুলি জাহাজে খাদ্যাদি আনিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই ক্ষুদ্র নৌকাতে চড়িয়াই জেলেরা সমুদ্রে মাছ ধরিতে যায়, এই নৌকার নাম "কাটামারান"। কিরূপে এই কাটামারানে চড়িয়া জেলেরা দিনরাত্রি সমুদ্রে কাটায় ভাবিলে আশ্চর্যবোধ হয়। অভ্যাসবশতঃ ইহাদের মনে কোন ভয় নাই। আর এ নৌকার ডুবিবারও কোন সম্ভাবনা নাই; কারণ যে অবস্থায়ই পড়ুক না কেন, নৌকাগুলি ভাসিবেই। আমি অনেকবার লোকজনসহ নৌকা উল্টাইতে দেখিয়াছি, কিন্তু কাহারও প্রাণ নষ্ট হয় নাই।

আমরা একখানা বড় নৌকা করিয়া তীরে পেঁছিলাম; এখন বন্দর নির্মিত হওয়াতে তীরে উঠা সহজ হইয়াছে, কিন্তু পূর্বে তত সহজ ছিল না। এক একবার ঢেউ আসিয়া নৌকা ঠেলিয়া তীরে না লইয়া গেলে, মাঝিদের সাধ্য নাই যে, নৌকা তীরে লইয়া যায়। তাহার পরেও মাঝিদের কাঁধে চড়িয়া শুষ্ক স্থানে নামিতে হয়। এখনও যাহারা বন্দরের টেক্স দিতে না চান, তাঁহারা ঐ প্রণালীতে তীরে উঠিতে পারেন। তীরে উঠিয়া প্রথমেই মান্দ্রাজীদের ভাষা কানে ঠেকিল। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে চারিটি ভাষা প্রচলিত, উত্তর পূর্ব দিকে তেলেগু ভাষা, দক্ষিণ পূর্বে তামিল ভাষা, উত্তর পশ্চিম 'কেনেরিস' এবং দক্ষিণ পশ্চিমে 'মালায়ালাম'। এই সকল ভাষাকে দ্রাবিড়ী ভাষা বলে। নিজ মান্দ্রাজে তামিল ভাষা ব্যবহৃত হয়। কেনেরিস ভাষা ব্যতীত অন্যানা ভাষাগুলি আমাদের কানে বড় কর্কশ বোধ হয়। ইহাদের ভাষা না জানিলেও বিদেশীদের কলিকাতায় আসিলে, কেমন অসুবিধা হয়, মান্দ্রাজে তেমন হয় না, কারণ সকলেই প্রায় কাজ চালান ধরণের এক একটু ইংরেজী জানে।

তীরে উঠিয়া প্রথম দৃশ্য, মান্দ্রাজের দুর্গ "ফোর্ট সেণ্ট জর্জ"। ছবিতে এই দুর্গ ও দুর্গের মধ্যস্থিত নিশান স্তম্ভ দেখিতে পাইবে।

ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জের সময় (১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে) এই দুর্গ নিমিত হয়। প্রথম যখন ইংরাজেরা বাণিজ্য করিবার জন্য রত্নগিরির রাজার নিকট হইতে সামান্য ভুমিখণ্ড গ্রহন করেন, তখন তাঁহাদের আত্মরক্ষার সামান্য উপায় ছিল মাত্র। মহারাষ্ট্রগণ যখন দাক্ষিণাত্যে প্রবল হইয়া উঠিল তখন; (১৭৪১ খৃঃ অব্দে) তাহারা মান্দ্রাজস্থ ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত হন, তাহার পর ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা একবার মান্দ্রাজ অধিকার করেন। পরে ইংরাজেরা ফরাসীদিগকে পরাস্ত করিয়া আত্মরক্ষার জন্য দুর্গ নির্মান করিতে আরম্ভ করেন; ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে বর্তমান দুর্গ নির্মিত হয়। ভাবিলে অবাক হইতে হয়, একটি ক্ষুদ্র সহর হইতে এখন কত বড় একটা

প্রেসিডেন্সি গঠিত হইয়াছে! সমুদ্র তীরে দুই মাইল জুড়িয়া সেনেট হাউস হাইকোর্ট, হোটেল গবর্ণমেন্ট হাউস, প্রেসিডেন্সী কলেজ প্রভৃতি সুবৃহৎ অট্টালিকা সকল শোভা পাইতেছে। শহরে উঠিয়া দুর্গ ছাড়াইলেই ব্লাকটাউন বা কাল শহর। এখানে শহরের যত দোকান পাট,— অনেকটা কলিকাতার চাঁদনী এবং বড় বাজারের ন্যায়। এই স্থানে অনেক মাদ্রাজী ও ফিরিঙ্গী বাস করে। শহরের এই অংশকে কেন এই কুৎসিত নাম দেওয়া হইয়াছে বুঝিতে পারিলাম না। মাঝে মাঝে এক একটি ইংরাজ পল্লী— আবার এক একটি গ্রাম ও শস্য ক্ষেত্র— এইরূপ ২৭ বর্গমাইল স্থানে শহরটি বিস্তৃত। শহরের মধ্যদিয়া "কুয়াম" নামে খালের ন্যায় একটি ছোট নদী বহিয়া যাইতেছে; শহরের মধ্যে যাতায়াত করিতে হইলে অনেকবার নদীর উপরস্থ সেতু পার হইতে হয়।

শহরের মধ্যে দেখিবার স্থান "পিপ্‌ল্‌স পার্ক" বা জনসাধারনের উদ্যান, মিউজিয়াম এবং বোটানিকেল গার্ডেন, তাহাও কলিকাতার তুলনায় বেশী কিছু নহে। যাঁহারা জাহাজ হইতে নামিয়া শহর ভ্রমণ করিতে বাহির হন, 'তাঁহারা শহরের ধূলা ও রৌদ্র ভোগ করিয়া মান্দ্রাজের যথেষ্ট নিন্দা করেন, কিন্তু যাঁহারা অধিক দিন মান্দ্রাজে থাকিয়া মান্দ্রাজের অভ্যন্তরস্থ গ্রাম্য শোভা এবং অপরাহ্নে সমুদ্রতীরের শোভা সম্ভোগ করিয়াছেন; তাঁহাদের নিকট মান্দ্রাজ তত খারাপ বোধ হয় না। সমুদ্রতীরে কলিকাতার ইডেন গার্ডেনের ন্যায় বাদ্যস্থান আছে, এখানে অপরাহ্নে শহরের সম্ভ্রান্ত লোকেরা বেড়াইতে আসেন। সমুদ্রতীরে বালুকা রাশির মধ্যে নামিয়া শামুক কুড়ানো একটা প্রধান আমোদ। মান্দ্রাজের মিউজিয়াম নানা রকমের বিচিত্র শামুক ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী অনুসারে বিভক্ত রহিয়াছে, তাহা দেখিলে শামুক কুড়ানো এক নেশা হইয়া দাঁড়ায়। অনেক ইংরাজ বালক বালিকা এমন কি বড় বড় লোক এই প্রকারে আমোদ লাভ করেন।

মান্দ্রাজে স্কুল কলেজের সংখ্যা কলিকাতার ন্যায় এত অধিক না হইলেও কতকগুলি ভাল ভাল কলেজ আছে। তাহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ডাক্তার মিলার সাহেবের খৃষ্টান কলেজ, সরকারি প্রেসিডেন্সি কলেজ ও জনসাধারণের "পাচিয়াপা" কলেজই প্রধান। "পাচিয়াপা" নামে একজন মান্দ্রাজী ভদ্রলোক কলেজ নির্ম্মানার্থ ও কলেজের ব্যয় সঙ্কুলনার্থ কয়েক লক্ষ টাকা দান করিয়া যান। কলেজের সংলগ্ন সাধারণের বক্তৃতা প্রভৃতির জন্য "পাচিয়াপার হল" নামে একটি হল আছে। মান্দ্রাজীদের আচার ব্যবহার ও খাদ্য বাঙ্গালীদের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। জাতি বিচারের কঠিন নিয়মগুলি এখনও রক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, এই তিন বর্ণ ব্যতীত 'পারিয়া' নামে আর এক নীচ জাতি আছে তাহারা আমাদের দেশের মুচি হইতেও ঘৃনার পাত্র, এই জাতি এখন দলে দলে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নিজেদের উন্নতি সাধন করিতেছে।

সাধারণতঃ মান্দ্রাজীরা চামড়ার জুতা ব্যবহার করে না; হয় শূণ্য পদে না হয় কটকী জুতার ন্যায় চটি পরিয়া রাস্তায় বাহির হয়। পুরুষেরাও স্ত্রী লোকেদের ন্যায় লম্বা চুল রাখে, কানে অলঙ্কার পরে, কাহার কাহারও হাতে বালাও দেখিয়াছি। পুরুষেরা যখন স্নানান্তে অনাবৃত পদে কোট পেন্টলুন পরিয়া চুল শুকাইতে শুকাইতে

রাস্তা দিয়া চলিয়া যান তখন সেই দৃশ্য বড় অদ্ভুত দেখায়। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে বঙ্গদেশের ন্যায় স্ত্রীলোকদের অবরোধ প্রথা নাই; সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্ত্রীলোকেরা বাহিরে যান না বটে, কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবারের স্ত্রীলোকদের আবশ্যক মত বাহিরে যাইতে দেখিয়াছি। ইহাদের মধ্যে কফি খাওয়ার নেশা দেখিয়া আশ্চর্যবোধ হইয়াছিল। সমস্ত দিন ইহাদের বাড়ীতে হাঁড়িতে কফি প্রস্তুত থাকে, নিজেরাও বার বার কফি পান করেনই, অতিথি অভ্যাগত আসিলেই তাঁহাদেরও কফি পান করিতে অনুরোধ করেন।

বিস্তৃত শহর বলিয়া বাড়ীতে লোকজনের কোলাহল বা গাড়ী ঘোড়ার শব্দ অধিক শুনা যায় না। আমি যখন মান্দ্রাজ ছিলাম, তখন রাস্তাতে গ্যাসের আলো ছিল। আজকাল শুনিয়াছি, ইলেকট্রিসিটি দ্বারা ট্রামগাড়ী চালিত হয়; ইহা সত্ত্বেও বাহ্য উন্নতিতে মান্দ্রাজ যে বোম্বাই ও কলিকাতা অপেক্ষা হীন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মান্দ্রাজ বিষুবরেখার নিকট বলিয়া এখানে শীত গ্রীষ্মের বৈষম্য নাই। শীত একেবারেই নাই; সমস্ত বৎসর ধরিয়া একই রকম গ্রীষ্ম। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে মুসলমানদের প্রভাব বেশী না থাকাতে হিন্দুকীর্তি সমুদয় অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যেমন প্রতি শহরে মুসলমানদের নির্মিত হর্ম্যাদি দেখা যায়, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে তেমনি হিন্দুদের দেবালয় প্রভৃতির কারুকার্য ও শিল্পনৈপুন্য দেখা যায়। বারান্তরে তোমাদিগকে সেই সব স্থানের কথা জানাইবার ইচ্ছা রহিল।

প্রবন্ধাবলীর সংস্করণের পাদটীকায় উল্লেখ আছে * ব্লাকটাউন—এখন ইহা জর্জটাউন নামে অভিহিত এবং প্রবন্ধটি ১৩০১ সালের মুকুলে প্রকাশিত হয়েছিল।

[প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অবলাদেবী ১৮৮৪ সালে ডাক্তারী পড়ার জন্য কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির জন্য আবেদন করেন। আবেদন পত্রটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভায় আলোচিত হয়। কিন্তু সে আবেদন মঞ্জুর হয়নি। কারণ তখন কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে মেয়েদের ডাক্তারী পড়ার প্রচলন ছিল না। প্রতিবাদে তিনি মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। ১৮৮৫-৮৬ শিক্ষাবর্ষে তিনি সেখানকার ছাত্রী ছিলেন।]

কাশ্মীর

এবার পূজার ছুটিতে আমরা কাশ্মীর বেড়াইতে গিয়াছিলাম। কাশ্মীর ভারতের কোনদিকে তাহা ভারতের ম্যাপে দেখ। তোমাদের মধ্যে যাহারা ভ্রমণ বৃত্তান্ত ভালবাস; তাহাদের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিবার জন্য আমাদের এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে। ইংলণ্ড প্রভৃতি সুসভ্য দেশের বালক বালিকাগণ বাল্যকাল হইতেই ভ্রমণ বৃত্তান্ত পড়িতে ভালবাসে; তাহার সুফল এই হয় যে, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহারা নূতন দেশ আবিষ্কারের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়। উত্তর মেরুদেশ আবিস্কার করিবার জন্য সার জন ফ্রাঙ্কলিনের মত কত লোক অকাতরে প্রাণ দিয়াছেন। আফ্রিকার নানা স্থান আবিষ্কারের জন্য লিভিংস্টোন সাহেব কত শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, কতবার মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এখনও * ন্যানসেন নামক একজন সাহেব গ্রীণল্যাণ্ডের উত্তরে কি আছে তাহা আবিস্কার কীরবার জন্য অনেক পরিশ্রম করিতেছেন, তাহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ করিলে অত্যন্ত আশ্চর্য বোধ হয়। আমাদের এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া এতটা না হইলেও আশাকরি তোমাদের মধ্যে অনেকবার মনে নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া প্রকৃতির শোভা দেখিবার আগ্রহ জন্মিবে।

পূর্বে কাশ্মীর সম্বন্ধে অনেক পুস্তকে অনেক বর্ণনা পড়িয়াছিলাম; শুনিতাম কাশ্মীর নাকি ভূতলে নন্দন কানন। আমার এই সকল কথা অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হইল। হিমালয়ের অনেক দর্শনীয় স্থান ইহার পূর্বেই দেখিয়াছিলাম। কুমায়ূনের তুষার নদী দেখিতে গিয়া প্রকৃতির যে অপূর্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিলাম, তাহার অধিক সৌন্দর্য্য যে আর কোথাও আছে তাহা বিশ্বাস হইত না।

রাউলপিণ্ডি পর্য্যন্ত রেলগাড়ীতে যাইতে হয়, তাহার পর টোঙ্গা গাড়ীতে চড়িতে হয়। তোমাদের মধ্যে যাহারা পশ্চিমে থাক, তাহারা অবশ্যই এই গাড়ী দেখিয়াছ। তিন দিন এই টোঙ্গায় চড়িয়া কত পাহাড় পর্বত ও উপত্যকা পার হইলাম। প্রায় ৫ মাইল অন্তর টোঙ্গার ঘোড়া একবার করিয়া বদলান হয়। এই সকল স্থানে পথিকদের জন্য ধর্মশালা ও খাবার জিনিষের দোকান আছে। এই সকল স্থানে ১০।১৫টা গরুর গাড়ীর গরুগুলি বিশ্রাম করিতে করিতে রোমন্থন করিতেই দেখা যায়। এই নিরীহ পশুগুলি কিরূপে এই সকল গাড়ী ও অসমান পার্বত্য রাস্তা দিয়া এত ভারী বোঝা লইয়া যায়, তাহা ভাবিলে বড় আশ্চর্য বোধ হয়। সকাল বেলা ৭।৮টা হইতে ইহারা ধীরে ধীরে পাহাড়ের উপর উঠিতে থাকে, দুপ্রহরের সময় বিশ্রাম করিয়া, আবার ৩।৪টা হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত এইরূপ কার্য্য করে। গরুর গাড়ী ছাড়া পথে মধ্যে মধ্যে উটের সারি চলিতেছে দেখা যায়। পাঠানেরা ২।৩ পরিবার হইয়া চলে। উটের পিঠে সমুদয়

বোঝা চাপাইয়া দেয়। পথশ্রমে ক্লান্ত স্ত্রীলোকেরা মাঝে মাঝে উটের উপরে চড়িয়া যায়। চলিতে চলিতে শ্রান্ত হইলে ইহারা এক এক স্থানে দীর্ঘ দীর্ঘ ঘাস, পাতাও কাপড় দিয়া তাঁবু প্রস্তুত করিয়া বিশ্রাম করে এবং উটগুলি চারিদিকে চরিয়া বেড়ায়। টোঙ্গা গাড়ীগুলি যেন রাস্তার মালিক, টোঙ্গার বাঁশী বাজিবামাত্র এই উটের সারি গরুর গাড়ী বা এক্কা সকলেই পথ ছাড়িয়া একপাশে গিয়া দাঁড়ায়। টোংগা চলিয়া গেলে পুনরায় মন্থর গমনে চলিতে থাকে। আমরা সমস্ত দিন চলিয়া সন্ধ্যাকালে বিশ্রামের জন্য কোন ডাক বাঙ্গলায় আশ্রয় লইতাম। পরদিন আহারাদির পর আবার যাত্রা করিতাম। পথে যে রমণীয় দৃশ্য দেখিতাম তাহাতে পথের সকল কষ্ট দূর হইত। এক পাহাড় হইতে অন্য পাহাড়ে যাইতে বিচিত্র দৃশ্য দেখিতাম। কোথাও উচ্চ পর্বতের চূড়াগুলি আকাশ ভেদ করিয়া রহিয়াছে। কোথাও শস্যপূর্ণ-শ্যামল ক্ষেত্র বেষ্টিত উপত্যকা রহিয়াছে। নদী কোথাও গভীর গর্জন করিয়া ছুটিতেছে, আবার কোথাও শান্তভাবে বহিয়া যাইতেছে। এই রাস্তার প্রত্যেক সুন্দর স্থানের বর্ণনার স্থান হইবে না। পথে পুরাতন শিখদের দুর্গ, কত ভগ্নমন্দির, কত সুন্দর বৃক্ষ দেখিলাম। অবশেষে আমরা ঝিলাম বা বিতস্তা নদীতে নৌকার আশ্রয় লইলাম। সে নৌকা একটা দেখিবার মত জিনিস, উহাকে ইংরাজীতে House boat বা গৃহনৌকা বলে; ইহাতে ৪।৫টা কুঠুরী। তাহাতে খাট, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি সকল আবশ্যকীয় জিনিষ আছে। আবার শীত নিবারণের জন্য আগুন জ্বালিবার স্থান ও ধোঁয়া বাহির হইবার জন্য চিমনী আছে। আমরা বৃষ্টি বা শীত পড়িলে চিমনীতে আগুন জ্বালিয়া তাহার চারিদিকে বসিয়া গল্প করিতাম বা পুস্তকাদি পাঠ করিতাম। এখন এই গ্রীষ্মের মধ্যে সে সকল বিষয় লিখিতে লিখিতে স্বপ্নরাজ্যের কথা বলিয়া মনে হয়। এই নৌকাগুলি যেমন নূতন রামের ইহাদের চালাইবার ধরনও সেইরূপ। স্রোতের বিপরীত দিকে যাইবার সময় মাঝিরা গুণ-টানিয়া লইয়া যায়। স্রোতের দিকে যাইবার সময় বেশীর ভাগ স্রোতেই ভাসাইয়া লয়। কখনও কখনও লগি দিয়া চালায়। এই লগি চালানকে তাহারা বল্লম লাগান বলে। বড় বড় নৌকাতে প্রায়ই দাঁড় ব্যবহার করে না। নৌকার ভিতরে থাকিয়া নৌকা চলিতেছে কিনা বুঝিতে পারা যায় না। মাঝিরা সন্ধ্যা হইলে আর নৌকা চালায় না। মাঝিরা পরিবার লইয়া নৌকাতেই থাকে এবং স্ত্রীপুরুষ এমনি ৫।৬ বৎসরের শিশুরাও নৌকা চালাইতে সাহায্য করে। আমরা নৌকাতে উঠিয়া দ্বিতীয় দিনে উলার নামে একটা প্রকাণ্ড হ্রদ পার হইলাম, এই হ্রদটি মাঝিরা খুব ভোর রাত্রিতে পার হইতে আরম্ভ করে এবং বড় নৌকার পার হইতে ৬।৭ ঘণ্টা লাগে। মাঝিরা বিকাল বেলা কোন ক্রমেই এই হ্রদ পার হইতে চায় না, বিকাল বেলা এখানে প্রায়ই ঝড় হয় এবং ঝড় হইলে বড় বড় ঢেউ উঠিতে থাকে। একবার নাকি একজন মুসলমান নবাব মাঝিদের নিষেধ না শুনিয়া বিকাল বেলাই হ্রদ পার হইতে চেষ্টা করিয়া কিছুদূর গিয়াই ঝড়ে পড়িয়া বহুসংখ্যক অনুচরসহ জলমগ্ন হইয়াছিলেন।

কাশ্মীরী মাঝিরা ঝড়কে বড় ভয় করে, একদিন একটু সামান্য বাতাস হওয়াতে বিতস্তা নদীতে অল্প অল্প ঢেউ উঠিতেছিল। মাঝিরা তখনই চীৎকার করিয়া, তাড়া-

তাড়ি নৌকা বাঁধিয়া ফেলিল এবং সেদিন আর নৌকা চালাইল না। ইহাদের এত ভয়ের কারণ বুঝিতে পারিলাম না; কারণ নদীটি শরৎকালে এমন ছোট যে, এপারে বসিয়াও ওপারের লোকের সঙ্গে কথা বলা যায় এবং তাহাতে এত অল্প জল যে হাঁটিয়া পার হওয়া যায় তবে সকল স্থানে জল সমান নয় বলিয়া বোধ হয় কেহ হাঁটিয়া পার হইতে চেষ্টা করে না।

আমরা উলার হ্রদ পার হইয়া, পুনরায় বিতস্তা নদীতে পড়িলাম; যতক্ষণ এই হ্রদের মধ্যে ছিলাম, ততক্ষণ মনে হইতেছিল যেন, আমরা সমুদ্র-বক্ষে আছি; বহুদূরে পর্বতমালা দেখা যাইতেছিল, আমরা সমুদ্রের ন্যায় অকুল জলরাশির মধ্য দিয়া যাইতেছিলাম। এখনও সেই প্রকাণ্ড হ্রদ ও দূরবর্তী গিরিশৃঙ্গের দৃশ্য মনে হইলে হৃদয় স্তম্ভিত হয়।

বিতস্তা নদীতে আসিয়াই, মাঝিরা চা খাইবার জন্য বকসিস চাহিল, হ্রদ পার হইতে অত্যন্ত পরিশ্রম হয় বলিয়া এবং নির্বিঘ্নে হ্রদ পার হইয়া বিশেষ সৌভাগ্যের কথা বলিয়াই বোধ হয় এই প্রথা চলিত হইয়াছে।

নদীর দুই পারেই সুন্দর শ্যামল শস্য ক্ষেত্র এবং অনেক দূরে মাঝে মাঝে কৃষকদিগের কুটীর। এক একটা ক্ষেত্রের পর দূর হইতে বৃক্ষশ্রেণী দেখিলে, বুঝিতাম কৃষকপল্লী নিকটেই। এই ক্ষুদ্র প্রশান্ত নদীর তীরস্থিত কৃষকের গ্রামগুলি দেখিলে নূতন দেশে নূতন শান্তিময় কাজে আসিয়াছি বলিয়া মনে হইত।

নদীর দুই ধারে পাহাড়ের সারি। ইহাকে পীলপঞ্জল শ্রেণী কহে। পাহাড়গুলি চিরবরফে ঢাকা রহিয়াছে। কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখর সর্বদা বরফে আচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু মেঘের জন্য সকল দিন তাহা দেখিবার সুবিধা ঘটে না। দার্জিলিং থাকিতে যেদিন কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষারাবৃত শৃঙ্গ দেখিতে পাইতাম, সেদিন কত আনন্দ হইত। কাশ্মীরে দিবা নিশি এই বরফে আচ্ছন্ন শৃঙ্গগুলি দেখা যায়। যতদূর দৃষ্টি চলে দিগন্তব্যাপী বরফের স্তূপ। এই বরফ রাশিতে সূর্যকিরণ পড়িলে এক নূতন সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়। কখন সোনালী রঙ্গে, কখন উজ্জ্বল রৌপ্য বর্ণে, আবার কখন বা গোলাপী আভাতে ঝক্ ঝক্ করিতে থাকে।

পরদিন আমরা সম্বল নামক স্থানে রাত্রি যাপন করিলাম। দূর হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চেনার গাছ দেখিয়া বুঝিলাম গ্রাম নিকটেই। চেনার গাছগুলি অনেকটা অশ্বত্থগাছের মত; তাহা হইতেও অনেক দীর্ঘ ও বিস্তৃত। কাশ্মীর ভিন্ন আর কোথাও এই গাছ জন্মে না। এখানে ইহাকে বৃক্ষরাজ (Royal tree) বলে। রাজার আদেশ ভিন্ন কেহ ইহার ডাল ভাঙ্গিতে পারে না। সম্বলে রাত্রি যাপন করিয়া আমরা পরদিন প্রত্যূষে মানসবল নামক একটি হ্রদ দেখিতে গেলাম। এই হ্রদে প্রবেশ করিবার পথ বড় সংকীর্ণ। আমাদের নৌকা বড় বলিয়া আমরা হাঁটিয়া যাওয়াই স্থির করিলাম। পাহাড়ের উপরে কয়েকটি গ্রাম ও শস্যক্ষেত্রে পার হইয়া—মানসবলে পেঁছিলাম। হ্রদের পারে অল্প জলের মধ্যে অনেকগুলি দেশীয় ক্ষুদ্র ঘোড়া হাঁসের মত জলের মধ্যে মাথা ডুবাইয়া ডুবাইয়া কি খাইতেছে দেখিয়া আমাদের বড় হাসি

পাইল। পরে জানিলাম ইহারা এক প্রকার জলজ উদ্ভিদ খাইতেছে। মানসবলের তট দিয়া হাঁটিয়া গিয়া আমরা ফকীরের গুহাতে উপস্থিত হইলাম। বহুদিন পূর্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট এই গুহার কথা শুনিয়া অবধি ইহা দেখিবার খুব ইচ্ছা ছিল। মহর্ষি যখন কাশ্মীরে বেড়াইতে যান, তখন এই সাধু জীবিত ছিলেন এবং প্রত্যহ এক কোদালী মাটি কাটিয়া নিজের সমাধি প্রস্তুত করিতেছিলেন। আমরা গিয়া শুনিলাম যে, দুই বৎসর হইল সাধুর মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহাকে গুহাতে কবরস্থ না করিয়া নিকটবর্তী কোন স্থানে সমাধি দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার সমাধির উপরে পেয়ারা, আপেল, পিচ প্রভৃতি নানাবিধ গাছ রোপিত হওয়াতে স্থানটি অত্যন্ত রমণীয় হইয়াছে। আমরা আলোক লইয়া গহ্বরটী দেখিলাম। গুহাটি ২০।২৫ হাত লম্বা। আসিবার সময় সাধুর পুত্র আমাদিগকে অনেক ফল উপহার দিলেন। জেলে ডিঙ্গীর মত ছোট নৌকায় আমরা মানসবল ত্যাগ করিয়া গৃহ-নৌকাতে ফিরিলাম। হ্রদের জল এত নির্ম্মল ও স্বচ্ছ যে, হ্রদের অবস্থিত সবুজবর্ণ শেওলাগুলি পর্যন্তও স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। এই হ্রদের মধ্যে স্থানে স্থানে পদ্মবন। যখন পদ্মগুলি ফুটে তখন না জানি হ্রদের শোভা আরও বৃদ্ধি পায়। হ্রদের এক পার্শ্বে নূরজাহানের প্রমোদ কাননের ভগ্নাবশেষ দেখিলাম; কাশ্মীরের মধ্যে যে যে স্থান প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাত, সেই সেই স্থানে নূরজাহান প্রমোদ ভবন নির্মাণ করিয়াছিলেন, এখনও শ্রীনগরে সেই সকল গৃহ সুরক্ষিত আছে।

পরদিন পূর্বাহ্ণে সাদিপুর নামক স্থানে পেঁছিলাম। এখানে সিন্ধু নামে ক্ষুদ্র নদী বিতস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে। মিলনের মধ্যস্থলে জলের মধ্যে একটি কৃত্রিম দ্বীপে একটি চেনার বৃক্ষ রোপিত আছে। দুই নদীর সঙ্গম-স্থল বলিয়া এস্থান কাশ্মীর বাসীদিগের নিকট পবিত্র বলিয়া গণ্য। তাহারা এখানে স্নান ও পূজা করিয়া কৃতার্থ হন। সন্ধ্যার সময় নৌকার ছাতে বসিয়া সুদূরে বহুগৃহে সমাকীর্ণ নগর দেখিতে পাইলাম, বুঝিলাম, উহাই শ্রীনগর। শ্রীনগর কাশ্মীরের রাজধানী। কাশ্মীরের মহারাজ গ্রীষ্মকালে এবং শীতকালে জম্বুতে বাস করেন। শ্রীনগর শহরটি বিতস্তা নদীর দুই পারে তিন মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সাধারণতঃ নৌকাতেই উভয় পারে যাতায়াত সম্পন্ন হয়, উভয় পারে অসংখ্য নৌকা। গাড়ীর পরিবর্তে শ্রীনগরে নৌকাই ব্যবহৃত হয়। উভয় পারে যাতায়াতের সুবিধার জন্য ৭টি সেতু আছে বটে, কিন্তু নৌকার প্রচলনই অধিক। এক একটি ধনীর নৌকা দেখিবার মত জিনিষ। নানাবর্ণে চিত্রিত ও কারুকার্যে মণ্ডিত নৌকার মধ্যে কাশ্মীরি পণ্ডিতেরা বেশভূষা করিয়া বিচিত্র আসনে বসিয়া আছেন, এবং ২০।২৫ জন মাঝি তালে তালে দাঁড় ফেলিয়া বিদ্যুৎ বেগে শত শত নৌকার মধ্য দিয়া নৌকা বাহিয়া যাইতেছে, দেখিতে খুব সুন্দর।

আমাদের নৌকা শ্রীনগরে উপস্থিত হওয়া মাত্র ব্যবসায়ীরা নৌকা করিয়া তামা, রূপা ও কাগজের বাসনপাত্র ও কাশ্মীরি শাল লইয়া আমাদের নৌকার চারিদিকে আসিয়া উপস্থিত লইল। নৌকাতে বসিয়াই আমরা কাশ্মীরের সমুদয় শিল্পদ্রব্য দেখিলাম।

শ্রীনগরের যেদিকে ইংরাজেরা বাস করেন, সে দিকটা খুব পরিস্কার ; চেনার, সফেদা প্রভৃতি গাছ সারি সারি থাকাতে সেই স্থানের খুব শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। স্থানটির নাম মুন্সীবাগ। শ্রীনগরের নিকটে তাঁবু ফেলিয়া অনেক সাহেব বাস করেন, তাঁহাদের ব্যবহারের জন্য মহারাজা সুন্দর সুন্দর স্থান নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন।

আমরা পরদিন ডাল হ্রদ দেখিতে গেলাম। ইহা একটি প্রকাণ্ড হ্রদ, বিতস্তা নদী হইতে ডালহ্রদে যাইবার জন্য খাল কাটান আছে। অনেকে ডালহ্রদে বেড়াইতে যান ; ইহা শ্রীনগরের একটি প্রধান দর্শনীয় স্থান। এই হ্রদের পারে সালিমার বাগ, নাসিম বাগ, নিসাত বাগ প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর প্রাচীন উদ্যান রহিয়াছে। সালিমার বাগ নূরজাহানের আদেশে নির্মিত হইয়াছিল। হ্রদ হইতে সালিমার বাগে প্রবেশ করিবার জলপ্রাণালীর দুই পার্শ্বে সারি সারি উইলো গাছ জলে নুইয়া পড়িয়াছে। সেস্থান দিয়া আমাদের ছোট নৌকা সালিমার বাগে প্রবেশ করিল। লাহোরের সালিমার বাগের আদর্শে এই উদ্যান নির্মিত হয়। সেরূপ সিঁড়ির ধাপের মতন ৭টি ধাপে এই বাগান নির্মিত! প্রমোদ গৃহের চারি পার্শ্বে ফোয়ারা পড়িবার বন্দোবস্তো পূর্বের মতনই রহিয়াছে। গৃহে বসিয়াই হ্রদের সৌন্দর্য্য এবং অদূরে বরফের শোভা সম্ভোগ করা যায়। আমরাও এই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে করিতে, পুরাতনকালের কথা স্মরণ করিয়া সালিমারের শিল্পচাতুর্য্যের এবং নূরজাহানের রুচির প্রশংসা করিতে লাগিলাম। আর একদিকে পরিমহল মানে মুসলমানদের সময়ের একটি মানমন্দির আছে। তাহার নিকটে চসমাসহি নামে বিখ্যাত নির্ঝরিণী। পূর্বে এই নির্ঝরিণীর জল কেবল শ্রীনগরের সম্ভ্রান্ত লোকেরা পান করিতেন ; এখন এই জল নল দিয়া শ্রীনগর সহরে লওয়া হইয়াছে, এবং সকলেই তাহা পান করিতে পারে।

ডালহ্রদের আর একদিকে একটি গ্রামে হাজরত বালু নামে একটি মসজিদ আছে। এখানে মহম্মদের মাথার চুল রক্ষিত আছে বলিয়া প্রবাদ আছে। নির্দিষ্ট সময়ে এখানে বহুলোকের সমাগম হয়। ডালহ্রদে প্রবেশ করিতেই ডানদিকে 'টাখ্‌ত সলিমন' নামক ক্ষুদ্র পর্বত। ইহার শিখরে একটি পুরাতন মন্দির আছে, কেহ কেহ বলেন এই মন্দিরটি শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ; এজন্য ইহার আর এক নাম শঙ্করাচার্য্য। এই পাহাড়ে উঠিলে শ্রীনগর শহরটি পরিস্কার দেখা হায়। ডালহ্রদ হইরে আর একটি ক্ষুদ্র পর্বতে যাওয়া যায় ; তাহার নাম হরি পর্বত। এই পর্বতের উপর মহারাজার দুর্গ,—তাঁহার অস্ত্র-শস্ত্রও এখানে রক্ষিত হয়। ডালহ্রদের মধ্যেও অনেক পদ্মবন ; কয়েকদিন হইল ফুল ফুটিয়া গিয়াছে মনে হইল। ফুলের বোঁটাগুলি তখনও পাতার মধ্যে খাড়া রহিয়াছে। তাহা ছাড়া এই হ্রদ ভাসমান ক্ষেত্র (Floating gardens) এক অপূর্ব জিনিস ; পানা ও শেওলার উপর মাটি ফেলিয়া এই বাগান প্রস্তুত করা হইয়াছে ; ইহাতে তরমুজ, ফুটি, বিলাতি বেগুন প্রভৃতি তরকারী প্রস্তুত হয়, মালী ইচ্ছামত এই ক্ষেত হ্রদের যেস্থানে ইচ্ছা লইয়া যাইতে পারে। এই হ্রদটি এত বড় যে, একদিনে ইহার দর্শনীয় স্থানগুলি দেখা যায় না। শ্রীনগর হইতে আমরা ইসলামাবাদে গেলাম। পথে অবন্তীপুর ও পাণ্ডত্তণ নামক দুই স্থানে প্রাচীন মন্দির দেখিতে নামিয়াছিলাম।

ইসলামবাদ কাশ্মীরের একটি প্রধান বাণিজ্য স্থান ; ঝিলাম নদী এখান হইতেই বড় হইয়াছে ; ইহার পর আর নৌকাতে যাওয়া যায় না। আমরা ইসলামাবাদ হইতে ডাণ্ডিতে ভাওয়ান, মার্ত্তণ্ড, আচ্ছাবল, ভেরানাগ প্রভৃতি স্থানে দেখিতে গিয়াছিলাম। ভাওয়ান ইসলামাবাদের অতি নিকটে, এখানে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস, এখানে একটি প্রস্রবণের জল বাঁধাইয়া তাহাতে অনেক মাছ রাখা হইয়াছে; অমরনাথ যাত্রীরা এই রাস্তাতে যান এবং এখানে বিশ্রাম করেন। যাত্রীদের জন্য প্রস্রবণের পাশে একটি ধর্মশালা নির্মিত হইয়াছে। পাহাড়ের নীচ হইতে ক্রমাগত জল বাহির হইতেছে দেখা যায়।

পথে মার্ত্তণ্ড নামে একটি পুরাতন মন্দির দেখিলাম। ইহা সহস্র বৎসর পূর্বে সূর্যের পূজার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছিল। এখনও তাহার ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে, এই মন্দির দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কাশ্মীর দেশ সমগ্রই এককালে একটি প্রকাণ্ড হ্রদ ছিল ; চতুর্দিকে জলের মধ্যে উচ্চতম শিখরে এই মন্দির নির্মিত হইয়াছে। আচ্ছাবল ও ভেরানাগ, এই দুই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবর্ণনীয় ; এই দুই স্থানেও নূরজাহানের প্রমোদ-গৃহ আছে। আমাদের সময় বেশী না থাকাতে এখান হইতেই আমাদের ফিরিতে হইল, নতুবা কাশ্মীরে দর্শনীয় আরও অনেক স্থান আছে। যদি আবার কখনও যাইবার সুবিধা হয়, তবে সেই সব স্থানের বিষয় তোমাদিগকে জানাইব।

[এটি ১৩০২ সালের লেখা। পাদটীকাটি প্রবন্ধাবলী পুস্তকের]

ভেনিস

ইটালীতে ভ্রমণ করিবার সময় একদিন অপরাহ্নে আমাদের রেলগাড়ী জলরাশির মধ্যে সুদীর্ঘ সেতুর উপর দিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতেছিল।

প্রথমতঃ এই দৃশ্যে একটু উদ্বিগ্ন হইলাম। পরে কৌতূহল ও বিস্ময়ে সেই ফেনিল জলরাশির সৌন্দর্য অনুভব করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল, আমাদের গাড়ী ষ্টেশনে পেঁছিল। অন্যান্য ষ্টেশনে ঘোড়ার গাড়ী থাকে কিন্তু এখানে গাড়ী চলে না। অন্যান্য শহরের ন্যায় এখানে রাস্তা নাই—এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে হইলে, খাল দিয়া যাইতে হয়। নৌকা এদেশের বাহন। এদেশের নৌকাকে 'গণ্ডোলা' বলে। ষ্টেশনে অনেক গণ্ডোলা যাত্রীদের আশায় অপেক্ষা করিতেছিল। মাঝিরা দেখিতে দেখিতে আমাদের জিনিষপত্র নৌকায় উঠাইয়া লইল। রাত্রিকালে অপরিচিত জলরাশির মধ্য দিয়া কোথায় যাইতেছি ভাবিয়া শঙ্কিত হইলাম।

নৌকাখানি কিন্তু অত্যন্ত দ্রুতগতিতে নিঃশব্দে বৃহৎ খাল হইতে ছোট ছোট কতকগুলি খাল অতিক্রম করিয়া হোটেল অভিমুখে চলিল।

এই জলময় নগরটির উৎপত্তির বৃত্তান্ত শুনিলে আরব্য উপন্যাসের গল্প বলিয়া মনে হইবে। সমুদ্রে প্রবাল-দ্বীপ যেমন একটু একটু করিয়া পরে বৃহৎ হইয়াছে। ভেনিস শহরটিও সেইরূপ সমুদ্র মধ্যে সৃষ্ট হইয়াছে। এখন ভেনিসকে 'এড্রিয়াটিক সাগরের রাণী' বলে, কিন্তু পূর্বে ইহার অস্তিত্বই ছিল না।

মনুষ্য স্বীয় বুদ্ধিবলে ঐ এড্রিয়াটিক সাগরের সহিত যুদ্ধ করিয়া সমুদ্র মধ্যে ভেনিস শহর নির্মাণ করিয়াছে। মানুষ মানুষের নিকট জমি কাড়িয়া লয়, কিন্তু মানুষ সমুদ্র হইতে তাহার অংশ কাড়িয়া লইয়া রাজ্য বৃদ্ধি করে, এমন কখনও শুনিয়াছ কি? ভেনিস তাহার দৃষ্টান্ত।

'আল্প' ও 'টাইরল্' হইতে ছয়টি স্রোতস্বিণীর জল এস্থানে সাগরের সহিত মিলিত হইত, ক্রমে তাহাদের মৃত্তিকা ও বালুকার স্তূপ জমিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ গঠিত হইতে লাগিল। ভাটার সময় দ্বীপগুলি ভাসিয়া উঠিত, আবার জোয়ারের সময় ডুবিয়া যাইত। এরূপ স্থানে কেহ ইচ্ছা করিয়া বাস করে না, কিন্তু বিপদে পড়িলে লোকের বুদ্ধি খুলিয়া যায়। ভেনিস নামে এক জাতীয় লোক পাহাড় হইতে শত্রুর তাড়নায় পলায়ন করিয়া এই জলমগ্ন দ্বীপে আশ্রয় লয়। তাহারা চতুর্দিকে কাঠের খুঁটি পুতিয়া দ্বীপ-গুলিকে বাসস্থানের উপযুক্ত করিয়া লইল। চারিদিকে জল, সুতরাং শত্রুরা এখানে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিল না।

ক্রমে লোকসংখ্যা বাড়িতে লাগিল সেই সঙ্গে সঙ্গে শহরটিও বাড়িতে লাগিল। এরূপে ক্ষুদ্র স্থানটি বৃহৎ হইয়া উঠিল। তখন সকলে মিলিয়া একজন রাজা মনোনীত করিয়া, বাণিজ্য ও রাজ্য বিস্তার করিতে মনোনিবেশ করিল।

রাজা প্রথমে দেশ রক্ষার বন্দোবস্ত করিলেন। সেতু দ্বারা দ্বীপগুলি একত্র করা হইল, যাতায়াতের সুবিধার জন্য খাল কাটান হইল। সমুদ্রের ঢেউ যাহাতে শহরটিকে ভাসাইয়া না লইতে পারে, এজন্য বড় বড় বাঁধ প্রস্তুত হইল। দেখিতে দেখিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটিরগুলি শ্বেত প্রস্তরের হর্ম্যে পরিণত হইল। ভেনিস অতি শীঘ্রই বাণিজ্যে প্রাধান্য লাভ করিল।

ক্রমে প্রচুর ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া ভেনিস ইয়োরোপের সকল জাতির মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিল। ১৩ শত বৎসর অতুল খ্যাতি ও প্রাধান্য লাভ করিয়া ১৭৯৭ খৃঃ অব্দে এই দেশ ফরাসীদের হস্তগত হয়। ভেনিসের ইতিহাস পাঠ করিলেও তাহার পুরাতন কীর্তির কথা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

আমরা একখানি ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া শহর ভ্রমণে বাহির হইলাম। পূর্বেই বলিয়াছি, ভেনিসে ঘোড়ার গাড়ী নাই, নৌকা ভেনিসবাসীদের প্রধান বাহন। এই নৌকাগুলির বিষয় কিছু লিখিতেছি। এক এক জন মাঝি কাল কাপড় পরিয়া, এক এক খানি দাঁড় হাতে লইয়া, কাল মখমলে মণ্ডিত এই গণ্ডোলাগুলিকে অতি ক্ষিপ্রগতিতে চালাইয়া থাকে। পূর্বে নগরবাসীরা নিজ নিজ গণ্ডোলা বহু মূল্যে আস্তরণে সজ্জিত করিত;

কিন্তু কোন কারণে ৪ শত বৎসর পূর্বে নিয়ম হইল, যে সকল গণ্ডোলাই কৃষ্ণবর্ণ কাপড়ে আচ্ছাদিত করিতে হইবে। সেই অবধি এখন পর্যন্ত গণ্ডোলাগুলি কাল মখমলে মণ্ডিত। কেবলমাত্র বিদেশীর রাজদূতের গণ্ডোলা রঙ্গিন বস্ত্রে আচ্ছাদিত। ভেনিসবাসীরা ষড়যন্ত্র করিতে বিশেষ পটু। অন্ধকার রাত্রিতে কাল রঙের নৌকায় নিঃশব্দে যাতায়াত করে, কেহ লক্ষ্য করিতে পারে না। অন্যদিকে বিদেশী রাজদূতের নৌকা বিশেষরূপ সজ্জিত বলিয়া, তাহার গতিবিধি সহজেই জানা যায়। মাঝিরা এক এক দাঁড় লইয়া কত দ্রুত গতিতে যাতায়াত করে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। বহুসংখ্যক নৌকার মধ্যে অবাধে চলিয়া যায়, কোন বিপদ ঘটে না।

আমরা 'সেন মার্কো' নামক স্থানে গেলাম। ইহা একটি চতুষ্কোণ উন্মুক্ত স্থান। ইউরোপে এই স্থানটি অতিশয় বিখ্যাত। এই স্থানে সন্ধ্যার সময় সম্ভ্রান্ত লোকের সমাগম হয়; হাজার হাজার লোক সন্ধ্যাকালে এখানে আসিয়া চা, কফি পান করেন ও গল্প করেন। ভেনিস শহর ভ্রমণ করিতে বাহির হইলে, প্রতি পদে প্রস্তর স্তম্ভে ঐতিহাসিক কীর্তি দেখা যায়। এই স্থানটির চতুর্দিকেই ঐতিহাসিক চিহ্নে পূর্ণ। একদিকে 'কেম্পেনিল' নামক উচ্চ স্তম্ভ। উহা আমাদের মনুমেণ্ট অপেক্ষা অনেক উচ্চ।

অনেক সিঁড়ি বাহিয়া আমরা উপরে উঠিলাম। নেপোলিয়ান ভেনিস জয় করিয়া অশ্বপৃষ্ঠেই এই দুর্গম সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়াছিলেন।

সেন মার্কোর চারিদিকে দোকান, এই সকল দোকানে নানারকম মনোহারী দ্রব্য সাজান। তাহার মধ্যে ভিনিসিয় কাচ জগদ্বিখ্যাত। সেই সকল কাচের দ্রব্যের রঙ কিরূপ সুন্দর তাহা বর্ণনা করা যায় না; যেন রামধনু খেলিতেছে।

এই সকল দোকানে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিতে পাইলাম, প্রাঙ্গণ অসংখ্য পারাবতে পূর্ণ হইতেছে; শুনিলাম রাজকোষ হইতে ইহাদিগকে প্রত্যহ দুই ঘটিকার সময় আহার্য্য দেওয়া হয়।

বহুশত বৎসর পূর্বে কপোতের সাহায্যে ভেনিসবাসীরা একবার বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিল। সেই অবধি নগরের অধিবাসীগণ ইহাদের সযত্নে প্রতিপালন করেন। আমরা এই স্থান হইতে সন্নিহিত রাজপ্রাসাদ দেখিতে গেলাম।

এই রাজবাটীতে বিখ্যাত চিত্রকরদিগের চিত্র, পুরাতন কালের অস্ত্র ও যুদ্ধ সজ্জাদি এবং পুরাতন পুস্তকাদি সযত্নে রক্ষিত। একস্থানে আমরা ছয় শত বৎসরের অতি পুরাতন একখানি ম্যাপ দেখিলাম। সেই ম্যাপের সহিত আধুনিক ম্যাপের অনেক প্রভেদ। কারণ তখন পৃথিবীর বৃত্তান্ত খুব কমই জানা ছিল। ভূগোল বিবরণ লিখিতে তখনকার ছাত্রদের আর অধিক পরিশ্রম করিতে হইত না।

রাজপ্রাসাদের দ্বারে প্রকাণ্ড সিংহ মূর্তি, শহরের অন্যান্য স্থানেও সিংহমূর্তি স্থাপিত আছে। কাহারও নামে বে-নামা দরখাস্ত কিম্বা অন্য অভিযোগ আনিতে হইলে, কাগজে লিখিয়া এই সকল সিংহমূর্তির মুখ-গহ্বরে নিক্ষেপ করিলে তাহা রাজ দরবারে

পৌঁছিত। এই প্রকারে কত নির্দোষ ব্যক্তি বিনা অপরাধে ঘোরতর অত্যাচার সহ্য করিত তাহার সংখ্যা করা যায় না।

যাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ হইয়াছে, হঠাৎ সে একদিন অদৃশ হইত। অন্ধকার রাত্রে গুপ্তচর তাহাকে ধরিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিত, পরদিন গুপ্ত-মন্ত্রণাগৃহে তাহার দণ্ড স্থির হইত। রাজার নামে ১০ জন মন্ত্রীই সমুদয় বিচার করিতেন। আমরা সেই ভীষণ মন্ত্রণা-গৃহ দেখিতে গেলাম। এখানে কত হতভাগ্য যাতনা ভোগ করিয়াছে, মনে করিলে শরীর কাঁপিয়া উঠে। আমাদের দেশের নবাবী আমলের নিষ্ঠুরতার কথা অনেক শুনা যায়; কিন্তু ইয়োরোপে ২।১ শত বৎসর পূর্বে বিচারের নামে কত নৃশংস অত্যাচার হইত, তাহা কল্পনা করা যায় না।

মন্ত্রণাগৃহটি খালের এক পারে। বন্দীগণ খালের অপর পার হইতে একটি সেতুর উপর দিয়া আনীত হইত, যে হতভাগ্য একবার এই সেতু অতিক্রম করিত তাহার মৃত্যু নিশ্চয়!

সেতু পার হইবার সময় সে শেষবার এই পৃথিবী দেখিয়া লইত। এইজন্য এই সেতু Bridge of Sights বলিয়া অভিহিত।

বন্দীরা মন্ত্রণা-গৃহ হইতে নিকটস্থ কারাগারে নীত হইত; সেই কারাগার যেন সাক্ষাৎ যমপুরী! – মাটীর নীচে বায়ু ও আলোক প্রবেশ করিবার পথ নাই। প্রাচীর সংলগ্ন শৃঙ্খলে বন্দী আবদ্ধ থাকিত, কেবল মৃত্যুর আঘাতে সেই শৃঙ্খল ভগ্ন হইত।

আমরা এই স্থান হইতে যখন বাহিরে ফিরিয়া আসিলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা। অস্ত প্রায় সূর্য্যের কিরণে আড্রিয়াটিকের জল ঝক্ মক্ করিতেছিল, দূরে সারি সারি নৌকার শ্রেণী। লোকে বিচিত্র বেশে দলে দলে ভেনিসিয়ান গণ্ডোলাতে বায়ু সেবনে বাহির হইয়াছে। কোন কোন নৌকা গায়কদলে পূর্ণ; তাহাদের কণ্ঠোত্থিত মধুর সঙ্গীতে আকাশ প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

বিবিধ রচনা

নাদির শার শাস্তি

ইতিহাস পাঠ করিলে ভারতভূমি যে প্রকৃতই রত্নগর্ভা তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। ধনধান্যের জন্য আমাদের এই মাতৃভূমি বহুকাল হইতে পৃথিবীর অন্যান্য জাতিদের প্রলোভনের বস্তু হইয়া আছে। গ্রীক দেশীয় রাজা আলেকজাণ্ডার হইতে এ পর্য্যন্ত কত জাতির যে এদিকে লোভ পড়িয়াছে তাহা বলা যায় না। পারস্য দেশীয় রাজা নাদীর শা ভারতবর্ষ হইতে কত ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন শুনিলে আশ্চার্য্যান্বিত হইবে। তিনি প্রথমে একজন দস্যুর নেতা ছিলেন। পরে দল বৃদ্ধি হইলে ছলে ও কৌশলে পারস্যের রাজাকে হত্যা করিয়া, নিজে পারস্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ক্রমে আফগানিস্থান অধিকার করিয়া ভারতের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়িল। তখন মোঘল সাম্রাজ্যের পতনকাল; মহম্মদ শা এই পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যের নামমাত্র সম্রাট। এই সময়ে নাদির শা সুযোগ বুঝিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। ১৭৩৯ খৃঃ অব্দে তিনি সিন্ধু নদী পার হইয়া কর্ণাল নামক স্থানে মোগলদিগকে পরাস্ত করেন। মহম্মদ শা দেখিলেন. নাদির শার সহিত যুদ্ধ অসম্ভব। বিশেষ নূতন রাজ্য অধিকার করা নাদির শার উদ্দেশ্য নহে, ধন সম্পত্তি লাভই তাঁহার ভারতবর্ষ আগমনের প্রধান কারণ। সুতরাং যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তিনি নাদির শাকে অনেক উপহার দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। নাদির শা ইহাতে যুদ্ধ করিতে বিরত হইয়া অর্থ গ্রহণের জন্য দিল্লীতে আগমন করিলেন। মহম্মদ শা অনেক আড়ম্বরের সহিত নাদির শার অভ্যর্থনা করিলেন, নিজ প্রাসাদে তাঁহার জন্য স্থান নিরূপণ করিয়া দিলেন। প্রথম সম্ভাষণের সময়েই মহম্মদ শার পাগড়ীস্থিত কোহিণুর নামক জগদ্বিখ্যাত হীরকের প্রতি নাদির শার দৃষ্টি পড়িলে, তিনি লোভসম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া মহম্মদ শাকে বলিলেন যে, আমাদের দেশের নিয়মানুসারে আপনার সহিত আমার পাগড়ী বদলাইতে হইবে। অগত্যা মহম্মদ শা বাধ্য হইয়া পাগড়ীর সহিত কোহিণুর নাদির শাকে দিলেন। কয়েকদিন এইরূপে দিল্লীতে যাপন করিলে, এক রাত্রিতে জনরব উঠিল, যে নাদির শার মৃত্যু হইয়াছে। দিল্লীবাসীরা তখন আপদ গেল ভাবিয়া, নাদির শার জনকয়েক সৈন্যকে হত্যা করিল। পরদিন প্রত্যুষে শয্যা হইতে উঠিয়া যখন নাদির শা নিজ সৈন্যদের মৃতদেহ দেখিতে পাইলেন, তখন তাঁহার ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিল, তারপর কি হইল সে ঘটনা বর্ণনা করিতে এখনও আমাদের শরীর শিহরিয়া উঠে! নাদির শা উন্মত্ত প্রায় হইয়া নিজ সৈন্যদিগকে শহরের সমুদয় লোককে হত্যা করিতে আদেশ করিলেন। তাহারা স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, শিশু, যাহাকে নিকটে পাইল, তাহাকেই হত্যা করিতে লাগিল। নাদির শা নিজে রৌসন উদ্দৌলা নামক একটি লাল পস্তরের মসজিদের উপর বসিয়া রক্ত স্রোতপূর্ণ শহরটি

দেখিতে লাগিলেন। এক ঘণ্টার মধ্যে ৩০০০০ লোককে হত্যা করা হইল। তখন মহম্মদ শা আর থাকিতে পারিলেন না, অনন্যোপায় হইয়া ওমরাহদের সঙ্গে লইয়া অবনত মস্তকে নাদির শার নিকট নগরবাসীদের জীবন ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই সময়কার একটি ছবি অপর পৃষ্ঠায় * দেওয়া গেল।

নাদির শা মহম্মদ শার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, "কেবল আপনার অনুরোধে আজ ক্ষমা করিতেছি।" সৈন্যগণ নাদির শার আজ্ঞা পাইয়া ক্ষান্ত হইল বটে, কিন্তু ৫৮ দিন পর্যন্ত নগরবাসীদের ধন সম্পত্তি লুট করিতে লাগিল।

নাদির শা নিজে শাজাহান কর্তৃক নির্মিত বহু মূল্য ময়ূর সিংহাসন গ্রহণ করিলেন, এই সিংহাসনের মূল্য এক কোটি টাকা ছিল।

তিনি কেবল দিল্লী হইতে অর্থ ও রত্নাদিতে ৭০ কোটী টাকা লইয়া যান, তদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থান হইতে আরও কত কোটি টাকা লুণ্ঠন করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না।

নাদির শা দেশে ফিরিয়া গিয়া, সৈন্যদিগকে তিন মাসের বেতন উপহার দেন এবং এক বৎসর কাল প্রজাদিগের নিকট কর গ্রহণ করেন নাই।

কিন্তু পাপের ধন প্রায় প্রায়শ্চিত্তেই যায়। এত লোকের প্রাণ সংহার করিয়া ও সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া, নাদির শা অধিক দিন সেই অর্থরাশি ভোগ করিতে পারেন নাই। আর এক ব্যক্তি বলবান হইয়া, তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাঁহার সিংহাসন ও সেই সমুদয় অর্থ কাড়িয়া লয়।

---

* প্রয়োজনীয় চিত্র রচনাটির সঙ্গে দেওয়া হলো না।

অদ্ভুত কৌশল

কিছুদিন হইল, আমি আমার কোন বন্ধুর নিকটে যোগফল বাহির করিবার একটি নূতন কৌশল শিখিয়াছি। পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে যদি কেহ তাহা শিখিতে চাও তবে এস! তুমি এই কাগজে পাশাপাশি যাহা ইচ্ছা ৫টি অঙ্ক লিখ। শেষের একটি যেন ৯ কিম্বা ০ না হয়, কি লিখিলে?

৫২৩৪৩? আচ্ছা, এই দেখ, এখন খুলিও না, শেষে খুলিও।

```
 ৫২৩৪৩
 ২৪৫০৬
 ৭৫৪৯৩
 ৭২৩৫৬
 ২৭৬৪৩
-------
২৫২৩৪১
```

আর ৫টি অঙ্ক উপরের অঙ্কের নীচে লেখ, কি লিখিলে? ২৪৫০৬? আচ্ছা এখন আমি এক লাইন লিখি, ৭৫৪৯৩। তুমি আরও এক লাইন লেখ, কি লিখিলে? ৭২৩৫৬? আচ্ছা, আমিও আর এক লাইন লিখি, ২৭৬৪৩। এখন যোগ কর ত, কি হইল?

২৫৪৩৪১? ঠিক ত? এখন তোমার হাতে যে কাগজটি মুড়িয়া দিয়াছিলাম, সেখানি খুলিয়া দেখ ত, তাহাতে কি আছে? ও কি অবাক যে? উহাতেও ২৫২৩৪১ আছে? দেখ কেমন এক লাইন দেখিয়াই আমি আগে যোগফল লিখিয়া দিয়াছি। কেমন করে লিখিলাম জানিতে চাও ত, শোন; ইহার কৌশল বলিতেছি। তুমি যখন ৫২৩৪৩ লিখিলে, আমি তখন একখানি কাগজে এই সংখ্যার আগে ২ বসাইয়া ও শেষ অঙ্ক হইতে ২ বিয়োগ করিয়া যাহা হয়, তাহাই লিখিলাম। তারপর তুমি যখন ২৪৫০৬ লিখিলে, আমি তাহার নীচে ৯ থেকে প্রত্যেক সংখ্যা বাদ যাহা হয়, তাহা লিখিলাম। যেমন ৯ থেকে ২ বাদ দিলে ৭ থাকে, ৪ বাদ দিলে ৫ থাকে, ৫ বাদ দিলে ৪, ০ বাদ দিলে ৯ ও ৬ বাদ দিলে ৩ থাকে। তুমি যখন আরও এক লাইন লিখিলে তখন ঠিক আগের মত ৯ হইতে প্রত্যেক সংখ্যা বাদ দিয়া আমিও শেষ লাইন লিখিলাম। ইহাতেই একটি ঠিক মিলিল, তুমি নিজে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ, ঠিক হয় কিনা! সঙ্কেতটা কিন্তু আর কাহাকে বলিও না।

বিহারীলাল গুপ্ত

হাইকোর্টের জজের পদে নিযুক্ত হওয়া অতিশয় সম্মান ও গৌরবের বিষয়।

সম্প্রতি *শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত মহাশয় তিন মাসের জন্য এই পদে নিযুক্ত হইয়াছেন; পরে ইনি যে এই পদে স্থায়ী হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বিহারী বাবু গৌরিভা নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর গুপ্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইঁহার মাতা মহাত্মা রামকমল সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিমোহন সেনের কন্যা। ইনি মাতামহ গৃহে সুপ্রসিদ্ধ সেন-পরিবারের কলুটোলাস্থ ভবনে জন্মগ্রহণ করেন।

ইঁহার পিতা পুত্রদিগের চরিত্র ও বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন; পুত্রেরা সকলেই বিদ্বান ও সচ্চরিত্র বলিয়া লোকে বিহারী বাবুর মাতাকে রত্নগর্ভা বলিত। বিহারী বাবু মাতামহের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন বলিয়া প্রায় ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মাতুলালয়ে ছিলেন, এবং মাতুলদের সহিত হেয়ার স্কুলে পাঠারম্ভ করেন।

এই সময় ১০.১২ বৎসর বয়সে সহপাঠী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের সহিত ইঁহার সৌহার্দ জন্মে। ইঁহাদের সেই বন্ধুত্ব আজ পর্য্যন্ত রহিয়াছে।

বাল্যাবধি ইঁহাদের দুইজনের শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ পূর্বক, বিলাত গিয়া সিভিলিয়ান হইবার প্রবল আকাংখা জন্মে। এখনকার দিনে বিলাত যাওয়া যেমন সহজ তখন তেমন ছিল না। এখন কত পিতামাতা আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত পুত্রকে বিদ্যা শিক্ষার্থে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতেছেন; কিন্তু তখন

[*এটি ১৩০৫ সালের বিবরণ। পাদটীকাটি প্রবন্ধাবলী পুস্তকের]

বন্ধু বান্ধবহীন বিদেশে বিদ্যা শিক্ষার্থ গমন করিবার সংকল্প করা, দুইটি বালকের পক্ষে সামান্য কথা নহে। এই উচ্চ আকাংখা পোষণ করিয়া ইনি অনুরাগের সহিত পাঠে রত হন এবং এণ্ট্রেন্স ও এফ. এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পান। পরে স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের সাহায্যে এই সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হন।

ইঁহার বন্ধু রমেশচন্দ্র দত্ত ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ইঁহার সহযাত্রী ছিলেন; ইঁহারা তিন জনে এক সময়েই সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

বাল্যকাল হইতে বিহারীবাবু সাহিত্যানুরাগী; এখনও কঠিন পরিশ্রমের পরে অবসর পাইলেই সাহিত্য চর্চা করিয়া থাকেন। সিভিলিয়ানদের মধ্যে এ দেশীয় ভাষা অনুশীলনের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ গভর্ণমেণ্ট পারিতোষক দিয়া থাকেন। ইনি সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় উত্তীর্ণ হইয়া বার হাজার টাকা পারিতোষিক পান।

পারিবে কি

এই যে ছবিগুলি * দেখিতেছ, এইরূপ তোমরা করিতে পারিবে কি? যখন পড়া-শুনা করিয়া আর কি করিবে ভাবিতেছ, সেই অবসর সময়ে এইগুলি অভ্যাসের চেষ্টা করিতে পার।

১ম চিত্র ঃ—ডান হাতের তর্জ্জনী (২য় অঙ্গুলী) তোমার শরীরের দিকে ঘুরাইয়া একটি বৃত্ত করিতে থাক এবং বাঁ হাত দিয়া তাহার বিপরীত দিকে আর একটি বৃত্ত করিতে থাক। এক সময়ে দুই হাত দিয়া বিপরীত দিকে বৃত্ত কিছুতেই আসিবে না, দুইটি বৃত্ত কেমন এক দিকেই ঘুরিতে থাকিবে, কিন্তু অভ্যাস করিলেই পারিবে।

২য় চিত্র ঃ—যেমন ছবিতে দেখিতেছ সেইভাবে হাতটি সোজা রাখ তারপর মধ্যমা (৩য় অঙ্গুলী) বাঁকাইয়া হাতের তালুর সঙ্গে যোগ কর, দেখিও যেন হাতের অন্য আঙ্গুলগুলি সোজা রাখিয়া মধ্যমাকে তালুর সঙ্গে যোগ করিতে হইবে।

বৃদ্ধা, তর্জ্জনী, কনিষ্ঠা, আঙ্গুল বাঁকান শক্ত। মধ্যমা, তর্জ্জনী একত্র বাকান সহজ।

৩য় চি ঃ—ছবির মতন হাত মুষ্টিবদ্ধ কর, কিন্তু তর্জ্জনীকে সোজা রাখ। তর্জ্জনীকে সোজা রাখিয়া কেবল প্রথম পর্বটিকে আস্তে আস্তে বাঁকাইতে চেষ্টা কর। অন্যান্য অংশ বাঁকাইলে চলিবে না।

নাদির শার শাস্তি এই রচনাটি প্রবন্ধাবলী গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় চিত্র রচনাগুলির সঙ্গে দেওয়া সম্ভব হলো না। কারণ শকুন্তলাদেবী সম্পাদিত গ্রন্থে রচনার সঙ্গে কোনো ছবি নেই।

৪র্থ চিত্র ঃ—ছবির ন্যায় হাতটিকে সোজা রাখ। সব আঙ্গুলগুলি একসঙ্গে লাগাইয়া সোজা করিয়া ধর। তারপর কনিষ্ঠ আঙ্গুলটিকে হাতের তালুর সহিত যোগ করিতে চেষ্টা কর। দেখিও যেন অন্যান্য আঙ্গুলগুলি বাঁকিয়া না যায় অথবা পরস্পর বিযুক্ত না হয়।

বন্দীর মুক্তি

আমাদের হাঁসের ঘর হইতে মাসাধিক হইল এক একটি করিয়া হাঁস চুরি হইতেছিল। ছুটিতে বাড়ী আসিবামাত্র আমার প্রতি তাহার কারণ অনুসন্ধান করিবার ভার পড়িল।

আমি অনুসন্ধান করিয়া বুঝিলাম, চোরের ইহাতে হাত ছিল না। সন্দেহ হইল, যে ইহা শিয়ালের কর্ম।

নিকটে খাল, তাহার দুই পার বনজঙ্গল সমাকীর্ণ। খালের পার দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে হাঁসের দুই একটি পালক দেখিতে পাইলাম। মাঝে মাঝে বালুকার মধ্যে শিয়ালের পদচিহ্নও দেখা গেল।

নিশ্চিন্ত জানিবার জন্য আর একটু ঘুরিতেছি, সহসা কাকের কোলাহল শুনিতে পাইলাম, "চোর দিয়া চোর ধরার" কথা তখন মনে পড়িল। যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহাতে সকল সন্দেহ ভাঙ্গিয়া গেল। শিয়াল কি একটা মুখে করিয়া খাল পার হইবার চেষ্টা করিতেছে। সেটা আর কিছু নহে আমাদের আর একটা হাঁস।

কাক জাতির মতন নির্লজ্জ চোর আর নাই। অন্যে চুরি করিলে চোর চোর বলিয়া রব তুলিয়া সকলের আগে পড়াশুদ্ধ সতর্ক করিতে যেমন প্রস্তুত, চোরামালে ভাগ বসাইতেও তেমন মজবুত। হাঁস লইয়া বাড়ী যাইবার পথে শিয়াল এই কাক-মণ্ডলী দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বড় বিপদে পড়িল। হয়ত দৌড়িয়া নির্বিঘ্নে বাড়ী পেঁাছিতে পারিত, কিন্তু কাকের সঙ্গে সঙ্গে আমার তাড়া খাইয়া বেচারী সেই সদ্যঃহত হাঁসটিকে ফেলিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিল।

আমাদের হাঁস চুরির কারণ এখন আর বুঝিতে বাকী রহিল না। শিয়ালের বাসাতে শাবক থাকিতে পারে এবং তাহাদের আহারের জন্যই এইরূপ চুরি হইতেছে মনে হইল। শাবকগণ কোন্ গর্তে বাস করিতেছে, তাহা অন্বেষণ করা আবশ্যক।

সেদিন সন্ধ্যাকালে আমি কুকুর সঙ্গে লইয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম। জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াই দূরে শিয়ালের ডাক শুনিলাম। আমার কাজ নহে। বন্য বিড়াল বা অন্য হিংস্র জন্তু কুকুর ডাক শুনিবামাত্র চলিয়া গেল, চারিদিক ঘুরিয়া প্রায় এক ঘণ্টা পরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ফিরিয়া আসিল।

আবার দূরে সেই ডাক। তখন বুঝিলাম সে শিয়াল আমাদিগকে ঠকাইবার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের নিকটেই হয়ত কোথাও শিয়ালের বাসা আছে, শৃগাল-দম্পতি আমাকে ভুলাইয়া গর্ত্ত হইতে দূরে লইয়া যাইবার জন্য পালা করিয়া ঐরূপ ডাকিতেছে। সেদিন অনেক রাত্রি হইয়াছিল। সুতরাং বাড়ী ফিরিলাম।

এই শিয়ালটাকে পাড়াতে সকলেই চিনিত। তাহার মুখের মাঝখানে একটা সাদা দাগ ছিল বলিয়া সকলে তাহাকে 'দাগী' নামে ডাকিত। একবার খরগোস চুরি করিতে গিয়া ফাঁদে পড়িয়া তাহার মুখে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল। অনেকদিন পরে শুকাইল বটে কিন্তু মুখের মাঝখানে সে দাগটা জন্মের মতন রহিয়া গেল।

এই দাগী শিয়াল ও তাহার শিয়ালী যে আমাদের হাঁস ধ্বংস করিতেছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ ছিল না। চোর ধরিবার জন্য তার পরদিন ছোট ছোট গাছের মধ্যে খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলাম, কতকগুলি মাটি রাশিকৃত হইয়া রহিয়াছে, কে যেন খুঁড়িয়া রাখিয়াছে। সন্দেহ হইল যে নিকটে নিশ্চয়ই গর্ত্ত আছে। যাঁহারা শিয়ালের গর্ত্ত দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে উহারা সুরঙ্গের প্রথম মুখটি বুজাইয়া দেয় ও যাতায়াতের জন্য দূরে গুপ্তস্থানে অন্য একটা মুখ রাখে। খুঁজিতে খুঁজিতে আমি সেই লুক্কায়িত দ্বারটির অনুসন্ধান পাইলাম ও গর্ত্তের মধ্যে শৃগাল শাবক দেখিতে পাইলাম।

কিছু দূরে একটা পুরাতন বৃক্ষ মাটিতে পড়িয়াছিল, আমরা ছেলেবেলা ঐ গাছটির গায়ে সিঁড়ির ধাপ কাটিয়া তাহার উপর উঠিয়া অনেকবার খেলা করিয়াছি। ঐ গাছটির উপর হইতে গর্ত্তের মুখ দেখা যাইত। আমি লুকাইয়া থাকিয়া সেখান হইতে শিয়াল পরিবারের প্রতিদিনের সংবাদ লইতে লাগিলাম।

৪টি ছোট ছোট ছানা, কখন বাহিরে আসিয়া খেলা করিত কখন বা রৌদ্রের উত্তাপ পোহাইত। বাহিরে কোন রকম শব্দ শুনিবামাত্র মুহূর্ত্ত মধ্যে গর্ত্তে প্রবেশ করিত।

শৃগাল তাহাদের জন্য এক একটি হাঁস চুরি করিয়া বাসার নিকট আসিয়া মৃদু স্বরে ডাকিত, সেই শব্দ শুনিয়া বাচ্চাগুলি তাড়াতাড়ি টলিতে টলিতে, পড়িতে পড়িতে, বাহিরে আসিত এবং সেই হাঁসের উপর লাফাইয়া পড়িয়া হাঁসটাকে লইয়া কাড়াকাড়ি করিত। মাতা দূরে বসিয়া মহানন্দে তাহা দেখিত।

এই জঙ্গলে একটা মস্ত ছুঁচো বাস করিত। দুইটা গাছের গুঁড়ির নীচে তাহার গর্ত্ত, গাছের গুঁড়ির উপর বসিয়া সে চারি দিক দেখিত, শিয়ালের সাড়া পাইলেই গর্ত্তে ঢুকিয়া পড়িত। ভয়ের কারণ না গেলে আর বাহিরে আসিত না।

একদিন শৃগাল-যুগল স্থির করিল, যে এই ছুঁচোটিকে শিকার করিতে হইবে। তাহারা দুজন আস্তে আস্তে ছুঁচোর গর্ত্তের দিকে অগ্রসর হইল। শিয়ালী লুকাইয়া রহিল, আর 'দাগী, গাছের নিকট দিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া যাইতে লাগিল ; ছুঁচো দাগীকে দেখিয়াই গর্ত্তে প্রবেশ করিল এবং গর্ত্তের মুখ হইতে তাহাকে দেখিতে লাগিল। যতক্ষণ দেখা গেল, ততক্ষণ আর বাহির হইল না, এদিকে শিয়ালী পশ্চাৎ-দিক্ হইতে লুকাইয়া গুঁড়ির নিকট উপস্থিত হইয়াছে, ছুঁচো তাহা দেখিতে পায়

নাই, দাগীকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া, যেই ছুঁচো গর্তের বাহিরে আসিল তৎক্ষণাৎ শিয়ালী তাঁহাকে মুখে করিয়া এক আছাড় দিয়া আধ মরা করিয়া লইয়া বাসার দিকে দৌড়াইল।

শিয়ালী এত সাবধানে তাহাকে মুখে করিয়াছিল, যে রাস্তাতেই ছুঁচোর সংজ্ঞা লাভ হইতে লাগিল। বাসায় আসিয়া শব্দ করিবামাত্র শাবকগুলি হুড়মুড় করিয়া উপস্থিত হইল এবং সেই আহত জন্তুটির উপর চারিজনে হুঙ্কার করিয়া পড়িল। ছুঁচোর গায়ে তখনও বল ছিল, সে যথাসাধ্য আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে করিতে একটা ঝোপে প্রবেশ করিল। ছানারা তখন কেহ পা ধরিয়া কেহ লেজ টানিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু পারিল না, তখন শিয়ালমাতা নিজে গিয়া উহাকে টানিয়া বাহির করিয়া ছানাদের মধ্যে ফেলিয়া দিল। তাহারা মনের মতন শিকার পাইয়া মহা আনন্দ ভোগ করিল।

শিয়ালের বাসার নিকটেই মাঠে অনেক ইঁদুর ছিল। শিয়ালী ছানাদের ইঁদুর ধরা শিখাইবার নিমিত্ত ঐ স্থানে লইয়া গেল। শিখিবার প্রধান নিয়ম, অনুকরণ করা ও সহজ বুদ্ধি প্রয়োগ করা। শিয়ালীর কয়েকটা সঙ্কেত ছিল তাহা দিয়া শাবকদের জানাইত যে "এখন চুপ করিয়া অপেক্ষা কর অথবা এস, আমার মত চল।"

যেদিন বাতাসে একটি পাতা নড়িত না, এমন দিনে শিয়ালী ইঁদুর ধরিতে যাইত, কারণ ঘন ঘাসের নীচে যখন ইঁদুরগুলি হাঁটিয়া বেড়ায় তখন ঘাস নড়িবামাত্র জানা যায় যে নীচে ইঁদুর বেড়াইতেছে। শিয়ালী নিঃশব্দে ছানাদের লইয়া অপেক্ষা করিত, ঘাস নড়িলেই লাফাইয়া কামড়াইয়া ধরিত। ছানারা বারম্বার মাতার অণুকরণ করিয়া যখন প্রথম ইঁদুর ধরিল, তখন আহ্লাদে তাহাদের সর্বশরীর কম্পিত হইত, তখন তাহারা নিজের বাহাদুরী দেখিয়া নিজেই মুগ্ধ হইত।

এই রূপে ইঁদুর ধরা বিদ্যা আয়ত্ব হইলে কাঠবিড়ালী শিকার শিক্ষা আরম্ভ হইল। একটা কাঠবিড়ালী নিকটের গাছ হইতে প্রত্যহ কিচির মিচির করিয়া শিয়ালের ভৎর্সনা করিত। ছানাগুলি অনেক সময় তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু এ পর্যন্ত পারিয়া উঠে নাই। শিয়ালী তাহাদের অকৃতকার্যতা দেখিয়া গাছের নিকট যাইয়া মরার মত শুইয়া রহিল, কাঠবিড়ালী প্রত্যেক দিনের ন্যায় আজও হইতে যথাবিধি ভৎর্সনা আরম্ভ করিল। কিন্তু আজ আর শিয়ালীর কোন চিহ্ন দেখিতে পাইল না। হটাৎ শিয়ালের এত ধৈর্য্য গুণ দেখিয়া কাঠবিড়ালী অবাক হইয়া গাছ হইতে অন্য গাছে উঠিল। এবার সে গুলি দিতে দিতে শিয়ালের মস্তকে গাছের বাকলও ফেলিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই শিয়ালকে রাগাইতে পারিল না, অবশেষে সে আর কৌতুহল সামলাইতে না পারিয়া কি হইয়াছে দেখিবার জন্য শিয়ালের নিকট যাইবামাত্র মুহূর্ত্ত মধ্যে শিয়াল খপ্ করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

এতদিনে ইহাদের উপর আমার মায়া বসিয়াছিল কাজেই ইহাদের উপর অত্যাচার করিতে আমার মন উঠিল না। আমার দ্বারা কিছু হইতেছে না দেখিয়া মামা একদিন

নিজেই কুকুর ও বন্দুক সঙ্গে করিয়া বাহির হইলেন। সে দিন তাহার হস্তে "দাগী" পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

কিন্তু তথাপিও হাঁস চুরি থামিল না। আমার মামার ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি চারিদিকে বিষাক্ত মাংস ছড়াইয়া রাখিলেন, কিন্তু শিয়ালী ঘ্রাণ শক্তি দ্বারা টের পাইয়া, তাহা স্পর্শও করিল না। অবশেষে আমার মামা নিজেই গর্তের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। আমি জানিতাম, কিন্তু তাহা প্রকাশ করি নাই।

পূর্বে দুইটাতে মিলিয়া কুকুরদের ভুলাইত, এখন সে একা তাহা পারিয়া উঠিল না ; সুতরাং, শীঘ্র তাহাদের বাসা প্রকাশ হইল ! মামা গর্ত খুঁড়িবার জন্য একজন লোক নিযুক্ত করিলেন, কুকুরগুলি চারিদিকে পাহারা দিতে লাগিল। শিয়ালী তখনও ছানাগুলিকে রক্ষা করিবার আশা ত্যাগ করে নাই। কত রকমে কুকুরদের সে স্থান ভুলাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিল ; ভাবিল কুকুরদের দূরে লইয়া গেলেই বুঝি শিশু রক্ষা পাইবে। কিন্তু তাহার সে চেষ্টা সফল হইল না।

খুঁড়িতে খুঁড়িতে গর্তের মধ্যে ৪টি ছানা বাহির হইল। আমি বাধা দিবার আগেই কুড়ালীর আঘাতে একটি ও কুকুরদের মুখে ২টি প্রাণ হারাইল। অন্যটিকে আমি অতি কষ্টে কুকুরের হাত হইতে বাঁচাইলাম।

সে সময়ে শিয়াল-মাতার অবস্থা দেখিলে পাষাণ প্রাণও গলিয়া যায়। তাহার ভয় কোথায় গেল। সে কেবল ব্যাকুলভাবে নিকটে ঘুরিতে লাগিল। পরম শত্রু মানুষের নিকট যেন সন্তানের প্রাণ ভিক্ষা করিতে লাগিল। এত নিকটে আসিয়াছিল যে তাহাকে সহজে বধ করা যাইত, কিন্তু পাছে কুকুরের গায়ে গুলি লাগে, এজন্য বন্দুক ব্যবহার করিতে পারা গেল না।

গলায় শিকলী দিয়া ছানাটি উঠানে বাঁধিয়া রাখা হইল। নিকটে একটি কাঠের বাক্স ছিল, মানুষ দেখিলেই সে বাক্সের মধ্যে পলায়ন করিত। কিন্তু যত রাত্রি হইতে লাগিল, ততই সে অস্থির হইয়া পড়িল। অবশেষে কিছুতেই বাঁধন কাটিতে না পারিয়া আবার কাঁদিয়া উঠিল। এই সময়ে দূরে শিয়ালের ডাক শুনিতে পাইলাম। মুহূর্ত মধ্যে শিয়ালী তাহার ছানার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। শিশু লাফাইয়া মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় লইল। মাতা শিশুকে লইয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কঠিন শিকলীর বন্ধনে শিশু বাঁধা রহিয়াছে, সুতরাং নিষ্ফল মনোরথ ও নিরুপায় হইয়া বসিয়া পড়িল। কতক্ষণ পরে দেখিলাম, অবোধ শিশু সমস্ত কষ্ট ভুলিয়া মাতার স্তন পান করিতেছে। আমি সেখানে যাইবামাত্র সে পলায়ন করিল। দেখিলাম, সে সন্তানের জন্য দুইটি মৃত ইঁদুর রাখিয়া গিয়াছে।

পরদিন জঙ্গলের মধ্যে সেই পুরাতন স্থানে গিয়া দেখিলাম যে, শোকার্ত মাতা মৃত শিশু তিনটিকে গর্ত হইতে বাহির করিয়াছে ও তাহাদের শরীর লেহন করিয়া, পরিস্কার করিয়া পাশাপাশি রাখিয়াছে। সে তখনও বুঝিতে পারে নাই, যে তাহারা মৃত। তাহাদের আহারার্থে হাঁস মারিয়া আনিয়াছে, কিন্তু আজ ত আর সন্তানেরা হাঁস লইয়া কাড়াকাড়ি করিল না। মাটির উপরে চিহ্ন দেখিয়া বুঝিলাম, সে সমস্ত

রাত্রি মৃত-সন্তানগুলির পাশে থাকিয়া তাহাদিগকে দুগ্ধ পান করাইবার জন্য ও তাহাদের শীতল দেহ গরম করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিয়াছে। শেষে বুঝিতে পারিয়া, শোকে মৃত্তিকার উপর লুণ্ঠিত হইয়াছে।

এখন আমাদের ক্ষুদ্র বন্দীটি মাতার সকল স্নেহের অধিকারী হইল। আমাদের উঠানে কুকুর সমস্ত রাত্রি পাহারাতে নিযুক্ত থাকিত। আমার ও চাকরের প্রতি আদেশ হইল যে শিয়ালীকে দেখিবামাত্র গুলি করিতে হইবে। এই শোকার্ত মাতার দুঃখ স্বচক্ষে দেখিয়া, আমার হৃদয় গলিয়া গিয়াছিল, সুতরাং আমি স্থির করিলাম যে তাহাকে দেখিয়াও দেখিব না। আসিবার সমস্ত রাস্তা প্রায় বন্ধ, তথাপি সকল বাধা তুচ্ছ করিয়া সে প্রত্যহ সন্তানের আহারার্থ কিছু আনিত ও একবার তাহাকে বুকে রাখিয়া গরম করিয়া যাইত। আর সে শিশুর ডাকের অপেক্ষায় থাকিত না।

আর একদিন শিয়ালী পুনরায় শিকলী কাটিতে চেষ্টা করিল। তাহাতে যখন অকৃতকার্য্য হইল, তখন গর্ত খুড়িয়া শিকলীটি মাটি চাপা দিয়া মনে করিল, এইবার বুঝি বন্ধন ঘুচিয়াছে। কিন্তু ছানা মুখে করিয়া ছুটিবামাত্র ভুল টের পাইল। গলায় ফাসি লাগিয়া বাচ্চাটি কাতর স্বরে কাঁদিয়া বাক্সের মধ্যে ফিরিয়া গেল। এইবার তাহারা শিয়ালীকে তাড়া করিয়াছে। কিন্তু যে কুকুর শিয়ালীর পশ্চাৎ ছুটিল তাহাকে আর বাড়ীতে ফিরিতে হইল না। আজ শিয়ালী সুযোগ বুঝিয়া সন্তান বধের প্রতিহিংসার উপায় বাহির করিয়াছে। সে ছুটিয়া রেলের লাইনের উপর দিয়া পলায়ণ করিতে লাগিল। কুকুরও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। সে সময়ে রেলের গাড়ী আসিয়াছিল, গাড়ী নিকটে আসিলে. শিয়ালী হঠাৎ পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল, কিন্তু কুকুর আপনাকে রক্ষা করিতে পারিল না, গাড়ীর চাকার আঘাতে প্রাণ হারাইল।

পরদিন রাত্রে আবার শিয়ালী সন্তানের জন্য হাঁস মারিয়া আনিল, আবার বুকে করিয়া তাহার তৃষ্ণা দূর করিল। সে মনে করিত সে ছাড়া সন্তানের ক্ষুধা দূর করিবার আর কেহ নাই। সেই মৃত হাঁসের অবশিষ্টাংশ দেখিয়া আমার মামা বুঝিলেন, যে শিয়ালী এখনও প্রত্যহ সেখানে আসে। তখন তিনি নিজে পাহারা দিতে আরম্ভ করিলেন, সেই রাত্রিতে শিয়ালী হাঁস মুখে করিয়া যেমন উঠানে পা দিবে, এমন সময় গুড়ুম্ গুড়ুম্ বন্দুকের শব্দ শুনিয়া সে হাঁস ফেলিয়া পলাইল। আবার আসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু আবার বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া চলিয়া গেল। সকলে ভাবিল, আর সে আসিতে সাহস করিবে না, কিন্তু পরদিন শিকলীতে দাঁতের চিহ্ন দেখিয়া জানিলাম, বন্দুকের শব্দে সে ভীত হয় নাই। সন্তানকে দেখা দিয়া আর একবার তাহার বন্ধন মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছে। এত সাহস ও এত সন্তান-বৎসলতা দেখিয়া কাহার না মনে দয়ার উদয় হয়?

আজও কি সে আসিবে? পূর্ব রাত্রিতে গুলির মুখে পড়িয়া কি সে ভীত হয় নাই? আমি মনে মনে এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময়ে শাবকের অস্ফুট ক্রন্দন শুনিলাম ও উঠানে কাল ছায়া দেখিলাম। তবে মা সন্তানকে ত্যাগ করে নাই।

আজ শিয়ালী শিকার করিতে যায় নাই। আজ সে যে করিয়া হউক সন্তানকে

মুক্ত করিবেই। সন্তানকে বন্দী দেখিয়া সে কিরূপে নিজে সুখ ভোগ করে? শিকল কাটিতে এতদিন সে বিধিমত চেষ্টা করিয়াছে, যত রকম উপায় সে জানিত, তাহা প্রয়োগ করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হয় নাই, শত বিপদ ও বাধা সে তুচ্ছ করিয়াছে, কিন্তু সন্তানকে মুক্ত করিতে পারে নাই। তবে এই বন্ধন মুক্ত করিবার একমাত্র উপায় আছে, সুতরাং শিয়ালীকে মারিবার জন্য যে বিষাক্ত মাংস ছড়ান ছিল, আজ সে তাহার এক অংশ মুখে করিয়া সন্তানকে খাইতে দিল। শৃগাল-শাবক চির-দিনের জন্য বন্ধন মুক্ত হইল। সে দিন হইতে শৃগাল-মাতাকে আর কেহ দেখিতে পাইল না।

ইতর প্রাণীদের দয়া

আমাদের সাধারণ ধারণা এই, যে স্নেহ, দয়া, মায়া, মমতা প্রভৃতি বুঝি মানুষেরই একচেটিয়া অধিকার। ইতর প্রাণীদের মধ্যে বুঝি তাহা নাই, তাহারা বুঝি পরস্পরের মধ্যে সর্বদাই নিষ্ঠুর ব্যবহার করে। মানুষ এই অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া পশুপক্ষীদিগকে অবজ্ঞা করে, এবং এক সঙ্গে এক জগতে বাস করিয়াও তাহাদের সুখ দুঃখের প্রতি নিতান্ত উদাসীন থাকে। যে সকল সহৃদয় ব্যক্তি পশু পক্ষীদের জীবন আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন যে তাহাদের জীবনও ঠিক মানুষের মতন সুখ ও দুঃখে পূর্ণ। তাহাদের মধ্যেও স্নেহ দয়া আছে এমনকি পশুপক্ষীদের জীবন হইতে মানুষের অনেক শিখিবার আছে।

পশুপক্ষীদের মধ্যে মাতৃস্নেহ ও ভালবাসার দৃষ্টান্ত তোমরা অনেক শুনিয়া থাকিবে। সন্তানদের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য পশুপক্ষী-মাতাও আমাদের জননীর ন্যায় প্রাণ দিতে সর্বদাই প্রস্তুত। বানরদের মধ্যে দেখা গিয়াছে যে কোনও বানর-শিশু মাতৃহীন হইলে অন্য বানরী তাহাকে অপত্য নির্বিশেষে লালনপালন করে। পক্ষীযুগলের মধ্যে একের মৃত্যুতে অন্যের গভীর শোকের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

আজ জন্তুদের মধ্যে বন্ধুত্বের একটি দৃষ্টান্ত দিব। তাহাদের মধ্যেও নিঃস্বার্থতা দেখা যায়। আমাদের সাধারণ ধারণা এই যে, পশুপক্ষীদের মধ্যে বৃদ্ধ ও পীড়িতের জন্য দয়া নাই; কিন্তু বাউটন নামক একজন ইংরাজ ভদ্রলোক এক বন্য টিয়ার অদ্ভুত পরসেবার কথা বলিয়াছেন বন্য-টিয়াটি অন্য জাতীয় একটি পঙ্গু ও শীতে মৃতপ্রায় পাখীকে আশ্রয় দিয়া প্রত্যহ তাহার পালকগুলি পরিস্কার করিয়া দিত, তাহার জন্য খাদ্যদ্রব্য আহরণ করিয়া আনিত ও তাহাকে অন্য অন্য পাখীদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিত। আর একজন ভদ্রলোক একটি অন্ধ ও বৃদ্ধ পেলিকান পাখীকে হৃষ্টপুষ্ট দেখিয়া অনুসন্ধান দ্বারা জানিলেন যে পালের পাখীদের যত্ন ও সেবাতে তাহার

দিন ঐরূপে সুখে কাটিতেছিল। সুবিখ্যাত ডারউইন বলেন যে মুরগীদের মধ্যেও তিনি ঐরূপ অন্ধের সেবা করিতে দেখিয়াছেন।

আমাদের দেশে কাকেরাও স্বজাতীয় অন্ধের সেবা ও যত্ন করিয়া থাকে।

আর একজন ইংরাজ তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে তিনি আবিসিনিয়া দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে একদা একপাল বেবুনের (বানর) মধ্যে পড়েন। তাহারা দল বাঁধিয়া স্থানান্তরে যাইতেছিল, হঠাৎ সম্মুখে মানুষ দেখিয়া দলশুদ্ধ পলায়ন করিলে, কেবল একটি দুর্বল ক্ষুদ্রকায় বেবুন পলাইতে না পারিয়া একটা ক্ষুদ্র পাথরের উপর পড়িয়া রহিল। সেই ইংরাজের কুকুরগুলি তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল, সে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। ঐ ভদ্রলোকটি কুকুরের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে যাইবার পূর্বেই পাল হইতে এক বৃহৎ সবল বেবুন আসিয়া কুকুরগুলিকে তাড়াইয়া সেই ক্ষুদ্রকায় বন্ধুকে পিঠে করিয়া মহা জয়োল্লাস করিতে করিতে চলিয়া গেল। এই বেবুনের মতন বীরত্ব আমাদের কয়জনের আছে? আমাদের কি ইতর প্রাণী হইতে শিখিবার কিছু নাই। এই ত গেল অপেক্ষাকৃত বড় জন্তুর কথা। ক্ষুদ্র পিপীলিকার মধ্যেও বন্ধুত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। একদল পিপীলিকাকে নানাভাগে বিভক্ত করিয়া ৩।৪ মাস পরে একস্থানে ছাড়িয়া দিলে তাহাদের মধ্যে যে বন্ধু সমাগমের আনন্দ হইতেছে, তাহা বুঝা যায়; সুতরাং ৩।৪ মাসেও ইহারা বন্ধুত্ব বিস্মৃত হয় না ইহা প্রমাণ হইল। অপরিচিত হইলে একজাতীয় পিপীলিকার মধ্যেও দেখা হইলেই বিরোধ উপস্থিত হয়। অনেক সময় দেখা গিয়াছে বিরোধী-দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় ভুলক্রমে যদি বন্ধুর সহিত বন্ধুর সংঘর্ষণ ঘটে, তবে টের পাওয়ামাত্র পরস্পরের মধ্যে যেন অনুনয় বিনয় ক্ষমা প্রার্থনা চলিতে থাকে, তাহা দেখিলেই আশ্চর্য হইতে হয়।

রুষিয়া দেশের একজন প্রাণীতত্ত্ববিদ পণ্ডিত লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন যে একটি পিপীলিকা উদর পূরিয়া আহার করিয়া আসিতেছে, পথে তাহার একজন ক্ষুধার্ত বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল; অমনি আপনার কুক্ষিস্থ অতিরিক্ত খাদ্য উগরিয়া তাহাকে আহার করিতে দিল।

সচরাচর যে সকল শামুক দেখিতে পাও, যাহাকে দেখিবামাত্র কত ছেলে পা দিয়া পিষিয়া মারিয়া ফেলে, ঐ শামুকদের মধ্যেও পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিবার দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। একটি সবল, সুস্থ শামুক তাহার দুর্বল নির্জ্জীব বন্ধুর জন্য প্রাচীর পার হইয়া সুখাদ্যপূর্ণ স্থান অনুসন্ধান করিয়া পুনরায় পূর্বস্থানে আসিয়া বন্ধুকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে; এরূপ দেখা গিয়াছে।

প্রাণীজগতে যাহাদিগকে আমরা ইতর জন্তু বলিয়া ঘৃণা করি, তাহারাও যে দুর্বলের উপর দয়া ও স্নেহপ্রদর্শন করে, এরূপ ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত দেখা যায়। পাঠক পাঠিকা! তোমরাও কি তাহাদের নিকট হইতে এই সদ্‌গুণ শিক্ষা করিবে না? প্রতিদিন তোমরা কত শত শত জন্তু দেখিতে পাও, তাহাদিগকে কি দুর্বল মনে করিয়া দয়া প্রদর্শন করিবে না?

সুরেশদের বাগান

সুরেশদের বাড়ীতে একটা বাগান আছে, এবং বাগানের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে। বাগানটি সুরেশদের ভাইবোনের প্রিয়, তাহারা নিজেরা একটু একটু জমি লইয়া তাহাতে নানাপ্রকার ফুলগাছ লাগায়, মালিকে দিয়া জল দেওয়ায়, এবং ফুল হইলে কত আমোদ করিয়া তাহা তুলিয়া ঘর সাজায়। সুরেশদের বাড়ীতে ফুলের বড় আদর। সে বাড়ীর ছেলেরা গাছপালা ও ফুলপাতার মধ্যে লালিত পালিত হওয়ায় সকলেই ফুল বড় ভালবাসে, সেই বাগানটিতে এমন গাছ, এমন ফুল, এমন প্রাণী ছিল না, যাহাদের আকৃতি প্রকৃতি তাহারা জানিত না, যদিও কোনও দিন একটা কিছু নূতন দেখিবার জিনিষ পাইত, অমনি শিশু মহলে কোলাহল পড়িয়া যাইত ও সকলে মিলিয়া তাহাকে তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতে বসিত। এইরূপে সেই বাগানটি যেন তাহাদের একখানা পড়িবার গ্রন্থের মত হইয়া উঠিয়াছিল।

একদিন সমস্তদিন বৃষ্টির পর বৃষ্টি থামিবামাত্র সুরেশ তাহার ছোট ভগিনী বিনোদিনীকে লইয়া পুকুরে কত জল বাড়িল তাহা দেখিবার জন্য বাগানে গেল। গিয়াই দেখে পুকুরের চারিধারে "কোঁ ক্যাঁ কোঁ" বেঙ ডাকিতেছে। বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিল,—"বেঙেরা এত ডাক্‌ছে কেন?" সুরেশ উত্তর করিল, "অনেকদিন পরে বৃষ্টি হয়েছে কিনা, তাই ওদের আনন্দ হয়েছে, এবং আবার শীঘ্র জল হবে বলে আনন্দ করছে।"

বিনোদিনী। ওরা কি করে জান্‌লে যে জল হবে?

সুরেশ। ওরা জানতে পারে। সেই যে একজন কৃষক একটা বেঙ পুষেছিল, সে কখন জল হবে তা বলে দিত, তা কি শুনিস্ নি?

বিনোদিনী। ওমা! কখন জল হবে বেঙ কি করে তা জানে? দাদা! একটা বেঙ ধরণা আমি বেঙ দেখ্‌বো।"

সুরেশ দৌড়িয়া বাড়ীর ভিতর হইতে একটা চুপড়ী আনিয়া তাহাতে অনেক কষ্টে একটা বেঙ তুলিল। ক্রমে অপরাপর ভাইবোনগুলি আসিয়া জুটিল। সব শিশুতে মিলিয়া বেঙের পরীক্ষা আরম্ভ হইল।

একজন বলিল, "দেখ ভাই, চোক্ দুটো দেখ, যেন চশমা পরেছে। সে চশমার ধার যেন সোনা দিয়ে বাঁধান।" সকলে "তাই বটে, তাই বটে।"

সুরেশ বলিল, "মাষ্টার সেদিন ক্লাসে বলেছেন, যে বেঙের মাথার মধ্যে চক্ষু দুইটি সার, উহাদের মাথার মধ্যে মগজ খুব কম, তাই বেঙগুলি বড় বোকা। আবার দেখ বেঙের ঘাড় একেবারে নাই, মাথা একেবারে পিঠে বসান।" সেই সময় একটা ছোট মাছি উড়িয়া চুপড়ীর মধ্যে বসিবামাত্র বেঙটা জিভ্ বাহির করিয়া মুহূর্তমধ্যে তাহাকে

গিলিয়া ফেলিল। একজন বলিয়া উঠিল, "দেখ ভাই বেঙটা কি চালাক্ কেমন খপ্ করে মাছিটা খেয়ে ফেল্‌লে।" বিনোদিনী—"ওমা! মাছি খেয়েছে, তবে বমি করে মরবে।" অপর একটি শিশু বলিল, "দূর ওকি মানুষ যে মাছি খেয়ে বমি করবে? ওরা যে পোকা মাকড় খায়।" ইতি মধ্যে তাহাদের পিতা সেখানে আসিয়া উপস্থিত।

বিনোদিনী।—হ্যাঁ বাবা? বেঙটা মাছি খেলে, ওর কি বমি হবে না?

পিতা হাসিয়া উত্তর করিবেন—কীট পতঙ্গই ওদের খাদ্য। ঐ জন্যই ত ওরা আমাদের উপকারী বন্ধু। বেঙ না থাক্‌লে আমরা পোকা মাকড়ের কামড়ে অস্থির হয়ে উঠ্‌তাম, আর আমাদের গাছ পালা সমুদয় নষ্ট হয়ে যেত।

পিতা বেঙেরা মানুষের বন্ধু এমন কি ওই যে গাছে ছোট টুনটুনি পাখী দেখছ, ঐ যে টিপ টিপ করে ডালে ডালে বেড়াচ্ছে, ওরাও মানুষের বন্ধু।

একটি শিশু। কেন, ওরা কি কাজ করে?

পিতা।—ওরা মস্ত কাজ করে, কীট পতঙ্গ ধরে খায়, তাহাতে গাছপালা বাঁচে। যারা গোলাপের বাগান করে তারা অনেক সময় গোলাপ গাছের তলায় চাউল, কড়াই প্রভৃতি দেয়, তাহলে পাখী আসে, পাখী এলেই গোলাপ গাছের পোকা খেয়ে ফেলে, তা না হলে পোকাতে গাছ মেরে ফেলে।

দ্বিতীয় শিশু।—ওমা বিধাতার কি সৃষ্টি! তিনি পাখীকে পাঠিয়ে গাছকে বাঁচান!

পিতা।—তা বুঝি জান্‌তে না! একবার ফ্রান্সদেশের ভদ্রলোকের মেয়েদের সখ হল যে, তাঁহারা টুপীর উপরে ছোট ছোট মরা পাখী পরিবেন। এই ফ্যাসানের গুনে দেশের হাজার হাজার ছোট পাখী মারা পড়িতে লাগিল। শেষে কয়েক বৎসরের মধ্যেই দেখা গেল, পোকাতে সব শস্য খেয়ে ফেল্‌ছে, ফসল এাল হচ্ছে না; তখন আইন করিয়া পাখী মারা নিবারণ করিতে হইল।

তৃতীয় শিশু।—ও বাবা! তবে ত বেঙ কি ছোট পাখী মারা উচিত নয়?

পিতা।—তাতে কি আর সন্দেহ আছে!

আর কেনই বা মারবে? যে উপকার ভিন্ন কোন অপকার করে না, তাকে অকারণ মারা কি পাপ নয়?

বিনোদিনী।—বাবা, বেঙটা কি চালাকি করে মাছিটা খেয়েছে যদি দেখতে, তা হলে কি বল্‌তে।

পিতা।—ওরা কি করে খায় শুনবে? আমাদের জিহ্বা যেমন মুখের পশ্চাতে বসান আমরা কেবল সম্মুখে জিহ্বা বাড়াইতে পারি, ইহাদের তেমন নয়, ইহাদের জিহ্বা মুখের সম্মুখে বসান এবং ইহারা ইচ্ছামত সম্মুখে ও পশ্চাতে দুদিকেই জিহ্বা বাড়াইতে পারে। পোকা দেখিবামাত্র সামনের দিক বাড়াইয়া পোকা ধরিরা একেবারে পশ্চাতে ঠেলিয়া দিয়া তাহা গিলিয়া ফেলে। চিবাইবার দরকার করে না।

বিনোদিনী।—বাবা, ওরা পুকুরের ধারে কেন থাকে?

পিতা।—ওদের চামড়া স্পঞ্জের মত সাচ্ছিদ্র, সর্বদা জল টানিয়া লইতেছে, শুষ্ক

স্থানে থাকিলে সেই চামড়া শুকাইয়া যায় এজন্য উহারা পুকুর বা ডোবার ধারে থাকে। গ্রীষ্মকালে উহাদের গরমে বড় কষ্ট হয়, জল না হইলে বাঁচিতে পারে না।

বিনোদিনী।—আচ্ছা বাবা, বেঙের গা এত ঠাণ্ডা কেন ?

পিতা।— তোমরা হয়ত জান যে, আমরা নিঃশ্বাস দ্বারা বাতাস শরীরের ভিতর টানিয়া লই বলিয়াই আমাদের গা গরম থাকে। বেঙ সচরাচর জলে বাস করে। অধিক পরিমাণে বাতাস উহাদের শরীরে প্রবেশ করে না, এজন্য উহাদের শরীর শীতল।

বিনোদিনী।— আচ্ছা বাবা, বেঙাচি ত মাছের মত, তা থেকে বেঙ হয় কি করে ?

পিতা।— পাখীর ডিম পাড়িয়া তাহার উপরে বসিয়া তা দেয়। কিন্তু বেঙের শরীর যে ঠাণ্ডা, কি করিয়া নিজেরা ডিম ফুটাইবে ? কাজেই তাহারা জলের নীচে ডিম পাড়িয়া চলিয়া আসে ; ডিমগুলি উপরে ভাসিয়া গাছের পাতা প্রভৃতি আশ্রয় লয় এবং সূর্য্যের উত্তাপ পাইয়া ফুটে। বেঙাচি দেখিতে আদবেই বেঙের মত নয়, বরঞ্চ ছোট ছোট মাছের মতন, কেবল মাথা ও লেজ আছে ; জল হইতে উঠাইলে মরিয়া যায়। মাছের মতন বেঙাচির কানকো আছে তাহা দ্বারা নিঃশ্বাস ফেলে, আমরা যেমন ফুসফুস দ্বারা জলে নিঃশ্বাস ফেলিতে পারি না, উহারা তেমন কানকো দ্বারা জলের বাহিরে নিশ্বাস ফেলিতে পারে না।

বেঙাচির মুখও বেঙের মতন সম্মুখে নয়, মাথার নীচে, তাহা দ্বারা ঘাস পাতা খাইয়া বাড়িতে থাকে। বেঙাচি বড় হইয়া বেঙ হইতে ৪।৬ বা ৮ সপ্তাহ লাগে। দিন দিন বেঙাচির পরিবর্তন হয়। আস্তে আস্তে লেজের নিকট দুইটি গোঁজ বাহির হয় ; এই গোঁজ দুইটি যত বাড়ে লেজটি তত শুষ্ক হইতে থাকে, এই গোঁজ দুইটি হইতে যখন পশ্চাতের পা দুটি গঠিত হয়, তখন লেজটি খসিয়া যায়, এদিকে কানকো শুকাইয়া তাহার পরিবর্তে ফুসফুস প্রস্তুত হইতে থাকে, চক্ষু দুটি বড় হয়, সম্মুখেও দুটি পা বাহির হয়। সেই ক্ষুদ্র বেঙাচির এখন সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছে ; লেজ খসিয়া তাহার স্থানে পা হইয়াছে ; মাথাটি মস্ত হইয়াছে ; মুখটি সম্মুখে আসিয়াছে ; কানকোর স্থানে ফুসফুস হইয়াছে। এখন সে আর জলে থাকিতে পারে না ; এবং জলের ঘাস পাতাতে তাহার আর রুচি হয় না, এখন নিরামিষের পরিবর্ত্তে আমিষ আহারের প্রতিই তাহার লোভ বেশী। কাজেই তাহাকে পূর্ব বাসস্থান ত্যাগ করিয়া স্থলের আশ্রয় লইতে হইয়াছে ; তবে সে পুরাতন বাসস্থানকে একেবারে ত্যাগ করিতে পারে নাই ; কেই বা পারে ?

বক্তৃতাবলী

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ময়মনসিংহ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ

[জগদীশ চন্দ্র ইংরেজি ১৯১১ সালের ১৪ই এপ্রিল তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতির ভাষণ দেন। এই বক্তৃতার দিনকয়েক আগে সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহারাজা কুমুদচন্দ্র সিংহ জগদীশচন্দ্রকে একটি চিঠি লেখেন। তাতে তিনি বলেন— "আপনার ভাষণ শোনবার জন্য জনসাধারণের যে রকম আগ্রহ দেখা যাচ্ছে, তাতে বক্তৃতা গৃহে স্থান সঙ্কুলান হবে বলে মনে হয় না। তাই আমরা প্রবেশ মূল্য ধার্য করতে চাই।" উত্তরে জগদীশচন্দ্র জানিয়েছিলেন, শুধু বিত্তশালী লোকের জন্য বক্তৃতা দিতে ময়মনসিংহ যাচ্ছেন না। প্রয়োজনে তিনি দুদিন বক্তৃতা দেবেন। কোনো কারণেই যেন প্রবেশ মূল্য ধার্য করা না হয়। জগদীশ চন্দ্র অনুষ্ঠিত সভায় দুদিন ভাষণ দিয়েছিলেন। একদিন বাংলায় ও অন্যদিন ইংরেজিতে।

১৪ই এপ্রিল বাংলা নববর্ষ। তাই সভাপতির ভাষণ শুরু হওয়ার আগে সম্মিলনের পক্ষ থেকে শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত (সাধন কুণ্ড, চট্টগ্রাম) একটি কবিতা পাঠ করে সভাপতি ও মাননীয় অতিথিদের সম্ভাষণ জানান। নীচে সভায় পঠিত বিস্মৃতপ্রায় কবিতাটির অংশ বিশেষ তুলে ধরা হল—

স্বাগত সজ্জনবর্গ— জননীর সুকৃতি সন্তান।
প্রভাতের স্বর্ণ-রশ্মি, বিহঙ্গের ললিত সুতান,
প্রফুল্ল প্রসূন পুঞ্জ, মলয়ের মৃদুল হিল্লোল,
সিন্ধু উত্তাল গীতি, তটিনীর মধুর কল্লোল,
অক্ষমের মুক্ত হৃদি, দরিদ্রের কুটীর প্রাঙ্গন,
তোমা সবাকারে আজি করিতেছ হর্ষে আবাহন—

এস আজ এস সবে!
নববর্ষ এল আজি দ্বারে
নবীন— আশ্বাস— আশা— সুখ-শান্তি আনন্দ ঝঙ্কারে
পূর্ণ করি বসুন্ধরা, অভিনব কর্ম-কোলাহল
জাগাইয়া দিকে দিকে সত্য স্নিগ্ধ গৌরব উজ্জ্বল
একনিষ্ঠ সাধনার সনে! ... ...
... ...

হে আচার্য ঋত্বিক-প্রধান !
মহান উদাত্ত-স্বরে আজ তুমি গাহিবে কি গান,
কোন্ পূত দিব্য মন্ত্রে করিবে গো আহুতি অর্পণ
সুশাশ্বত-ধ্রুববাণী লক্ষ চিত্তে জাগাবে স্পন্দন—
… … … … … …
তোমার প্রদীপ্ত জ্যোতিঃ উদ্ভাসিয়া অবনী মণ্ডল
সাফল্যের বার্তা লয়ে যজ্ঞ-চরু করি আহরণ,
আজি হেথা হউক প্রকাশ ! মাতৃপূজা-নিকেতন
তপোবনে হোক পরিণত ! হে অনাদি-নারায়ণ !
চিরশান্তি-তৃপ্তি-সুখে শুদ্ধ করি মুমুক্ষ-জীবন
নব শক্তি-চেতনায় অন্তহীন আশীষ তোমার
অলক্ষিতে অভিষিক্ত করে দিক্ অন্তর সবার !

প্রবাসী পত্রিকায় বাংলা ১৩১৮ সালের নববর্ষ সংখ্যায় জগদীশ চন্দ্রের বাংলা ভাষণটি "বিজ্ঞানে সাহিত্য" নামে প্রকাশিত হয়। পরে জগদীশ চন্দ্র ভাষণটির কিছু অংশ বাদ * দিয়ে একই নামে অব্যক্ত গ্রন্থে প্রকাশ করেন। বর্তমানে বক্তৃতাটি থেকে কিশোর পাঠ্য নির্বাচিত অংশবিশেষ তুলে ধরা হলো।]

…জন্মলাভ সূত্রে জন্মস্থানের যে একটা আকর্ষণ আছে তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু আজ এই যে সভার সভাপতির আসনে আমি স্থান লইয়াছি তাহার যুক্তি একেবারে স্বতঃসিদ্ধ নহে। প্রশ্ন হইতে পারে সাহিত্য-ক্ষেত্রে কি বিজ্ঞান সেবকের স্থান আছে ? এই সভা বাংলা দেশের সাহিত্য—সম্মিলন। ভারত সাগর যখন আপনার হৃদয়োচ্ছ্বাসিত মেঘকে আকাশে সঞ্চিত করিয়া তোলে, তখন সে আর তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। তখন তাহার বক্ষের উপর বাতাস বহিতে থাকে, এবং একদিন তাহার এই মেঘসঞ্চয়কে সে আপনার বঙ্গ উপকূলে পাঠাইয়া দেয়। অবিরাম বায়ু তাহাকে এক প্রদেশ হইতে আর এক প্রদেশে বিস্তীর্ণ করিয়া দিতে থাকে, দেখিতে দেখিতে দেশ দেশান্তর সফলতায় ভরিয়া উঠে। তেমনি বাংলা দেশের চিত্তসাগর হইতে যে সকল উচ্ছ্বাস নানা আকার ধরিয়া সঞ্চিত হইতেছে, সে কি কোনো দিক্প্রান্তে বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে।…

…এই সাহিত্য-সম্মিলন-যজ্ঞে যাঁহাদিগকে পুরোহিত পদে বরণ করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিককেও দেখিয়াছি। আমি যাঁহাকে সুহৃদ ও সহযোগী বলিয়া স্নেহ করি এবং স্বদেশীয় বলিয়া গৌরব করিয়া থাকি, সেই আমাদের দেশমান্য আচার্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র একদিন এই সম্মিলন-সভার প্রধান আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন। তাঁহাকে সমাদর করিয়া সাহিত্য-সম্মিলন যে কেবল গুণের পূজা করিয়াছেন তাহা নহে, সাহিত্যের একটি উদার মূর্তি দেশের সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য দেশে জ্ঞানরাজ্যে এখন ভেদবুদ্ধির অত্যন্ত প্রচলন হইয়াছে। সেখানে জ্ঞানের প্রত্যেক শাখাপ্রশাখা নিজকে স্বতন্ত্র রাখিবার জন্যই বিশেষ আয়োজন করিয়াছে ; তাহার ফলে নিজকে এক করিয়া জানিবার চেষ্টা এখন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। জ্ঞান-সাধনার প্রথমা-

বস্থায় এরূপ জাতিভেদ প্রথায় উপকার করে, তাহাতে উপকরণ সংগ্রহ করা এবং তাহাকে সজ্জিত করিবার সুবিধা হয় ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি কেবল প্রথাকেই অনুসরণ করি তাহা হইলে সত্যের পূর্ণমূর্তি প্রত্যক্ষ করা ঘটিয়া উঠে না ; কেবল সাধনাই চলিতে থাকে, সিদ্ধির দর্শন পাই না।...

কবি এই বিশ্বজগতে তাঁহার হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়া একটি অরূপকে দেখিতে পান. তাহাকেই তিনি রূপের মধ্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। অন্যের দেখা যেখানে ফুরাইয়া যায় সেখানেও তাঁহার ভাবের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না। সেই অপরূপ দেশের বার্তা তাঁহার কাব্যের ছন্দে ছন্দে নানা আভাষে বাজিয়া উঠিতে থাকে। বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে কিন্তু কবিত্বসাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায় সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন, শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌঁছায় সেখান হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন। প্রকাশের অতীত যে রহস্য, প্রকাশের আড়ালে বসিয়া দিনরাত্রি কাজ করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া দুর্বোধ্য উত্তর বাহির করিতেছেন, এবং সেই উত্তরকেই মানব ভাষায় যথাযথ করিরা ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত আছেন।

এই যে প্রকৃতির রহস্য-নিকেতন, ইহার নানা মহল, ইহার দ্বার অসংখ্য। প্রকৃতি-বিজ্ঞানবিদ, রাসায়নিক, জীবতত্ত্ববিদ ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া এক এক মহলে প্রবেশ করিয়াছেন, মনে করিয়াছেন সেই সেই মহলই বুঝি তাঁহার বিশেষস্থান, অন্য মহলে বুঝি তাঁহার গতিবিধি নাই। তাই জড়কে, উদ্ভিদকে, সচেতনকে, তাঁহারা অলক্ষ্যভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই বিভাগকে দেখাই যে বৈজ্ঞানিকের দেখা, একথা আমি স্বীকার করি না, কক্ষে কক্ষে সুবিধার জন্য যত দেয়াল তোলাই যাক্ না, সকল মহলেরই এক অধিষ্ঠাতা। সকল বিজ্ঞানই পরিশেষে এই সত্যকে আবিষ্কার করিবে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া যাত্রা করিয়াছে। সকল পথই যেখানে একত্র মিলিয়াছে সেইখানেই পূর্ণ সত্য। খণ্ড খণ্ড হইয়া আপনার মধ্যে অসংখ্য বিরোধ ঘটাইয়া অবস্থিত নহে। সেইজন্য প্রতিদিনই দেখিতে পাই জীবতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব, আপন আপন সীমা হারাইয়া ফেলিতেছে।

বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি, অনির্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রভেদ এই, কবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা করেন না। কবিকে সর্বদা আত্মহারা হইতে হয়, আত্মসম্বরণ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। কিন্তু কবির কবিত্ব নিজের আবেগের মধ্য হইতে তো প্রমাণ বাহির করিতে পারে না ; এজন্য তাঁহাকে উপমার ভাষা ব্যবহার করিতে হয়। সকল কথায় তাঁহাকে 'যেন' যোগ করিয়া দিতে হয়।

বৈজ্ঞানিককে যে পথ অনুসরণ করিতে হয় তাহা একান্ত বন্ধুর, এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের কঠোর পথে তাঁহাকে সর্বদা আত্মসম্বরণ করিয়া চলিতে হয়। সর্বদা তাঁহার ভাবনা পাছে নিজের মন নিজেকে ফাঁকি দেয়। এজন্য পদে পদে মনের কথাটা বাহিরের

সঙ্গে মিলাইয়া চলিতে হয়। দুই দিক হইতে যেখানে না মিলে সেখানে তিনি একদিকের কথা কোনো মতেই গ্রহণ করিতে পারেন না।

ইহার পুরস্কার এই যে তিনি যেটুকু পান তাহার চেয়ে কিছুমাত্র বেশি দাবী করিতে পারেন না বটে, কিন্তু সেটুকু তিনি কখনও কোনো অংশে দুর্বল করিয়া রাখেন না।...

...প্রতিদিন এই যে অতি বৃহৎ উদ্ভিদজগৎ আমাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রসারিত, ইহাদের জীবনের সহিত কি আমাদের জীবনের কোনো সম্বন্ধ আছে ? উদ্ভিদতত্ত্ব সম্বন্ধে অগ্রগণ্য পণ্ডিতেরা ইহাদের সঙ্গে কোনো আত্মীয়তা স্বীকার করিতে চান না। বিখ্যাত বার্ডন সেণ্ডারসন* বলেন যে কেবল দুই চারি প্রকারের গাছ ছাড়া সাধারণ বৃক্ষ, বাহিরের আঘাত, দৃশ্যভাবে কিম্বা বৈদ্যুতিক চাঞ্চল্যের দ্বারা সাড়া দেয় না। আর লাজুক জাতীয় গাছ যদিও বৈদ্যুতিক সাড়া দেয় তবু সেই সাড়া জন্তুর সাড়া হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ফেফর-প্রমুখ উদ্ভিদ শাস্ত্রের অগ্রণী পণ্ডিতগণ একবাক্যে বলিয়াছেন যে বৃক্ষ স্নায়ুহীন, আমাদের স্নায়ুসূত্র যেরূপ বাহিরের বার্তা বহণ করিয়া আনে, উদ্ভিদে এরূপ কোনো সূত্র নাই।

ইহা হইতে মনে হয় পাশাপাশি যে প্রাণী ও উদ্ভিদজীবন প্রবাহিত হইতে দেখিতেছি তাহা বিভিন্ন নিয়মে পরিচালিত। উদ্ভিদজীবনে বিবিধ সমস্যা অত্যন্ত দুরূহ— সেই দুরূহতা ভেদ করিবার অতি সূক্ষ্মদর্শী কোনো কল এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রধানতঃ এজন্যই প্রত্যক্ষপরীক্ষার পরিবর্তে অনেক স্থলে মনগড়া মতের আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে হইলে আমাদিগকে মতবাদ ছাড়িয়া পরীক্ষার প্রত্যক্ষ ফল পাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। নিজের কল্পনাকে ছাড়িয়া বৃক্ষকেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, এবং কেবলমাত্র বৃক্ষের স্বহস্ত-লিখিত বিবরণই সাক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

বৃক্ষের আভ্যন্তরিক পরিবর্তন আমরা কি করিয়া জানিব ? যদি কোনো অবস্থাগুণে বৃক্ষ উত্তেজিত হয়, বা অন্য কোনো কারণে বৃক্ষের অবসাদ উপস্থিত হয়, তবে এই সব ভিতরের অদৃশ্য পরিবর্তন আমরা বাহির হইতে কি করিয়া বুঝিব ? তাহার একমাত্র উপায়— সকল প্রকার আঘাতে গাছ যে সাড়া দেয় তাহা কোনো প্রকারে ধরিতে ও মাপিতে পারা।

জীব যখন কোনো বাহিরের শক্তি দ্বারা আহত হয় তখন সে নানারূপে তাহার সাড়া দিয়া থাকে— যদি কণ্ঠ থাকে তবে চীৎকার করিয়া, যদি মূক হয় তবে হাত পা নাড়িয়া। বাহিরের ধাক্কা কিম্বা "নাড়ার" উত্তরে "সাড়া"। নাড়ার পরিমাণ অনুসারে সাড়ার পরিমাণ মিলাইয়া দেখিলে আমরা জীবনের পরিমাণ মাপিয়া লইতে পারি। উত্তেজিত অবস্থায় অল্প নাড়ায় প্রকাণ্ড সাড়া পাওয়া যায়। অবসন্ন অবস্থায় অধিক নাড়ায় ক্ষীণ সাড়া। আর যখন মৃত্যু আসিয়া জীবকে পরাভূত করে তখন হঠাৎ সর্ব প্রকারের সাড়ার অবসান হয়।

সুতরাং বৃক্ষের আভ্যন্তরিক অবস্থা ধরা যাইতে পারিত, যদি বৃক্ষকে দিয়া তাহার সাড়াগুলি কোনো প্ররোচনায় কাগজ কলমে লিপিবদ্ধ করাইয়া লইতে পারিতাম। সেই আপাতত অসম্ভব কার্যে কোনো উপায়ে যদি সফল হইতে পারি তাহার পরে সেই নূতন লিপি এবং নূতন ভাষা আমাদিগকে শিখিয়া লইতে হইবে। নানান দেশের নানান ভাষা, সেভাষা লিখিবার অক্ষরও নানাবিধ, তার মধ্যে আবার এক নূতন লিপি প্রচার একান্ত

শোচনীয় তাহার সন্দেহ নাই। এক, লিপি সভার সভ্যগণ ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইবেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে অন্য উপায় নাই। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে গাছের লেখা কতকটা দেবনাগরীর মত— অশিক্ষিত কিম্বা অর্ধশিক্ষিতের পক্ষে একান্ত দুর্বোধ!

সে যাহা হউক মানস সিদ্ধির পক্ষে দুইটি প্রতিবন্ধক— প্রথমত গাছকে নিজের সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে সম্মত করানো, দ্বিতীয়ত গাছ ও কলের সাহায্যে তাহার সেই সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা। শিশুকে আজ্ঞাপালন অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু গাছের নিকট হইতে উত্তর আদায় করা অতি কঠিন সমস্যা। প্রথম প্রথম এই চেষ্টা অসম্ভব বলিয়াই মনে হইত। তবে বহু বৎসরের ঘনিষ্ঠতা নিবন্ধন তাহাদের প্রকৃতি অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছি। এই উপলক্ষে আজ আমি সহৃদয় সভ্যসমাজের নিকট স্বীকার করিতেছি নিরীহ গাছপালার নিকট হইতে বলপূর্বক সাক্ষ্য আদায় করিবার জন্য তাহাদের প্রতি অনেক নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছি, এর জন্য বিচিত্র প্রকারের চিমটি উদ্ভাবন করিয়াছি— সোজাসুজি অথবা ঘূর্ণায়মান। সূচ দিয়া বিদ্ধ করিয়াছি এবং এসিড দিয়া পোড়াইয়াছি। সেসব কথা অধিক বলিব না। তবে আজ জানি যে এই প্রকার জবরদস্তি দ্বারা যে সাক্ষ্য আদায় করা যায়, তাহার কোনো মূল্য নাই, ন্যায়পরায়ণ বিচারক এই সাক্ষ্যকে কৃত্রিম বলিয়া সন্দেহ করিতে পারেন।...

সর্বদা শুনিতে পাওয়া যায় যে আমাদের দেশে যথোচিত উপকরণবিশিষ্ট পরীক্ষাগারের স্বভাবে অনুসন্ধান অসম্ভব। একথা যদিও অনেক পরিমাণে সত্য, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। যদি ইহাই সত্য হইত তাহা হইলে অন্য দেশে যেখানে পরীক্ষাগার নির্মাণে কোটি মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে সেস্থান হইতে প্রতিদিন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার হইত। কিন্তু সেরূপ সংবাদ শোনা যাইতেছে না। আমাদের অনেক অসুবিধা আছে, অনেক প্রতিবন্ধক আছে সত্য কিন্তু পরের ঐশ্বর্যে আমাদের ঈর্ষা করিয়া কি লাভ? অবসাদ ঘুচাও। দুর্বলতা পরিত্যাগ কর! মনে কর, আমরা যে অবস্থাতে পড়ি না কেন সেই আমাদের প্রকৃষ্ট অবস্থা। ভারতই আমাদের কর্মভূমি, এখানেই আমাদের কর্তব্য সমাধা করিতে হইবে। যে পৌরুষ হারাইয়াছে সেই বৃথা পরিতাপ করে।

পরীক্ষাসাধনে পরীক্ষাগারের অভাব ব্যতীত আরও বিঘ্ন আছে। আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই যে প্রকৃত পরীক্ষাগার আমাদের অন্তরে। সেই অন্তরতম দেশেই অনেক পরীক্ষা পরীক্ষিত হইতেছে। অন্তরদৃষ্টিকে উজ্জ্বল রাখিতে সাধনার প্রয়োজন হয়। তাহা অল্পেই ম্লান হইয়া যায়। নিরাসক্ত একাগ্রতা যেখানে নাই সেখানে বাহিরের আয়োজনও কোনো কাজে লাগে না। কেবলই বাহিরের দিকে যাহাদের মত ছুটিয়া যায়, সত্যকে লাভ করার চেয়ে দশজনের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যাহারা লালায়িত হইয়া উঠে তাহারা সত্যের দর্শন পায় না।...

বৃক্ষের বিবিধ সাড়া লিপিবদ্ধ করিবার বিবিধ সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মানের আবশ্যকতার কথা বলিতেছিলাম। দশ বৎসর আগে যাহা কল্পনামাত্র ছিল তাহা এই কয় বৎসরের চেষ্টার পর কার্যে পরিণত হইয়াছে। সার্থকতার পূর্বে কত প্রযত্ন যে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা এখন বলিয়া লাভ নাই...তবে ইহা বলা আবশ্যক যে এই বিবিধ কলের সাহায্যে বৃক্ষের বহুবিধ সাড়া লিখিত হইবে; বৃক্ষের বৃদ্ধি মুহূর্তে মুহূর্তে নির্ণীত হইবে; স্বতঃস্পন্দন লিপিবদ্ধ

হইবে এবং জীবন ও মৃত্যুরেখা তাহার আয়ু পরিমিত করিবে। এই কলের আশ্চর্য শক্তি সম্বন্ধেই ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ইহার সাহায্যে সময় গণনা এত সূক্ষ্ম হইবে যে এক সেকেণ্ডের সহস্র ভাগের একভাগ অনায়াসে নির্ণীত হইবে। আর এক কথা শুনিয়া আপনারা প্রীত হইবেন। যে কলের নির্মাণ অন্যান্য সৌভাগ্যবান দেশেও অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে, সেই কল এদেশে আমাদেরই কারিগর দ্বারাই নির্মিত হইয়াছে। ইহার মনন ও গঠন সম্পূর্ণ এদেশীয়।...

---

* বক্তৃতাটির বর্জিত অংশটুকুর সঙ্গে "নির্বাক জীবন" প্রবন্ধটির কিছু অংশের সাদৃশ্য রয়েছে।

* * বার্ডন সেণ্ডারসন সেকালের একজন বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিদ।

ছাত্রসমাজের প্রতি

[এটি অব্যক্তের শতবার্ষিকী সংস্করণের সংযোজন। পাদটীকায় উল্লেখ আছে—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত ছাত্রসমাজের সভায় এই অভিভাষণ পঠিত বা কথিত হইয়া থাকিবে। তারিখের কোনো উল্লেখ নেই।]

ছাত্রসমাজের সভ্যগণ,

তোমাদের সাদর সম্ভাষণে আমি আপনাকে অনুগৃহীত মনে করিতেছি। তোমরা আমাকে একান্ত বিজ্ঞ এবং প্রবীণ মনে করিতেছ। বাস্তব পক্ষে যদিও জরা আমার বাহিরের অবয়বকে আক্রমণ করিয়াছে কিন্তু তাহার প্রভাব অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। আমি এখনও তোমাদের মত ছাত্র ও শিক্ষার্থী। এখনও স্কুলে যাইবার পুরাতন গলিতে পৌঁছিলে স্মৃতিদ্বারা অভিভূত হই। আমার শৈশবের শিক্ষক দর্শনে এখনও হৃদয় চিরন্তন ভক্তিপ্রবাহে উচ্ছ্বসিত হয়। তবে তোমাদের অপেক্ষা শিক্ষার জন্য দীর্ঘতর সময় পাইয়াছি ; অনেক ভুল সংশোধন করিতে পারিয়াছি এবং অনেক বার পথ হারাইয়া পরিশেষে গন্তব্য পথের সন্ধান পাইয়াছি। আজ যদি কোনো ভুলচুক কিম্বা দুর্বলতার বিরুদ্ধে তীব্রভাষা ব্যবহার করি তবে মনে রাখিও যে সেসব কষাঘাত হইতে নিজেকে কোনদিন বঞ্চিত করি নাই। কুসুমশয্যায় সুপ্ত থাকিবার সময় অতীত হইয়াছে ; কণ্টকশয্যাই আমাদিগকে এখন জাগরিত রাখিবে।

এখন আমাদের দেশে সচরাচর দুই শ্রেণীর উপদেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ আমাদের জাতীয় দুর্বলতার চিত্র অতি ভীষণ রূপে চিত্রিত করেন। যে দেশে এরূপ জাতিভেদ ও দলাদলি, যে দেশ দাসত্বসুলভ বহু দোষে দোষী, যে দেশে পরস্পরে এত হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা দেখা যায়, সে দেশে কি কোনদিন উন্নতি হইতে পারে ? আশ্চর্যের বিষয় এই যে এইরূপ ভয়ানক ভবিষ্যদ্বাণীর পর তাহাদের নিদ্রার কোনো ব্যাঘাত

হয় না। যদি যথার্থই বুঝিয়া থাক যে দেশে এরূপ দুর্দিন আসিয়াছে তবে কেন বদ্ধপরিকর হইয়া তাহার প্রতিবিধান করিতে চেষ্টা কর না। আমি দেখিতে পাই ছাত্রদের মধ্যে, আমাদের নেতারা কেন এ কাজ করিলেন, কেন এ কাজ করিলেন না, এরূপ বচসা দ্বারাই সময় অতিবাহিত হয়। পরের কর্তব্য কি তাহা নিষ্পত্তি করিবার আমি কে? আমি কি করিতে পারি ইহাই কেবল আমার ভাবিবার বিষয়।

আবার অন্যদিকে একদল আছেন যাহারা অতীত কালের কথা লইয়া বর্তমান ভুলিয়া থাকেন। জ্ঞান ও বিজ্ঞানে আমাদের পূর্বপুরুষদের কিছুই অবিদিত ছিল না। আমাদের পূর্ব ঐশ্বর্য যদি এতই মহান তবে আমাদের অধঃপতনের হেতু কি? ইহার প্রতিবিধান কি নাই? আমরা যদি সেই মহান পুর্বপুরুষদের প্রকৃত বংশধর হই তাহা হইলে আমরা নিঃসন্দেহে পূর্ব গৌরব অধিকার করিতে পারিবই পারিব।

পৃথিবীব্যাপী ভ্রমণ উপলক্ষে আমি দ্বিবিধ জাতীয় চরিত্র লক্ষ্য করিয়াছি। একজাতীয় চরিত্র এই যে, তাঁহারা গতকালের স্মৃতি লইয়া বৃথাগর্বে ভুলিয়া আছেন। পৃথিবী যে স্থাবর নয়, ইহা যে চিরপরিবর্তনশীল একথা তাহাদের বোধগম্য হয় না। এইসব ধর্মাক্রান্ত জাতির চিহ্ন পর্যন্ত পৃথিবী হইতে মুছিয়া যাইতেছে। ইজিপ্ট আসীরিয়া এবং বাবিলন— ইহাদের গত স্মৃতি ছাড়া আর কি আছে?

চীনদেশে ভ্রমনকালে সে স্থানের বিখ্যাত কয়েকজন পণ্ডিতের সহিত আমার পরিচয় হয়। তখন জাপান মাঞ্চুরিয়া গ্রাস ব্যাপারে প্রবৃত্ত ছিল। আমি আমার চীনা বন্ধুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার কি করিরা চীনের স্বাধীনতা রক্ষা করিবেন? তখন তাঁহারা বলিলেন, চীনদেশের মতো যে দেশ বহু প্রাচীন কাল হইতে সভ্যতার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, সে দেশকে কি সেদিনের জাপান পরাভূত করিতে পারে। বরঞ্চ আমাদের সভ্যতাই জাপানকে পরাস্ত করিবে। এইসব কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম যে শীঘ্রই চীনের সৌভাগ্য সূর্য অস্তমিত হইবে।

অন্যদিকে তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী জাপান পুরাতন কথা বলিয়া সময় অপচয় করিতে চাহেন না। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ লইয়া তাঁহারা যথেষ্ট ব্যস্ত। তাঁহাদের নিকট শুনিলাম যে মানবসমাজের নিয়ম আর Law of hydrostatic pressure একই। যে স্থানে pressure বেশি সে স্থান হইতে জলস্রোত অল্প pressure-এর দিকে ধাবিত হয়। জীবনস্রোতও সজীব হইতে নির্জীবের দিকে। পৃথিবীতে সজীব নির্জীবের স্থান অধিকার করিবে।

অথচ সেই জাপানে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম যে বিদ্যা ও বুদ্ধিতে ভারত-বর্ষীয় ছাত্র সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানীদেরও উপরে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। বিদ্যাবুদ্ধির ত্রুটি নাই, তবে এরূপ দুর্দশা কেন।

আমি আজ ত্রিশ বৎসর যাবৎ শিক্ষকতার কাজ করিয়াছি। ইহার মধ্যে ন্যূনকল্পে দশ হাজার ছাত্রের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে। তাহাদের চরিত্রে কি কি গুণ তাহা জানি আর কি কি দুর্বলতা তাহাও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। প্রধানতঃ তাহাদের স্বভাব অতি কোমল, সাধারণতঃ তাহারা নম্রপ্রকৃতি, অতি সহজেই তাহাদের হৃদয় অধিকার করা

যায় ; এক কথায় তাহারা বড় ভালমানুষ, একবার পথ দেখাইয়া দিলে অনেকেই সেই পথ অনুসরণ করিতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ জলপ্লাবন, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি দুর্ঘটনার সময় ছাত্রদের মধ্যে অদ্ভুত কার্যপরায়ণতা দেখা গিয়াছে। এতগুলি ছেলে কি সুন্দরভাবে নিজেকে organise করিয়াছে। বেশি কথা না বলিয়া অতি সংযতভাবে কি সুন্দররূপে লোকসেবা করিয়াছে। এরূপ শুশ্রূষা করিবার ক্ষমতা, এরূপ ধৈর্য, এরূপ কষ্ট সহিষ্ণুতা, এরূপ অসন্তুষ্টির অভাব সচরাচর দেখা যায় না। আমি যেসব গুণ বর্ণনা করিলাম তাহা পুরুষে প্রায় দেখা যায় না, নারীজাতিই এসব মহৎগুণের অধিকারিনী।

ইহার বিপরীত কেন্দ্রে কোনো কোনো পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায় যাহাদের চরিত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার। তাঁহাদের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা একেবারেই নাই, তাঁহারা কিছুই মানিয়া লইতে চাহেন না, তাঁহারা সর্বদাই অসন্তুষ্ট, তাঁহাদের হৃদয় দুর্জয় ক্রোধে পূর্ণ। এইরূপ লোকের জাতীয় জীবনে স্থান কোথায় ?

আমি এইরূপ প্রকৃতির একজনকে জানিতাম তিনি চিরস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সমাজের নির্মম বিধানে, তাঁহার ক্রোধ সর্বদা উদ্দীপ্ত থাকিত। আশ্চর্য এই যে ক্রোধ ও মমতা অনেকসময় একাধারেই দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগরের ন্যায় কোমলহৃদয় আর কোথায় দেখিতে পাওয়া যায় ? তিনি কোনো বিধানই মানিয়া লইতেন না ; অসীম শক্তিবলে তিনি একাই সমাজের কঠিন শৃঙ্খল ভগ্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই প্রকার দুর্দান্ত ও ক্রোধপরায়ণ লোক কখন কখন জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহাদের জীবন নিস্ফলতাতেই পর্যবসিত হয়, তাহাদের ধৈর্য নাই, তাহাদের সহিষ্ণুতা নাই। দেশব্যাপী রোগের সেবা ও পরিচর্যা ? পীড়ারও অন্তনাই, শুশ্রূষারও অন্ত নাই, এরূপ কতকাল চলিবে ? ইহার কি প্রতিবিধান নাই ? কি করিয়া ম্যালেরিয়া দেশ হইতে দূর করা যায় ? এরূপ জঙ্গল ও ডোবার মধ্যে মানুষ কি করিয়া বাঁচিতে পারে ? ইহার প্রতিকার নিশ্চয়ই আছে।

তাছাড়া আরও শত শত কার্য আছে, সাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রচার, জ্ঞান প্রচার, শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতি, দেশবিদেশে ভারতের মহিমা বৃদ্ধি করা। দুর্বল ভালমানুষের দ্বারা এসব হইবে না, এইসবের জন্য বিক্রমশীল পুরুষের আবশ্যক, তাহাদের পূর্ণ শক্তির আঘাতে সব বাধাবিঘ্ন শূন্যে মিশিয়া যাইবে।

আর যে শক্তির ক্রোড়ে আমরা এতদিন নিশ্চেষ্ট ও সুপ্তভাবে জীবনযাপন করিয়াছি, জগৎ হইতে সেই শান্তি অপসৃত হইতেছে। শান্তি কোনো জাতির পৈতৃক অথবা চিরসম্পত্তি নহে ; বল দ্বারা, শক্তি দ্বারা, জীবন দ্বারা শান্তি আহরণ করিতে এবং রক্ষা করিতে হয়। বলযুক্ত হও, শক্তিমান্ হও, এবং তোমাদের শক্তি দেশের সেবায় এবং দুর্বলের সেবায় নিয়োজিত হউক।

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের নবম বার্ষিকী উৎসবে আচার্য বসুর বক্তৃতা ঃ
৩০শে নভেম্বর ১৯২৬ স্থান ঃ বসু বিজ্ঞান মন্দির

[**আনন্দবাজার পত্রিকায় সংযোজন ঃ** বক্তৃতা আরম্ভ হইবার বহু পূর্বেই বক্তৃতা গৃহ লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছিল। স্থানাভাবে বহুলোক বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে অধ্যাপক যদুনাথ সরকার, বিচারপতি মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, দ্বারিকানাথ মিত্র, দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রসিদ্ধ চিকিৎসক নীলরতন সরকার, বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল ও বহু ইংরেজ ও বাঙালী সুধী উপস্থিত ছিলেন।]

আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত আচার্যের ভাষণের নির্বাচিত অংশবিশেষ।

উদ্ভিদ ও প্রাণী এই দুইএর জীবন ক্রিয়ার মধ্যে আপাত দৃষ্টিতে যেরূপ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় সেরূপ অসাধারণ পার্থক্য অন্যত্র কুত্রাপি দেখা যায় বলিয়া মনে হয় না। কোনো প্রাণীকে আঘাত করিলে সে শিহরণ দ্বারা আঘাতের অনুভূতি জ্ঞাপন করে, কিন্তু সাধারণ উদ্ভিদের অঙ্গে আঘাতের পর আঘাত করিলেও সেরূপ কোনো সাড়া পাওয়া যায় না। প্রাণীর চেতনেন্দ্রিয় আছে, এই ইন্দ্রিয়গুলি শুঁয়ার মতো, বাহিরের আঘাতের স্পর্শ ইহারা আকর্ষণ করিয়া লয়। আঘাতজনিত উত্তেজনার স্পন্দন, স্নায়ু-মণ্ডলীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া দূরাবস্থিত চেতনেন্দ্রিয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে আন্দোলিত করিয়া তোলে। উদ্ভিদের এইরূপ কোনো সম্প্রবাহিক স্নায়ুমণ্ডলী নাই বলিয়াই সাধারণের অনুমান। প্রাণী-দেহে একটি স্পন্দনশীল যন্ত্র আছে, সঞ্জীবনী রস সদা প্রবহমান রাখিবার জন্য জীবিত দেহের মধ্যে এই যন্ত্র অবিরাম স্পন্দিত হইতে থাকে। উদ্ভিদের এইরূপ কোনো যন্ত্র আছে বলিয়া কেহ স্বীকার করেন না। সুতরাং দেখা যাইতেছে দুইটি জীবন নদী পাশাপাশি বহিয়া যাইতেছে, অথচ তাহাদের মধ্যে কোথাও কোনো ঐক্য নাই। এই মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত— ভিত্তিহীন কল্পনা প্রসূত জাড্য প্রভাবেই জ্ঞানের উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়াছে।

উদ্ভিদ দেহের অভ্যন্তরে আমাদের দৃষ্টির অগোচর গভীর অন্ধকারের মধ্যে তাহার জীবনীক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে। উদ্ভিদ জীবনের অনুসন্ধিৎসুর পক্ষে প্রতিপদে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। তাহার কারণ এই যে, ইহার জটিল জীবনীক্রিয়া জানিতে হইলে ইহার প্রাণের ক্ষুদ্রতম অংশ "প্রাণ অণুর" সন্ধান করা এবং তাহার স্পন্দনের স্বরূপ জানা আবশ্যক। যখন অণুবীক্ষণের দৃষ্টি ব্যর্থ হয়, তখনো আমাদিগকে অদৃশ্যের সন্ধানে চলিতে হয়, সেজন্য আমাদিগকে এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্র আবিষ্কার করিতে হয়, যাহার সহায়ে আলোকোর্মি অপেক্ষাও মৃদুতর হিল্লোলকে দৃষ্টিগোচর করা এবং তাহার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়। আমার বিজ্ঞান মন্দিরে স্বয়ং লেখ যন্ত্রের আবিষ্কার দ্বারা এই কার্য সম্পন্ন করা সম্ভব

হইয়াছে— এই যন্ত্র সাহায্যে ক্ষুদ্রতম জিনিষকে এক কোটি হইতে পাঁচ কোটি গুণ বড় করিয়া দেখা যায়। সাধারণ অণুবীক্ষণের দ্বারাই একটা নূতন জগৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে ; এই সূক্ষ্মাতিতম সূক্ষ্মাণুবীক্ষণ সহায়ে আমরা নিশ্চয়ই আরো এমন অনেক তত্ত্ব জ্ঞাত হইতে পারিব যাহাদের সম্বন্ধে বর্তমানে আমাদের কোনো ধারণাই নাই।

পঞ্চবিংশতি বর্ষাধিক পূর্বে প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, সাধারণ উদ্ভিদের মধ্যে অনুসন্ধান করার বিশেষ সুবিধা বিদ্যমান— এই অনুসন্ধান কার্য-দ্বারা প্রাণী জীবনের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান সম্ভব। আমার বিশ্বাস এবং দীর্ঘ অধ্যবসায় সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে। আমি প্রাণক্রিয়ার মূল তথ্যের সন্ধানে ছিলাম— সমস্ত প্রকার প্রাণযন্ত্রের ক্রিয়া প্রণালী একই নিয়াম চালিত হয় আমি এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

আমার যন্ত্র-সমূহের অসাধারণ ক্ষমতা এবং অনুসন্ধানের অদ্ভুত সাফল্য প্রাণরহস্য উদঘাটনের যে সম্ভাবনা দেখাইয়াছে, তাহার ফলে সর্বত্র একটা প্রবল উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। ফলে আমি ইউরোপের প্রধানতম বিজ্ঞানুশীলন কেন্দ্র সমূহ হইতে বক্তৃতা দেওয়া এবং অনুসন্ধান প্রণালী প্রদর্শন করার জন্য আমন্ত্রণ পাই। আমার সূক্ষ্ম অতিসহজে ভগ্নপ্রবণ যন্ত্র সমূহ নিরাপদে স্থানান্তরিত করা প্রায় অনতিক্রমণীয় বিঘ্ন বলিয়া মনে হইল। কোনো বাহকের হস্তে বিশ্বাস করিয়া ঐ সমস্ত যন্ত্র অর্পণ করা যায় না, নিজে তাহাদিগকে বহিয়া লইয়া যাইতে হইল। ইংলণ্ডে আমি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় এবং সোসাইটি অব আর্টসের (চারু শিল্পসমিতি) সমক্ষে বক্তৃতা করি ; উদ্ভিদ এবং প্রাণিদেহে ক্ষারধর্ম বিশিষ্ট বিবিধ দ্রব্যের (Alkaloids) সমক্রিয়া প্রদর্শন করিবার জন্য রয়েল সোসাইটি অব মেডিসিন আমাকে আমন্ত্রণ করেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিদাঘাবসরে আমার বক্তৃতার বিষয় ছিল— "বিজ্ঞানের উন্নতিতে ভারতের দানের গুরুত্ব।"

সর্বত্রই বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। অক্সফোর্ড ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েসনের নিকট প্রদত্ত আমার বক্তৃতা বহুদূর পর্যন্ত এত প্রবল উৎসাহের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিল যে সমস্ত বক্তৃতাটি তার যোগে পৃথিবীর সর্বত্র প্রেরিত হইয়াছিল এবং পরদিনই প্রাতঃকালে ইয়োরোপ ও আমেরিকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, ইয়োরোপ এবং আমেরিকায় একসঙ্গে আমার অনুসন্ধান ফলের একটি সাধারণ-গ্রাহ্য বর্ণনা প্রকাশিত হইবে।

মহামান্য বেলজিয়ম সম্রাট ভারত ভ্রমণকালে আমার বিজ্ঞান মন্দিরে অনুসন্ধান কার্য দেখিয়া বিশেষ তুষ্টিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি জীবন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাকে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করেন। রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ধারাবাহিক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। সভাসদ্‌মণ্ডলী পরিবৃত সম্রাট বাহাদুর স্বয়ং এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যবৃন্দ এই বক্তৃতা শুনিবার জন্য উপস্থিত ছিলেন। আমার পরীক্ষা কার্যের জন্য রাজকীয় উদ্যানে পূর্ব হইতেই উপযুক্ত বৃক্ষ জন্মান হইয়াছিল, —তাহার ফলে আমার প্রদর্শনী বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। প্যারিতে আমি সোর্বোন এবং নেচারাল হিস্টি মিউজিয়ামে বক্তৃতা করি। চিকিৎসক এবং প্রাণিতত্ত্ব বিদ্‌গণ আমার আবিষ্কার পন্থা এবং অনুসন্ধান

ফলের বিশেষ প্রশংসা করেন। ল্যাটিনভাষী দেশ সমূহে জিজ্ঞাসুদের আকাঙখা পূরণকল্পে, বিখ্যাত বিজ্ঞান পুস্তক প্রকাশকগণ আমার পুস্তকের ফরাসী সংস্করণ প্রকাশ করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন।...

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের দশম বৎসর পূর্তি উপলক্ষে আচার্য বসুর বক্তৃতা। স্থান ঃ বসু বিজ্ঞান মন্দির।

[বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ ৩০, ১১, ২৭ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নিচের লেখাটি তারই অংশবিশেষ।]

দশ বৎসর পূর্বে মানবজাতির ভাগ্যাকাশ যখন মহাযুদ্ধের ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন ছিল, সে সময় আমি এই বিজ্ঞান মন্দির মানবজাতির কল্যাণে উৎসর্গ করি। এই রূপ মহাসমস্যার সময়ই মানুষ অসত্যের-মধ্য হইতে সত্যকে বাছিয়া লইতে পারে এবং যাহা চিরন্তন সত্য তাহারই সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে পারে— তখনই সত্য-সাধনার জন্য মন্দির নির্মিত হয়।

একক শক্তির পক্ষে যাহা অসম্ভব আমি তাহাই সম্ভব করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। এই বিজ্ঞান মন্দির যে নিষ্ঠার স্মৃতি-উৎসব করিতেছে, সে নিষ্ঠার অর্থ এই যে, কেহ যদি কোনো মহৎ কার্যের জন্য সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করে তাহা হইলে বদ্ধদ্বার তাহার নিকট উন্মুক্ত হইবে, যাহা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব তাহা তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে। প্রাণী এবং অ-প্রাণী সংক্রান্ত নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধান চেষ্টাই এই বিজ্ঞান মন্দিরের উদ্দেশ্য। জড় পদার্থের মধ্যে যে চৈতন্যের সাড়া পাওয়া গিয়াছে এবং উদ্ভিদজীবন যেরূপ অপ্রত্যাশিত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহার ফলে পদার্থ-বিজ্ঞান, শরীর-বিজ্ঞান, ঔষধি-বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ক্ষেত্র বিশেষ রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার গুরুত্ব যে শুধু সিদ্ধান্তাত্মক তাহা নহে, ইহার ব্যবহারিক গুরুত্বও আছে।

যাহারা অনন্য তৎপর ইহয়া অহৈতুকী জ্ঞানান্বেষণের জন্য চরিত্র বল ও দৃঢ় নিষ্ঠা সহকারে সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিতে পারিবে আমি তাহাদিগকেই আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়াছিলাম। জাতিধর্ম, পুং-স্ত্রী নির্বিশেষে চিরকাল সকলের মধ্যে যতদূর সম্ভব জ্ঞান প্রচার এই মন্দিরের আর একটি উদ্দেশ্য। এই বিজ্ঞান মন্দিরের স্বল্প স্থানের মধ্যে যতদূর সম্ভব— সকল দেশের কর্মীকে সুযোগ দেওয়ারও আমার ইচ্ছা আছে। বহু শতাব্দী পূর্বে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে বিদ্যার্থীগণ আসিয়া নালান্দা এবং তক্ষশীলায় সমবেত হইত, আমি আমার দেশের সেই প্রথারই অনুসরণ করিতেছি।

আমার আশা এই যে এই স্থানে মানবজাতির কল্যাণের জন্য যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার হইবে, তাহার ফলে এই কথাটি স্বীকৃত হইবে যে, ভারতের দান ভিন্ন জগতের জ্ঞান ভাণ্ডার অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। আমি আরো আশা করিয়াছিলাম যে, এই বিজ্ঞান

মন্দিরের শিক্ষা এবং সাফল্য এদেশের লোকের মধ্যে যে আবিষ্কার ও উদ্ভাবনী শক্তি রহিয়াছে তাহা প্রমাণ করিবে এবং তাহারা দেশের নিহীত সম্পদ বৈজ্ঞানিক উপায়ে কাজে লাগাইতে পারিবে।

প্রাণী ও অ-প্রাণী

সত্যের অনুসরণ করিতে করিতে আমি অজ্ঞাতসারে জড়বিজ্ঞান এবং শারীর বিজ্ঞানের সীমারেখায় আসিয়া পৌঁছাই। আমি সবিস্ময়ে দেখিতে পাই যে, জড় ও চৈতন্যের সীমা-রেখ ক্রমশ লোপ পাইতেছে। জড়মাত্রই অচেতন নহে। চতুর্দিকে শক্তির খেলা দেখিয়া জড়ও সাড়া দেয়। ধাতব পদার্থ, উদ্ভিদ এবং জীব সকলেই যেন একই নিয়মের অধীন। সকলেই ক্লান্তি ও অবসাদের পরিচয় দেয়, জীবনের পরিচয় দেয়, আবার মৃত্যুর মতো অসাড়তার লক্ষণও তাহারা প্রকাশ করে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে কথা ঘোষণা করা হয়। এই আবিষ্কারের পূর্ণ মূল্য বুঝিতে দীর্ঘ ২৭ বৎসর সময়ের আবশ্যক হইয়াছে। এবৎসর আমেরিকায় রাসায়নিকদের মহাসভায় ঠিক ঠিক আমার কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করিয়া সভাপতি মহোদয় বলিয়াছেন যে, অ-জৈব ও জৈব জগতে যেমন কোনো পার্থক্য নাই, তেমনি প্রাণী-ও অপ্রাণীর মধ্যেও কোন পার্থক্য নাই বলিয়া বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে একটা বদ্ধমূল ধারণা জন্মিতেছে।

অঙ্গ সঞ্চালনই প্রাণের লক্ষণ। অজৈব পদার্থও এই সচলতার লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে, এই দেখুন একটি পুকুর। উপরে শেওলা ভাসিতেছে। জলের মধ্যে অজৈব পদার্থের বীজ ছড়াইয়া দিলাম, দেখুন তাহারা প্রাণীর মতো কেমন দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। আমি জলের উপরিভাগ জমাইয়া দিতেছি, দেখুন ভাসমান বরফ দেখা যাইতেছে। বরফের হ্রদে এই বীজগুলির চলচ্ছক্তি রুদ্ধ হইয়াছে।

খণ্ডসত্য সংগ্রহ করিয়া ভারতীয়গণ কখনো সন্তুষ্ট থাকে না। একটা তথ্য আবিষ্কার করিলেই সে নিশ্চিন্ত হয় না। অমনি তাহার মনে প্রশ্ন ওঠে, বিশ্বসৃষ্টির সহিত এই ব্যাপারের কি সম্পর্ক? আপাতদৃষ্টিতে পারস্পরিক বিরোধী— সত্যগুলির সংযোগসূত্র কোথায় তাহার সন্ধানে সে ব্যস্ত হয়। বহু কষ্টে সে যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছে সে সমস্ত একত্র করিয়া সে বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি করে।

উদ্ভিদ ও প্রাণী

জড় ও সুব্যক্ত প্রাণী জগতের অন্তরালে রহিয়াছে অব্যক্তপ্রাণ উদ্ভিদের রাজ্য। সকলের মনেই একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে যে, উদ্ভিদের প্রাণ আছে; কিন্তু সাধারণ প্রাণীর মতই কি তাহাদের প্রাণক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়? বিশেষজ্ঞগণ সকলেই বলেন যে, উদ্ভিদের প্রাণক্রিয়া একটু স্বতন্ত্র রকমের। প্রাণীদেহের তন্ত্রীগুলির সংকোচ, প্রসারণ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য আছে। সাধারণ উদ্ভিদ নাকি আঘাতে সাড়া দেয় না, তাহাদের নাকি কোন স্পন্দমান তন্ত্রী নাই। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। এই সমস্ত ভ্রমাত্মক ধারণাই উদ্ভিদ জীবনের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের পথ রোধ করিয়া রাখিয়াছে।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে রয়াল সোসাইটির সম্মুখে আমি দেখাই যে, বৈদ্যুতিক

প্রবাহের আঘাতে সকল উদ্ভিদই সাড়া দেয় এবং তাহা হইতেই উদ্ভিদের অস্তিত্বের প্রাণ প্রমাণ হয়; কিন্তু সে সময় আমার উক্তি প্রচলিত মতবাদের বিরোধী ছিল বলিয়া ঘোর বিতর্ক উপস্থিত হয়।

নূতন মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে প্রচলিত মতবাদকে অস্বীকার করা ভিন্ন উপায় নাই, —যিনি নূতন মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন, তিনি তাহা জানেন; সুতরাং আমি আশা করি নাই যে, আমার মতবাদ জীবিতকালের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। কিন্তু যে মহাশক্তি একটা জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে, সে শক্তির ইচ্ছা অন্যরূপ। যে মহাশক্তি আমাকে আমার চেষ্টায় নিরত রাখিয়াছে এবং যাহার ফলে আমি সত্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছি, আমি সেই মহাশক্তির নিকট মস্তক অবনত করিতেছি।

আমার আবিষ্কারের ফল এতকাল প্রচলিত মতবাদের এত বিরোধী যে, আমার উদ্ভাবিত যন্ত্রগুলি ঠিক কিনা, তৎসম্বন্ধে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে বসন্তকালে "টাইমস্" পত্রিকায় এক বিতর্ক উপস্থিত হয়। রয়াল সোসাইটির কতিপয় বিশিষ্ট সদস্য লইয়া গঠিত একটি কমিটি আমার যন্ত্রগুলি পরীক্ষা করেন। খ্যাতনামা পদার্থবিদ স্যর উইলিয়াম এবং খ্যাতনামা শরীরতত্ত্ববিদ্ উইলিয়াম বেলিস সেই কমিটিতে ছিলেন। তাঁহারা রিপোর্ট করেন যে, আমার "ম্যাগনেটিক ক্রেস্কোগ্রাফ" নামক যন্ত্র উদ্ভিদের সাড়ার লক্ষণ এক কোটিগুণ বড়ো করিয়া দেখাইতে সমর্থ, ইহা তাঁহারা নানা প্রকারে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। অক্সফোর্ডে ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের শ্রোতারা আমার আবিষ্কারের কিরূপ প্রশংসা করিয়াছেন তাহা আপনাদের স্মরণ আছে।

নিম্নলিখিত উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্গণ বিশেষ খ্যাতনামা— বার্লিনের হাবার ল্যাণ্ড, ভিয়েনার মলিশ, প্রাগের প্রিগসিম এবং নেমেক, জেনেভার সোদাৎ, প্যারিসের মাঙ্গিন, রাশিয়ার টিমিরিয়াজেফ এবং ইংলণ্ডের ভাইনস্। আমার আবিষ্কারের ফলে প্রাণ রহস্যের যে নূতন দ্বার উদঘাটিত হইয়াছে তাহা ইহারা সকলেই স্বীকার করেন। ইংলণ্ডের প্রবীণ বৈজ্ঞানিক এবং চিন্তাশীলগণ ভারত সরকারের নিকট একখানা আবেদন করিয়া জানাইয়াছেন যে জ্ঞান প্রচারে ভারতের যে গৌরব ছিল সেই গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠায় এই বিজ্ঞান মন্দিরের একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে।...

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ

[এই ভাষণটি ইং ১৯২৫ সালের ২১শে ডিসেম্বর তারিখের। পরদিন ২২.১২.১৯২৫ তারিখে ভাষণটি আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নীচের ভাষণটি আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত ভাষণের অংশবিশেষ।

উল্লেখ্য, ১৯২৫ সালের ১৬ই নভেম্বর তারিখে এই বক্তৃতা প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ

জানিয়ে লক্ষ্ণৌ থেকে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় একটি সুন্দর চিঠি লেখেন জগদীশ চন্দ্রকে। পাঠকদের উদ্দেশ্যে সেই অপ্রকাশিত চিঠিটি তুলে ধরা হলো।]

Lucknow 1925
16th November,

Dear Sir Jagadish,

It seems an age since you visited the Hindu University. I write to day to request you to be good enough to repeat your visit and to deliver the Convocation address at the next Convocation which will be held on the 19th proximo. I hope you will accept the invitation. I need hardly say that we shall all be grateful for it. I hope the date will suit you. Kindly favour me with a reply by wire or letter at the "Benares Hindu University," where I hope to reach after two days. Kindly convey my invitation to Lady Bose also. I hope she too will come. I hope you are both quite well. Looking forward to the pleasure of meeting you.

Dr. Sir Jagadis Chandra Bose
Calcutta. F. P. S.

Yours Sincerely
S/d M. M. Malaviya

স্মরণ করা যেতে পারে ১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় কাশী-হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। চৌঠা ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্‌বোধন উপলক্ষেও আচার্য জগদীশচন্দ্র ভাষণ দিয়েছিলেন।

......বীজাভ্যন্তরাস্থিত প্রত্যেকটি বীজাণুর একদিন বিশাল বটবৃক্ষে পরিণত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। অঙ্কুর যেমন একদিকে দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইবার জন্য মাটির বুক চিরিয়া মূল প্রবেশ করাইয়া দেয়, অন্যদিকে তেমনি সে আলোকের সন্ধানে মাথা তুলিয়া আকাশের দিকে ধাবিত হয়— পত্রমণ্ডিত শাখাপ্রশাখা চতুর্দিকে ছড়াইয়া দেয়।

সর্বপ্রকার সংগ্রামে জয়ী হইবার এই শক্তি বৃক্ষ কোথা হইতে পায়? তাহার জন্মস্থান হইতে; পরিবর্তন বোধ ও তৎসঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষায়—তাহার জন্মস্মৃতি হইতেই সে এ ক্ষমতা পায়। ঐ স্থান এবং স্থানীয় যাহা কিছু তাহা হইতেই সে জীবনীশক্তি পায়। এই সমস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে হতভাগ্য, বিদেশী চিন্তাধারায় এবং বিদেশী পন্থায় পরিবর্ধিত হয় তাহার চরমগতি কোথায়? মৃত্যু তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছে। ধ্বংসই তাহার একমাত্র পরিণতি।

আমাদের জাতীয় জীবনে এইরূপ কোনো শক্তি আছে কিনা, যদ্বারা আমরা সর্বদাই নবীন

জীবন লাভ করিতে পারি? আমাদের অতীত কি কেবল স্মৃতিতেই পর্যবসিত হইবে, না আমাদের নবীন জীবন সঞ্চারের শক্তিস্বরূপ হইবে? অতীতের এই নিহিত শক্তি যে জাগরূপ আছে, তাহার প্রমাণ বিদ্যার এই প্রাচীন পীঠস্থানে চার হাজার বৎসর ধরিয়া অবিরত বিদ্যার চর্চা হইয়া আসিতেছে; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে এমন একটা নিহিত শক্তি আছে, যাহা কালের সর্ববিধ্বংসী ক্ষমতাকে অগ্রাহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছে। যে সভ্যতা অসংখ্য পরিবর্তন সহ্য করিয়া আজও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, যে সভ্যতা মিশরের, অ্যাসিরিয়ার এবং বাবিলনের সভ্যতার উত্থান পতন দেখিয়া আজও বাঁচিয়া আছে, যে সভ্যতা অতীতের সেই দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া ভবিষ্যতের দিকে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সেই সভ্যতার মধ্যে এই শক্তি নিশ্চয়ই নিহিত আছে।

এই চিন্তায়ই যেন আমরা আত্মতৃপ্তি লাভ না করি, কারণ আমাদের জাতীয় জীবনে এখন ভাটা পড়িয়াছে। আমাদের সম্মুখে যে বিপদ উপস্থিত, তাহা অতীতের বিপদ হইতেও কঠোরতর। অতীতে আমাদের কি শক্তি ছিল এবং বর্তমানে কেন আমরা সে শক্তি হারাইলাম, তাহা আমাদিগকে জানিতে হইবে।

বিদ্যার অনুসরণ

সমালোচকগণের মতে স্থায়ী জ্ঞান প্রসারে ভারত অপটু। তাঁহারা বলেন যে যেখানে শাস্ত্রের আদেশ মুক্তির উপরে প্রভুত্ব করে, যে দেশ আয়তনে এত বৃহৎ এবং বহুধা বিভক্ত তথায় সত্য-জ্ঞানের প্রচার সম্ভব নহে। অপর পক্ষ আবার ঠিক ইহার উল্টা কথা বলেন। কাহার কথা ঠিক? পশ্চিমে দ্বারকা হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্বে পুরী এবং দক্ষিণে রামেশ্বরম হইতে উত্তরে কেদারনাথ পর্যন্ত ভারতের সমস্ত ভূভাগ ভ্রমণ করিবার পর আমি বুঝিতে পারিলাম, কোন শক্তি এই দেশকে সংহত রাখিয়াছিল।

প্রাচীন আদর্শ

শাস্ত্রের গোঁড়ামীর মতো বিদ্যার প্রসারের প্রতিবন্ধক আর কিছুই নাই। সকলেই জানেন যে, গ্যালিলিওকে বাধ্য হইয়া স্বমত পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল, ব্রুনোকে পোড়াইয়া মারা হইয়াছিল। কয়েকমাস মাত্র পূর্বে উন্নতিশীল আমেরিকায় অভিব্যক্তিবাদ প্রচার করায় একব্যক্তির সাজা হইয়াছে।

ধর্মের একদেশদর্শিতা ভারতের বিদ্যানুশীলনের প্রতিবন্ধক হইয়াছে কি না? সকলেই জানেন যে, এখানে দুইটি বিভিন্ন চিন্তাধারা পাশাপাশি বাড়িয়া উঠিয়াছিল। এই দুইটি চিন্তাধারা দুই পথে ধাবিত হইয়াছিল— একটি ভক্তির, বিশ্বাসের পথ— আর একটি জ্ঞানের মুক্তির পথ। কাহারও মতবাদের জন্য কাহাকেও দণ্ডিত করা হইত না। এই দেশের লোক মনে করিত যে, যিনি সৃষ্টির নিত্য নূতন রহস্যে আমাদিগকে সমাবৃত রাখিয়াছেন — যিনি ধূলিকণার পরমাণুর মধ্যে বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য নিহিত করিয়াছেন, তিনিই আমাদিগের মধ্যে জ্ঞানের পিপাসা দিয়া রাখিয়াছেন।

পুরাকালে চার বিদ্যার প্রতীকস্বরূপ এই বিদ্যাপীঠে চারটি প্রদীপ রাখা হইত, অতি দূর স্থান হইতে আসিয়াও যদি কেহ এই স্থানের পণ্ডিতদিগকে তর্কে পরাজিত করিতে

পারিতেন, তবে এই প্রদীপ নির্বাপিত করা হইত। আবার বিজয়ীকে পরাজিত করিতে পারিলে তবে এই প্রদীপ পুনঃ প্রজ্বলিত হইত। স্বাধীন চিন্তার উৎকৃষ্টতর উদাহরণ ইহা হইতে আর কি হইতে পারে?

জ্ঞানের অনুশীলন কোনো বিশেষ প্রদেশে নিবদ্ধ ছিল না। পশ্চিমে তক্ষশিলায়, উত্তরে নালান্দায় এবং দক্ষিণে কাঞ্চীপুরে বহু শতাব্দী ধরিয়া জ্ঞানের দীপশিক্ষা প্রজ্বলিত ছিল। জ্ঞানপ্রচারেও কোনপ্রকার ভৌগোলিক বাধা ছিল না। আচার্য শঙ্কর তর্কসংগ্রামে দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া এক একটি দেশকে পরাজিত করিয়া উত্তর ভারতবর্ষ পর্যন্ত পোঁছিয়াছিলেন। কয়েকখানি মাত্র তালপাতার পুঁথি সম্বল করিয়া বঙ্গদেশ হইতে মনীষীগণ দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয় পর্বত অতিক্রম করিয়া তিব্বত, চীন এবং সুদূর প্রাচ্যে জ্ঞান প্রচারে গমন করিয়াছিলেন। প্রেম এবং সেবার আকাঙ্খাই তাঁহাদিগকে এই কার্যে অনুপ্রেরিত করিয়াছিল। যাঁহারা ইতিহাস পাঠ করেন, তাঁহারাই জানেন যে, ভারতীয় সভ্যতা কত বিভিন্ন জাতিকে তাহার দেহে লীন করিয়া লইয়াছে। তাহাদেরই সম্মিলিত চেষ্টায় ভবিষ্যতের বৃহত্তর ভারত গড়িয়া উঠিবে।

আমাদের অধঃপতন

যদি আমরা কেবলমাত্র অতীতের স্মৃতি লইয়াই বসিয়া থাকি, তবে নিষ্ক্রিয়তার ফলেই আমাদিগকে ধরণীর পৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইতে হইবে। অবিরত কর্মের দ্বারাই আমরা আমাদের উত্তরাধিকারের মর্যাদা রক্ষা করিতে পারি। আমাদের পূর্ব-পিতৃগণ সর্বদর্শী ছিলেন, এই কথা বলিয়া তাঁহাদের সম্মান বৃদ্ধি করিতে পারি না। তাঁহারা কত যুগ-যুগান্তরের অবিরত চেষ্টার দ্বারা বিদ্যামন্দির গঠিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি কি? বহু শতাব্দীর চেষ্টার ফল আজ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত কতকাল যে অতীত হইয়াছে আমরা তাহার ধারণাও করিতে পারি না। জ্ঞানের এই উৎকর্ষের পরও তাঁহারা বলিয়াছেন যে, বেদ যদি সত্যের বিরোধী হয়, তাহা হইলে বেদকে পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হইবে— এতটা মহত্ব তাহাদের ছিল। তাঁহারা সর্বদাই জড় জগতে অজ্ঞাত কারণরাশির অনুসন্ধান করিবার উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহাদের ছিল প্রকৃত সন্ন্যাসীর তেজ। জ্ঞানের অনুসরণে এই তেজের দ্বারা তাঁহারা শারীর বৃত্তিকে নিরোধ করিতে পারিতেন। অভীষ্টকে তাঁহারা কদাপি বিস্মৃত হইতেন না— পার্থিব প্রলোভন কখনও তাঁহাদিগের দৃষ্টি নিরোধ করিতে পারিত না।

আজ সেই তেজের অভাব ঘটিয়াছে। আমাদের জীবনে আজ যে অবসাদ আসিয়াছে, মৃত্যুর অগ্রদূত সেই অবসাদকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া আমাদিগকে নবজীবন লাভ করিতেই হইবে। এই সঞ্জীবনী শক্তি আমাদিগকে আমাদের মধ্য হইতেই পাইতে হইবে আমাদের রাষ্ট্রীয় চেতনার মধ্যে সেই জাগরনের সাড়া পাওয়া যাইতেছে।

বর্তমান যুগসন্ধিতে ভারতের দান

জ্ঞান কোনো জাতি বিশেষের সম্পত্তি নহে। অতীতে ভারত জগতের সমৃদ্ধিবর্ধন করিতে তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ দেয় দান করিয়াছে। সেই শক্তি কি চিরতরে অন্তর্হিত হইয়াছে?

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রচারের কথাই ধরা যাউক। বৃহৎ আবিস্কারের জন্য জ্বলন্ত অন্তর্দৃষ্টি, আবিষ্কারের ক্ষমতা এবং বিশেষ হস্ত কৌশলের আবশ্যক হয়। উদ্দেশ্য বিহীন অনুসন্ধানে কোন বিশেষ ফল হয় না। আবার অবাধ কল্পনা বাজে কল্পনার সৃষ্টি করে। খাঁটি অনুসন্ধানকারীকে নিজের চিন্তাধারাকে বাহ্য জগতের সত্যের সহিত মিলাইয়া দেখিতে হয়। সত্যের কষ্টি পাথরে তাহার কল্পনার পরখ করিয়া লইতে হয়, ভুল হইলেই নির্দয়ভাবে সেই কল্পনা পরিত্যাগ করিতে হয়।

এই আত্মসংবরণের পথে তাহাকে এক বিস্ময়কর জগতের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। দৃশ্যমান আলোক যখন শেষ হয়, তখনও তাহাকে অদৃশ্যের পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে হয়। যেখানে কিছু শোনা যায় না, সেখানে তাহাকে অশ্রুত-ধ্বনির অনুসরণ করিতে হয়। আমাদের বাহ্যেন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় প্রতিহত না হইয়া তখন সে অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রের আবিষ্কার করে।

আমাদের বিপদ

দেশের সম্মুখে দুইটি ভীষণ বিপদ উপস্থিত। প্রথম বিপদ বিদেশীর পীড়ন এবং আভ্যন্তরীণ অশান্তি। শান্তি ছাড়া রাষ্ট্রীয় উন্নতি সম্ভব নহে। যদি বিদ্যার্থীরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সেনাদলে ভর্তি না হয়, তবে নাগরিক হিসাবে তাহাদের প্রাথমিক কর্তব্যে ত্রুটি হইবে। কঠোরতা এবং শৃঙখলা রক্ষা শিক্ষা করা তাহাদের কর্তব্য; কারণ কেবলমাত্র তদ্দ্বারাই তাহারা মনুষ্যত্ব (মানুষ অমরত্ব) লাভ করিতে পারিবে।

দ্বিতীয় বিপদ আরও সমূহ এবং সর্বত্র প্রসারিত। অন্যত্র যেমন, এখানেও তেমন বেকার সমস্যা দারুণ অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে, এখানে অশান্তি একটু বেশি, এইমাত্র পার্থক্য। শান্তির সময়ে যাহা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে, ক্ষুধার তাড়নায় হতাশ হইয়া লোকে তাহা নষ্ট করিয়া ফেলে, আমাদের দেশে এত খনিজ ধনরত্ন নিহিত থাকা সত্ত্বেও আমাদিগকে যে এই অবস্থায় পড়িতে হইয়াছে, ইহা অতীব শোচনীয়। অনবরত এই মিথ্যা প্রচারিত হইয়া আসিয়াছে যে, কোনো বৃহৎ আবিষ্কার করিতে আমরা সক্ষম নহি। এই প্রচারের ফলেই কেহ খনিজ কারখানার কার্যে উদ্যোগী হইতে সাহসী হয় নাই। এই অপবাদ যে মিথ্যা, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। আজকাল এমন সমস্ত যুবক আছে, যাহাদিগকে উপযুক্তরূপে পরিচালিত শিক্ষাগারে শিক্ষাদান করিলে তাহারা সমোপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হয়। আত্মসম্মান-বোধ সম্পন্ন প্রত্যেক দেশের মত আমাদের কর্তব্য উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশীর মুখাপেক্ষী না হওয়া।

বিশ্ববিত্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি বিদ্যাচর্চার প্রসারের পরিচায়ক, কিন্তু ইহাতে বিপদও আছে। প্রথম হইতেই এই বিপদ হইতে সাবধান থাকিতে হইবে। জ্ঞান প্রচারই একমাত্র লক্ষ্য না হইয়া সাম্প্রদায়িক মতদ্বৈধ ইহাতে বৃদ্ধি পাইতে পারে, ফলে বিদ্যাপীঠ সমূহ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচারের কেন্দ্রে পরিণত হইতে পারে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবর্তে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মৈত্রী থাকা কর্তব্য ! প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় এক একটি বিষয়ে বিশেষ

শিক্ষা দান করিতে পারেন। অধ্যাপক এবং বিদ্যার্থীদের এক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যবিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের সুবিধা থাকা কর্তব্য।

বিদ্যার্থীদের প্রতি

আমি চিরকালই বিদ্যার্থী। বয়োবৃদ্ধি সত্ত্বেও আমি দুঃসাধ্য কার্যের অনুসরণে যুবকের মত বল পাই। জীবিকা হিসাবে আমি শিক্ষকতা গ্রহণ করি নাই, সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি বলিয়াই ইহা গ্রহণ করিয়াছি। সমগ্র ভারতের ছাত্র সম্প্রদায় আমাকে তাহাদের সুহৃদ, পথপ্রদর্শক বলিয়া মনে করে, এই দুর্লভ সৌভাগ্য আমার লাভ হইয়াছে। প্রতিদানে আমি আমার সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাভিন্ন আর কিছু দিবার নাই। আমি তোমাদের দুর্বলতার কথা বলিব না; আমি তোমাদের শক্তির উদ্বোধন করিতে চাহি, সুতরাং যাহা সহজ, আমি তাহা তোমাদের উপস্থিত করিব না, যাহা কঠিন, তাহাই তোমাদিগকে গ্রহণ করিতে সর্বতোভাবে উপদেশ দিব। তোমাদিগকে উত্তরাধিকার তোমাদিগকে সাহায্য করুক, কিন্তু তোমরা অতীতের দাস না হইয়া পূর্ব পুরুষগণের জ্ঞানরাশির প্রকৃত উত্তরাধিকারী হও।

নানাপ্রকার আশঙ্কা তোমাদের মনকে আন্দোলিত করিতেছে। বিদ্যায়তনে যে শৃঙখলা রক্ষা করিতে হয়, তাহাকে অনেকেই পীড়ন বলিয়া মনে করিয়া তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশা করিতেছে। তোমরা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি যে, সেই নিরোধ করিবার শক্তিই সর্বাপেক্ষা বৃহৎশক্তি। তোমাদের জীবনের এই সময়েই তোমাদিগকে এই নিরোধ শক্তি লাভ করিতে হইবে।

স্বাধীন চিন্তাকে দমন করিয়া রাখিতে পারে এমন শক্তি কি কোথাও আছে? বহু বৎসরের আত্মনিরোধের ফলে তোমরা ভবিষ্যৎ জীবন গঠন করিবার শক্তি লাভ করিবে। পোষাক পরিচ্ছদ নহে— বিপদের ঘাত প্রতিঘাতই তোমাদিগের দেহকে শক্ত করিয়া তুলিবে। বৃথা কথা বলিয়া শক্তির অপচয় করিও না। অপরকে উপদেশ দিতে যাইও না, নিজের উপদেশ নিজে পালন করিও। যে দুর্বল সকলের সহিত সংগ্রামে যোগ দেয় না, সে কিছু পায়ও না, তাহার দিবারও কিছু নাই। জীবনে যে সংগ্রাম করিয়াছে এবং জয়ী হইয়াছে, সেই তাহার অভিজ্ঞতা দ্বারা জগৎকে সমৃদ্ধশালী করিতে পারে, এই বীরভূমি ভারতবর্ষে অতীতকালে কর্মেরই প্রশংসা করা হইত, নিস্ক্রিয়তার নহে। এমনকি ভারতের যুদ্ধক্ষেত্রেই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানের উন্মেষ হইয়াছিল। সকলের জন্য যে সুখ আমরা দিতে পারি না, তাহা প্রকৃত সুখ নহে। দেশের আহ্বান যখন সর্বত্র প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে, তখন আমরা অলসভাবে বসিয়া থাকিতে পারি না— ব্যাক্তিগত মুক্তি পর্যন্ত কামনা করিতে পারি না।

মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে আচার্য জগদীশচন্দ্রের ভাষণ (৩রা নভেম্বর ১৯২৭)
(আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত)

[প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই বক্তৃতা প্রদানের জন্য মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এক চিঠিতে জগদীশচন্দ্রকে আমন্ত্রণ জানান। পাঠকদের উদ্দেশ্যে সেই অপ্রকাশিত চিঠিটিও তুলে ধরা হলো।]

University of Mysore

Seal

RAJATANTRA PRAVINA
Dr. B. N. Seal
Vice-Chancellor

Mysore
Dated The 2nd Oct
1927

My dear Sir Jagadis,

I have very great pleasure in conveying to you the invitation of His Highness the Chancellor of the University to deliver the Address at the next Convocation to be held at Mysore on the 3rd November. The University will feel it a great honour if you kindly accept the invitation.

I need hardly add that by accepting the invitation you will be conferring a personal obligation upon me. For "auld long Syne," do kindly consent.

Yours Sincerely
Brajendra Nath Seal

আপনাদের সানুগ্রহ আমন্ত্রণ পাইয়া আমি নূতন করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, অতীতে যেমন ছিল বর্তমানেও তেমনি ভারতবর্ষে সারস্বত সমাজের মধ্যে একটা ঐক্য রহিয়াছে। মহাদেশের প্রাচীন বিদ্যার গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য আমি গত ৩৪ বৎসর যাবৎ যে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি, তৎপ্রতি আপনাদের সহানুভূতি বশতঃই বোধ হয় আপনারা অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে এই সমাবর্তন সংস্কারে অভিভাষণ দিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছেন। আমি বহু বর্ষ পূর্বে শিক্ষকতা আরম্ভ করিয়াছিলাম— বৃত্তি হিসাবে নহে, সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত হিসাবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্তির পরও যাহাদের উচ্চাকাঙখা তৃপ্ত হয় নাই, সে সমস্ত যুবকদিগকে পরিচালিত করিয়া মনুষ্যত্ব লাভে সাহায্য করাকে জীবনের ব্রত করা অপেক্ষা মহত্তর কিছু ধারণা আমি করিতে পারি নাই।

আমার সম্মুখে আমি তরুণ ছাত্রদিগকে দেখিতেছি, তাহারা কঠোর জীবনযাত্রা আরম্ভ করিতে যাইতেছে। জীবনে যখন নৈরাশ্য আসিবে তখন কোন আদর্শ তোমাদিগকে উৎসাহিত করিয়া তুলিবে? আজিকার দিনে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণের জন্য যুবক শক্তির উপর সর্বপেক্ষা অধিক দাবীর আবশ্যক হইয়াছে। সুতরাং আজ আমি তোমাদের দৌর্বল্যের কথা বলিব না, আমি আজ তোমাদের শক্তির উদ্বোধন করিব— যাহা সর্বাপেক্ষা সহজ সাধ্য সে আদর্শ আজ আমি তোমাদের সম্মুখে ধরিব না, যাহা দুঃসাধ্য আমি সে আদর্শ ই তোমাদের সম্মুখে ধরিব। তোমরা সত্যান্বেষী — সত্যের সন্ধান করিতে হইলে তোমাদিগকে যে কঠোরতার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতে হইবে, সেই কঠোরতার কথাই আমি তোমাদিগকে শুনাইব। এই কঠোরতা সহ্য করিতে অতীত তোমাদিগকে সাহায্য করিবে— আমি তোমাদিগকে অতীতের দাস হইতে বলিতেছি না, আমি বলিতেছি, তোমাদিগকে অতীত জ্ঞান গরিমার প্রকৃত উত্তরাধিকারী হইতে।

আমার জীবন যাত্রার প্রারম্ভে আমি প্রায়ই শুনিতাম যে, ভারতবর্ষ প্রাচীন দার্শনিকের দেশ, এজন্যই ভারতবর্ষের যাহা কিছু গৌরব সে গৌরবও লোপ পাইয়াছে। লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার হইবে। এ সমস্ত কথায় আমি নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিলাম।

তোমরা হয়তো জিজ্ঞাসা করিবে যে, আমার ভ্রান্তি কি করিয়া দূর হইল, বিরাট বিঘ্ন অতিক্রম করিবার অধ্যবসায় আমি কোথা হইতে পাইলাম। আমার উত্তর এই যে, আমার কার্যই ছিল আমার শিক্ষক, ব্যর্থতাই আমাকে আবশ্যক উৎসাহ দিয়াছে এবং অতীতের অভিজ্ঞতাই ছিল আমার উৎসাহের চির উৎস।

আমার বিশ্বাস এই যে, যাহা আমাদের সভ্যতায় স্বতঃ সংশ্লিষ্ট নহে আমাদের জাতীয় জাগরণের উপযুক্ত শক্তি আমরা তাহা হইতে পাইতে পারি না। এই মহাসত্যের গুরুত্ব বলিয়া শেষ করা যায় না।

যাহা অসম্ভব বা যাহা শুধু অন্য দেশেই সম্ভব, সে সমস্ত বিষয়ের কথা আজ তোমাদিগকে শুনাইব না। ভারতবর্ষে যাহা করা যাইতে পারে এবং যাহা করা হইয়াছে তাহার কথাই আমি তোমাদিগকে শুনাইব। তোমাদিগকে যে সমস্ত বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয় আমাকেও সেই সমস্ত বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। তোমরা যখন নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিমজ্জিত হইবে তখন তোমরা এই কথাটি স্মরণ রাখিও যে, বহু বর্ষ অধ্যবসায় সহকারে বিঘ্নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার পূর্বে আমি আশায় ক্ষীণ আলোক রেখাও দেখিতে পাই নাই। আমার এই বিশ্বাস ছিল যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার নিকট পরাজয় স্বীকার করায় মনুষ্যত্ব নাই, অসীম সাহসে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সম্মুখীন হইয়া তাহাকে পরাজিত করায়ই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। আমি জানি যে, পূর্বে যাহা হইয়াছে ভবিষ্যতেও তাহা হইবে, অতীতকে শুধু স্বপ্নের স্মৃতি বলিয়া উপেক্ষা করিলে চলিবে না।

আমি বলিয়াছি যে, আমার কার্যই ছিল আমার শিক্ষক। বহু বর্ষ অবিরত সত্যান্বেষণের

ফলে আমি এই জ্ঞান লাভ করিয়াছি। এই জ্ঞান বলেই আমি, কঠোর বৈজ্ঞানিক উপায়ের মধ্য দিয়া এই সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, সর্বপ্রকার প্রাণের ধারা একই প্রকার। প্রাণের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি কি ভাবে হয় তাহার রহস্য আমি ভেদ করিয়াছি, সে কথা আমি তোমাদিগকে বলিব।

উদ্ভিদের প্রাণ

বৃক্ষকে অগণিত ব্যষ্টি সমষ্টী লইয়া গঠিত একটি রাষ্ট্রের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সমষ্টির কল্যাণের জন্য এই ব্যষ্টিগুলির বিভিন্ন অঙ্গ এক একটা নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে কোথাও অসামঞ্জস্য ঘটিলেই বৃক্ষরাষ্ট্রের অনিষ্ট হয়। বৃক্ষটি স্বীয় ভূমিতে দৃঢ় মূল থাকে বলিয়াই বাঁচিয়া থাকে, ভূমি হইতেই সে নিজের পুষ্টী ও সমস্ত বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার উপযোগী শক্তি সংগ্রহ করে। বাহিরের আঘাত তাহাকে কখনো পরাজিত করিতে পারে না, তাহাতে তাহার ভিতরের সুপ্ত শক্তিই জাগ্রত হয়। বাহ্যিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যকানুযায়ী নিজের আভ্যন্তরীণ অবস্থার পরিবর্তন করিয়া লয়, তাহার ভিতরে যে শক্তি জীর্ণ-শীর্ণ, তাহা শুষ্ক পত্ররূপে ঝরিয়া পড়ে, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে আবার নিজের শক্তি নূতন করিয়া গুছাইয়া লয়। অধিকন্তু তাহার জন্মস্মৃতি হইতেও সে শক্তি লাভ করে। বীজাভ্যন্তরস্থ প্রত্যেক অঙ্কুর কোষের মধ্যে মহাবটের ভবিষ্যৎ নিহীত রহিয়াছে। এই শক্তি বৃক্ষ কোথা হইতে পায়? এই শক্তি সে পায় তাহার জন্মভূমি হইতে, অবস্থানুসারে পরিবর্তনশীলতা হইতে এবং অতীতের স্মৃতি হইতে। এই যে প্রাণের মহাশক্তি, ইহা জন্মভূমি এবং জন্ম-স্মৃতিরই দান। যে হতভাগ্য এই জন্মভূমি ও জন্মস্মৃতির কথা বিস্মৃত হইয়া ভিন্নরূপে চিন্তা ও জীবন ধারার মধ্যে বাঁধিত হইতে চাহে তাহার গতি কি? প্রতিপদে মৃত্যু তাহাকে অনুসরণ করিতেছে, ধ্বংসই তাহার অনিবার্য পরিণতি।

সুতরাং ভারতবর্ষে যদি কোনো স্থায়ী কল্যাণ করিতে হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের সভ্যতার মধ্যে যাহা নিজস্ব তাহাই জাগ্রত করিতে হইবে। এই জাগৃতির ফলে একটা মহাশক্তি বন্ধনমুক্ত হইবে এবং ভারতে মহাজাগরণ আনয়ণ করিবে। এই জাগরণের শক্তি আমাদের মধ্য উদ্বুদ্ধ জাতির মধ্যে সে শক্তির পূর্বাভাস দেখা যাইতেছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

জ্ঞানের গরিমা এবং জ্ঞান প্রচার করিয়া জগৎকে সমৃদ্ধশালী— করিবার শক্তি দ্বারাই একটা জাতীয় জীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ হয়। যে জাতি সে শক্তি হারাইয়াছে, যে শুধু পরের নিকট হইতে অনুগ্রহই লয়, পরকে কিছুই দেয় না, সে জাতির জীবন শেষ হইয়া আসিয়াছে। কৃত্রিম উপায়ে একটা বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করা যায় না, কোনো সনন্দ বলেও তাহার প্রতিষ্ঠা স্থায়ী করা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীরা জগৎকে যাহা দিবে তাহার উপরই তাহার প্রতিষ্ঠা নির্ভর করিবে। সুতরাং জীবন্ত এবং শক্তিশালী হইতে হইলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রথম আদর্শ হওয়া কর্তব্য, স্বীয় অভিব্যক্তি

এবং সেই অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া রাষ্ট্র সঙ্ঘে ভারতকে স্বীয় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা।

সমালোচকগণ বলেন যে, ভারতবাসীর মধ্যে জ্ঞানের অনুশীলন এবং শিক্ষা প্রচার করিবার যোগ্যতা ভারতবর্ষের নাই। তাঁহারা বলেন যে, ভারতে সার্বজনীন আদর্শ নাই, বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত অধিবাসীদের মধ্যে কোন সংযোগসূত্র নাই, তাহার অতীত ও বর্তমানের অব্যাহত পারম্পর্য নাই— আছে শুধু অসহিষ্ণু শাস্ত্রের অনুশাসন, যুক্তির পরিবর্তে শাস্ত্রের আদেশ— কল্পনা প্রিয় বলিয়া ভারতবাসীরা সত্যজ্ঞান পথে অগ্রসর হইতে পারে না; বিজ্ঞানের অনুশীলন সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য, ভারতীয় সভ্যতার সহিত তাহার সামঞ্জস্য নাই— এই সমস্ত উক্তি অজ্ঞতাপ্রসূত এবং সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

ভারতের সর্বজনীনভাব

প্রাচীন ভারতে রাজপুত্র এবং সাধারণ প্রজার পুত্রকে গুরুগৃহে একই প্রকার আড়ম্বর বিহীন জীবন যাপন করিতে হইত। এরূপ ব্যবস্থা অন্য কোনো দেশে আছে বলিয়া আমি জানি না। আমাদের মহাকাব্যে আমরা দেখিতে পাই যে, ৩ হাজার বৎসর পূর্বে হস্তিনাপুর রাজসভার সম্মুখে একটি বিরাট অস্ত্র পরীক্ষা হইয়াছিল। সূতপুত্র কর্ণ রাজপুত্র অর্জুনকে শক্তি পরীক্ষায় আহ্বান করিয়াছিলেন। অর্জুন ঘৃনাভরে এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছিলেন— "যাহার কোন বংশমর্যাদা নাই, রাজপুত্র তাহার সহিত অস্ত্র বিনিময় করেন না।" প্রত্যুত্তরে কর্ণ বলিয়াছিলেন— "আমিই আমার বংশের প্রতিষ্ঠাতা, আমার কার্যই আমার আভিজাত্যের পরিচয়।" নিজের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে মানুষের নিজের অধিকারের দাবী বোধ হয় এই সর্বপ্রথম।

আমার যখন শিক্ষারম্ভ হয় তখন সৌভাগ্যক্রমে আমার পিতা আমাকে কোনো ইংরেজি বিদ্যালয়ে না পাঠাইয়া বাংলা পাঠশালায় পাঠাইয়াছিলেন। তথায় কৃষক পুত্ররা ছিল আমার সহপাঠী, তাহাদের নিকট হইতে আমি শ্রমের প্রকৃত মর্যাদা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলাম। তাহারা চাষ করিয়া সবুজ ক্ষেতে সোনার ফসল জন্মাইত, তাহাদের সহিত থাকিয়া আমার প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা জন্মে। বিশাল নদীর মধ্যে এবং এদো পুকুরে যে সমস্ত আশ্চর্য জীব বাস করে ধীবর বালকেরা তাহাদের গল্প আমাকে শুনাইত। তখন হইতেই প্রতিপদে আমি একটা অদ্ভুত আবেগ অনুভব করিতাম। সহপাঠীদের সহিত গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিতে পাইতাম, আমার জননী আমাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমার মাতা ছিলেন নিষ্ঠাবতী হিন্দু, আমার সহপাঠীদের মধ্যে কেহ কেহ "অস্পৃশ্য" ছিল, তাহাতে কিন্তু মায়ের কোনো বিরক্তি হইত না। তিনি সকলকেই নিজের পুত্রের মতো আদর করিয়া খাওয়াইতেন। সত্য সত্য মায়ের প্রাণ এইভাবে মাতৃস্নেহ বিলাইয়া কাঙ্গালকে স্বীয় ক্রোড়ে আশ্রয় দিতে পারে। এই সুকুমার বয়সে আমাকে কেন বাঙ্গালা পাঠশালায় দেওয়া হইয়াছিল আজ আমি তাহার তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। তথায় আমি মাতৃভাষা শিক্ষা করিয়াছিলাম, নিজে চিন্তা করিতে শিখিয়াছিলাম এবং আমাদের মহাকাব্যগুলির মধ্য দিয়া আমি আমাদের জাতীয় সভ্যতার অধিকার লাভ করিয়াছিলাম।

এই ভাবেই অতীত ভারতের সর্বজনীনভাব বিদ্যমান ছিল। বিক্রমাদিত্যের সভা ছিল

রাষ্ট্রচালক, বিভিন্ন বিদ্যার প্রতিনিধিস্বরূপ "নবরত্ন" না থাকিলে সে সভা পূর্ণ হইত না। প্রজা রাজাকে সম্মান করিত, রাজশক্তির ভয়ে নহে, রাজা প্রজার মন ও হৃদয় রঞ্জন করিতেন বলিয়াই। দেশীয় রাজ্যগুলিতে ভারতের এই বৈশিষ্ট্য যেন চিরকাল বিরাজমান দেখিতে পাই।

ভারতে বিদ্যাচর্চার ধারা

শিক্ষা প্রচারে ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা ভারতে কখনো কোনো বিঘ্ন উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় নাই। অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই অমর আচার্যগণ আজিও জীবিত থাকিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন। দেখিতেছি, আচার্য শঙ্কর পাণ্ডিত্য প্রভাবে দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর ভারতের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত দেশ জয় করিয়া চলিয়াছেন। দেখিতেছি বঙ্গদেশের পণ্ডিতগণ কয়েকখানি তাল-পাতার পুঁথি মাত্র সম্বল লইয়া হিমালয় পর্বত অতিক্রম করিতেছেন— উদ্দেশ্য তিব্বত, চীন ও সুদূর প্রাচ্যে জ্ঞানালোক প্রচার। এই যে বিদ্যার অনুশীলন, তাহা কখনো কোনো বিশেষ প্রদেশে নিবদ্ধ ছিল না! বহুশতাব্দী ধরিয়া ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই জ্ঞান প্রজ্জ্বলিত ছিল। আচার্যের খ্যাতির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই সুদূর দেশ হইতে বিদ্যার্থীগণ আসিয়া আচার্যগৃহে সমবেত হইত। সেই প্রাচীন রীতি অদ্যাপি লুপ্ত হয় নাই। কারণ, বর্তমান কালেও চিন্তানায়কগণ দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং ঐক্য ও জাতিবন্ধন অক্ষুন্ন রাখিতেছেন। ঠিক ঠিক ভাবে যাঁহারা ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, যে সমস্ত বিভিন্ন জাতি ও প্রকৃতির লোক এদেশে আসিয়া এদেশকে নিজের মনে করিয়াছে, তাহাদিগকে এদেশ কি মহাশক্তি বলে নিজের করিয়া লইয়াছে। তাহাদেরই মিলিত চেষ্টায় ভবিষ্যতের বৃহত্তর ভারত গড়িয়া উঠিবে।

জ্ঞানচর্চার স্বাধীনতা

একথা সত্য যে আচারের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে নূতন সত্য গ্রহণ করা যায় না, সত্যান্বেষণের পক্ষে ইহা অপেক্ষা বড়ো বিঘ্ন আর নাই। একথা বলা যায় যে, এই সংকীর্ণতার ভাব তাহা প্রাচ্য হইতে পাশ্চাত্যেই অধিকতর প্রকট। গ্যালিলিওকে যে বাধ্য হইয়া সত্য কথা প্রত্যাহার করিতে হইয়াছিল এবং ব্রুনোকে যে আগুনে পুড়িয়া মরিতে হইয়াছিল ইহা সর্বজনবিদিত! এই অসহিষ্ণুতা পাশ্চাত্যে অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। ডারুইনের উর্ধ্বতন বাদ সংশ্লিষ্ট বিতর্কই তাহার প্রমাণ। আমেরিকার একটি উন্নত রাষ্ট্রে অদ্যাপি উর্ধ্বতন বাদ শিক্ষা দেওয়া দণ্ডনীয়। বিজ্ঞান ক্ষেত্রেও এরূপ একটা গণ্ডী আছে! কোন বড়ো আবিষ্কারই আবিষ্কারকের জীবনকালে আদৃত হইতে দেখা যায় না।

এদেশে শাস্ত্রানুশাসনের গণ্ডী জ্ঞানচর্চাকে সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল কিনা তৎসম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই দেশেই দুইটি স্বতন্ত্র চিন্তাধারা পাশা-পাশি বাড়িয়া উঠিয়াছিল। একটি শাস্ত্রাদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত ভক্তিবাদ. অপরটি যুক্তিবাদ— প্রত্যক্ষ প্রমাণই তাহার ভিত্তি। ভক্তিবাদীরা বোধ হয় একথা বুঝিতে

পারিয়াছিলেন যে, যদি তাহাদের অনুগ্রহের উপর ভগবানের অস্তিত্ব নির্ভর করিতে হয়, তবে তাহাতে ভগবানের অবমাননা করা হয়, এজন্যই বোধহয় যুক্তিবাদের সৃষ্টি।

আমাদের পূর্বপুরুষগণ সর্বদর্শী ছিলেন, সুতরাং জ্ঞানের আর প্রসার সম্ভব নহে। এরূপ অন্যায় দাবী অবশ্য আমাদের করা কর্তব্য নহে। আমাদের পূর্বপুরুষগণ অবিরত পরিশ্রমের ফলে ধীরে ধীরে জ্ঞানের মন্দির গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহাদের অতটা সাফল্য সত্ত্বেও একথা বলিবার মত উদারতা তাঁহাদের ছিল যে, সত্যের সহিত না মিলিলে বেদও অগ্রাহ্য। এই যে সত্যান্বেষণের স্বাধীনতা আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছি, তাহা অস্বীকার করার অর্থ— কপট দেশভক্তি।

অতীত ভারতের দান

কোনো একটা বিশেষ জাতির উপরই জগতের জ্ঞানের প্রসার নির্ভর করে, একথা বলার মত অজ্ঞতা আর নাই। সমগ্র জগৎ পরস্পর নির্ভরশীল, যুগযুগান্তের চিন্তাধারা অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হইয়া মনুষ্যজগৎকে সমৃদ্ধশালী করিয়া তুলিয়াছে। এই পরস্পর নির্ভরশীলতাই মানবসভ্যতাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

জ্ঞানের উন্নতি একমাত্র পাশ্চাত্যে দান, একথা বলার অর্থ ইতিহাসের কদর্থ করা। রাষ্ট্রনীতির উন্নতিও পাশ্চাত্যের দান— একথাও অসত্য। মহীশূর রাজ্যের দুইজন কর্মচারী অসীম ধৈর্য বলে অতীতে আররনোম্মচন করিতে সমর্থ হইয়াছেন ইহা মহীশূরের পক্ষে গৌরবের কথা। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাভারতীর চেষ্টার ফলেই প্রাচীন হিন্দুদের বিজ্ঞানচর্চার দিকে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইরাছে। ডাক্তার শ্যামা শাস্ত্রী যে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র বাহির করিয়াছেন তাহাও একটি মহৎ দান।

কিন্তু অতীত গৌরবে সন্তুষ্ট থাকিলেই আমাদের চলিবে কি ? সমালোচকগণ বারংবার বলিয়াছেন যে, আমাদের অতীত গৌরব যাহাই হউক না কেন, ভারতের জাতীয় জীবনে নবজাগরণ অসম্ভব। তাঁহারা বলেন যে, সাফল্য আমাদের কদাচিৎ হইয়াছে, ব্যর্থতাই আমাদের বেশি। আমার উত্তর এই যে, ব্যর্থতা তো অস্থায়ী, সফলতাই শেষ পর্যন্ত স্থায়ী। যাহা অতি স্পষ্ট তাহাই আমরা দেখিতে পাই না। মনুষ্য চক্ষুর অগোচর যে মহাশক্তি রহিয়াছে, যে শক্তি মানুষকে আকাঙ্ক্ষা পূরণে চেষ্টিত করে, সে শক্তি আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। আমরা যদি ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখি তবে বুঝিতে পারিব যে, কার্যকারণের সম্বন্ধ যেমন নিত্য জয়-পরাজয়ের সম্বন্ধও তেমনি নিত্য। আমাদের একথা উপলব্ধি করিতে হইবে যে, ব্যর্থতার পশ্চাতে রহিয়াছে একটা মহাশক্তি, সে শক্তি যখন পরিচালিত হয় তখনই আসে সাফল্য।

আধুনিক বিজ্ঞানে ভারতের দান

বিজ্ঞান— প্রাচ্যেরও নহে, পাশ্চাত্যেরও নহে, ইহা বিশ্বজনীন। তথাপি ভারতবর্ষ উত্তরাধিকার সূত্রে বংশ-পরম্পরায় যে ধীশক্তি পাইয়াছে, তাহার দ্বারা সে জ্ঞানপ্রচারে বিশেষ করিয়া সক্ষম। যে জলন্ত কল্পনা বলে ভারতবাসী পরস্পর বিরোধী ঘটনাবলীর মধ্য

হইতে সত্য বাছিয়া লইতে পারে, সে কল্পনাই আবার ভারতবাসী সংযত করিতে পারে। এই মনঃসংযমই সত্যান্বেষণের শক্তি দিয়া থাকে।

সত্যান্বেষণের জন্য দুইটি পথ আছে। একটি অন্তর্দর্শন, অপরটি প্রত্যক্ষ পরীক্ষা। উদ্দেশ্যবিহীন গবেষণায় কোনো বিশেষ ফল লাভ হয় না, অসংযত কল্পনা আকাশকুসুমের সৃষ্টি করে সুতরাং কল্পনা ও অনুসন্ধিৎসা সমানভাবে থাকা চাই। ...

বৃক্ষের প্রাণ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসুর অসুবিধা এই যে, বৃক্ষের প্রাণক্রিয়া মনুষ্য চক্ষুর অগোচরে বৃক্ষের অভ্যন্তরে নির্বাহ হইয়া থাকে। বৃক্ষের কলকৌশল জানিতে হইলে অনুসন্ধিৎসুকে স্বয়ং বৃক্ষের হৃদক্রিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে। তাহার জটিল প্রাণক্রিয়া বুঝিতে হইলে, ক্ষুদ্রতম প্রাণাণু বা "প্রাণ-কোষের" সন্ধান করিতে হইবে। এবং সেই কোষের স্পন্দন অনুভব করিতে হইবে। এজন্য আমাকে অতি সূক্ষযন্ত্র আবিষ্কার করিতে হইয়াছে। অনুবীক্ষণ যন্ত্রে কোনো জিনিষকে মাত্র কয়েক হাজার গুণ বড়ো করিয়া দেখা যায়। এই যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলেই বিজ্ঞান রাজ্যে একটা নবযুগের সূচনা হইয়াছে। "ক্রোস্কোগ্রাফ" নামক যন্ত্র উদ্ভাবণ করিয়াছি, তাহাতে কোনো জিনিষকে পাঁচ কোটিগুণ বড় করিয়া দেখা যায়। এই যন্ত্র উদ্ভাবনের ফলে একটা নূতন জগতের বিরাট রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে, উদ্ভিদ স্বয়ং নিজের আভ্যন্তরীণ প্রাণক্রিয়া প্রকাশ করিয়া দিতেছে।

সংযতভাবে তথ্যানুসরণের পথে অগ্রসর হইতে হইতে অনুসন্ধিৎসু একটা আশ্চর্যের রাজ্যের দিকে চলিয়া থাকে। আলোকের শেষ রশ্মি যখন লোপ পায় তখনও তাহাকে অদৃষ্টের অনুসরণ করিতে হয়। যখন শব্দের ধ্বনি শেষ হয় তখনও সে শব্দের স্পন্দন শুনিতে পায়। এই ভাবে সে অদৃশ্যপূর্ব একটা নূতন জগতের সন্ধান পায়, অশ্রুতপূর্বকে শুনিতে পায়। সে তথায় এমন একটা প্রাণের সন্ধান পায়, যাহা আমাদের প্রাণের মতই সুখদুঃখ ভোগ করে। মানুষের কর্মেন্দ্রিয় অপরিপূর্ণ, সেই অপরিপূর্ণতাকে অগ্রাহ্য করিয়া মানুষ যে অজানিত মহাসাগরে অনুসন্ধান করিবার মতো একটি চিন্তাতরণী নির্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে ইহা কি আশ্চর্যের কথা নহে। অনুসন্ধিৎসুর এই সন্ধানযাত্রার মাঝে মাঝে সে নূতন নূতন আশ্চর্যের সন্ধান পায়। এ পর্যন্ত যে মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সে জগতের মহা-স্পন্দন অনুভব করিতে অসমর্থ হইয়াছে, এই সমস্ত নূতন আশ্চর্যের দ্বারা তাহার সে মায়ার বিনাশ হয়। অন্তর্দর্শন এবং বহিঃ পরীক্ষার মিলনের ফলে সর্বপ্রকার প্রাণক্রিয়ার ঐক্য প্রমাণিত হইয়াছে, একই প্রকারের অভিব্যক্তির মধ্যে যে যবনিকা ছিল তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে, উদ্ভিদ এবং প্রাণীর প্রাণক্রিয়া যে একই প্রকার তাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মনঃসংযোগ

প্রথমে যে সমস্ত বিঘ্ন দুর্লঘ্য বলিয়া মনে হইয়াছিল, বহুবর্ষ চেষ্টার ফলে সেই সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করার পর এই সমস্ত আশ্চর্য ব্যাপার আমার নিকট পরিস্ফুট হইয়াছে। ভারতসুলভ মনঃসংযমই পরিণামে জয়ী হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসুর পথ সুগম নহে। তাহাকে লোহার শরীর মন লইয়া অবিশ্রান্ত সংগ্রামে অগ্রসর হইতে হয়। সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয়কে সমান মনে করিয়া জীবনকে আহুতি দিতে হয়। সুলভ সাফল্যের

লোভ তাহার বীরহৃদয়কে আকৃষ্ট করে না, দুর্লভের অনুসরণে ব্যর্থতার দুঃখই তাহাকে আকৃষ্ট করিয়া থাকে।

আবিষ্কার ও উদ্ভাবন

আমি যখন অনুসন্ধান আরম্ভ করি, তখন একথা বলা হইত যে, আমাদের ছাত্ররা হস্ত কৌশলে নিপুণ নহে, ভারতবাসীর আবিষ্কার ও উদ্ভাবনী শক্তি নাই। বহুবর্ষের অবিশ্রান্ত চেষ্টার ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইচ্ছাশক্তি সহায়ে অতিক্রম করা যায় না এমন কোনো বিঘ্ন নাই। যখন কেহ একটা মহান উদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গ করে তখন তাহার নিকট রুদ্ধগৃহের কপাট খুলিয়া যায়, অসম্ভব সম্ভব হয়। যে জাতি অতীত কালে হস্ত নৈপুণ্যে জগৎকে বিস্মিত করিয়াছে সে জাতি এখনও লোপ পায় নাই, ইহাই ছিল আমার বিশ্বাস। আমার কারুশিল্পীদিগকে বিশ্বাস করিয়া, তাহাদিগকে একটা জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করিয়া তুলিলাম। যে সমস্ত সূক্ষ্ম যন্ত্র জগতকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে তাহা আমার বিজ্ঞান মন্দিরে শিক্ষাপ্রাপ্ত কারুশিল্পীগণই নির্মান করিয়াছে। ইয়োরোপ ও আমেরিকার সর্বত্র এই সমস্ত যন্ত্র অনেকবার প্রদর্শিত হইয়াছে, দক্ষ যন্ত্রশিল্পীগণকে অনুরূপ যন্ত্র নির্মাণের সর্বপ্রকার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন যে আমাদের যন্ত্রশিল্পীদের হস্তনৈপুণ্যের কাছাকাছি অগ্রসর হইতেও তাঁহারা সমর্থ নহেন। বর্তমানকালে বলা হইয়া থাকে যে, আমাদের দেশ বিশেষ কোনো শিল্পোন্নতি করিতে সমর্থ নহে, এজন্যই এই কথা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন।

উপযোগিতা

প্রায়ই আমাকে প্রশ্ন করা হয় যে, উদ্ভিদ জীবনের রহস্যভেদের চেষ্টা করিয়া লাভ কি? ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন আমি প্রথম বেতার বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহিত শক্তি সহায়ে দূরাবস্থিত একটি যন্ত্রকে পরিচালিত করিয়াছিলাম এবং একটি মাইন ফাটাইয়া ছিলাম সেদিনও আমাকে এই প্রশ্ন করা হইয়াছিল। বহুদূরে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রেরণ সমস্যাও আমার বিজ্ঞানাগারে উদ্ভাবিত "গ্যালিনা রিসিভার" নামক যন্ত্র দ্বারা সমাধান হইয়াছিল।

উদ্ভিদ জীবনের রহস্যভেদের উপযোগিতা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, "ক্রেস্কোগ্রাফ" যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে বৃক্ষের আয়তন বৃদ্ধির হার নির্ণয়ের চেষ্টা হইতেছে। ব্যবহারিক কৃষিতে ইহা বিশেষ প্রয়োজন। প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে ঔষধির সমক্রিয়া সম্বন্ধেও অনুসন্ধান চলিতেছে। ফলে ভারতের অনেক ঔষধ সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে। নবোদ্ভাবিত 'রেজনেন্ট কার্ডিওগ্রাফ' বৃক্ষের হৃদস্পন্দন ঠিক ঠিক ভাবে ধরিতে সমর্থ। অবসাদের সময় বিভিন্ন ঔষধি প্রয়োগের দ্বারা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া কিভাবে বর্ধিত হয় তাহাও এই যন্ত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। এই সমস্ত অনুসন্ধানের ফলে ভারতীয় গাছপালা হইতে মনুষ্যজাতির উপকারের জন্য বহু নূতন ঔষধ প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

শিক্ষা প্রচারে ভারতের চেষ্টা

সম্প্রতি আমি লোকানোতে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলাম। সেই

সম্মেলন বুঝিতে পারিয়াছেন যে, প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি পুরাতন হইয়া গিয়াছে, এখন নূতন পদ্ধতি প্রবর্তনের সময় আসিয়াছে। যে শিক্ষা পদ্ধতি লোককে চিরকাল দাস করিয়া রাখে তাহা অনিষ্টকর না হইয়া পারে না। ভারতীয় ছাত্রগণ শিক্ষালাভের জন্য ইয়োরোপে যাইবে ইহা অপেক্ষা লজ্জাকর কিছুই নাই, তাহাতে অনেক বিপদও আছে। আমরা কেন নিজেদের দেশেই শিক্ষাক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিব না ? এই ধারণা লইয়াই আমি আমার বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে নালান্দা এবং তক্ষশীলায় যে জন্য বিদ্যার্থীগণ আসিয়া সমবেত হইত আমি সেই আদর্শের পুনরুজ্জীবন প্রয়াসী। আমার সে স্বপ্ন বহুলাংশে সফল হইয়াছে। আমি যাহা করিতে সমর্থ হইয়াছি এই উন্নতিশীল রাজ্য তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি করিতে পারিবে এ আশা আমি করি। আপনাদিগকে অটল বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। সেই বিশ্বাসের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য ভারতীয় চেষ্টায় ভারতীয় বিদ্যার্থী দ্বারা কি কার্য হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম।

অর্থনৈতিক সমস্যা

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যেমন, ভারতেও তেমনি অর্থসংকট দেখা দিয়াছে। ভারতে এই সঙ্কট প্রবল বলিয়াই সমস্যা কঠিন দেখা যাইতেছে। ক্ষুধার তাড়ণায় লোকে অসহিষ্ণু হইয়া উঠে এবং শান্তির প্রতিষ্ঠান নষ্ট করিয়া দেয়। অতীব দুঃখের কথা এই যে, আমাদের দেশে এত সম্পদ নিহিত থাকা এবং শিল্পোন্নতির সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমাদিগকে এই অবস্থায় পড়িতে হইয়াছে। আমরা কিছু আবিষ্কার করিতে পারি না, কিছু উদ্ভাবন করিতে পারি না— এইরূপ বাজে কথা বলিয়া এতদিন আমাদের সমস্ত চেষ্টার পথ রুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। এক্ষণে এই উক্তির অসারতা প্রমাণিত হইয়াছে।

অন্যান্য দেশে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক এবং ব্যবসায়ীগণ দেশের ধনবৃদ্ধির চেষ্টায় নিযুক্ত হয়। নরওয়ে এবং ডেনমার্কের মত ছোটো ছোটো দেশেও আমি কোনো অর্থকষ্ট দেখি নাই ; অথচ প্রাকৃতিক সম্পদে ঐ সমস্ত দেশ ভারতবর্ষ অপেক্ষা সম্পন্ন নহে। তাহাদের দেশে সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, তথায় সর্ববিষয়ে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় রহিয়াছে, দারিদ্র তথায় নাই বলিলেই চলে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে দেশের সম্পদ কাজে লাগাইয়া তাঁহারা এই অদ্ভুত ব্যাপার সম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন। আমরা কি তাঁহাদের উদাহরণ দেখিয়া শিক্ষালাভ করিতে পারি না ? শিক্ষা এবং অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য আমাদেরও কর্তব্য বিদেশের উপর নির্ভর না করা। ইহা করিতে হইলে দূরদর্শী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আবশ্যক। কিন্তু এই অত্যাবশ্যক ব্যাপারে রাষ্ট্রশক্তির একটা বিশেষ উপেক্ষা দেখা যায়। মহীশূর রাজ্য এই দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন, ইহা সুখের কথা।

কূটচক্র

মানুষ যখন তাহার দৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত এই বিস্তীর্ণ সাগর ও আকাশ দেখিতে পাইল তখন সে ছুটিয়া বাহির হইল। তরঙ্গায়িত সাগর বহিয়া সে পৃথিবী ঘুরিয়া আসিল।

আকাশের স্পর্ধার আহ্বান সে গ্রহণ করিল, সাহসের দ্বার। আকাশ জয় করিয়া অবারিত শূন্যমার্গ প্রতিষ্ঠা করিল। মানুষ স্রষ্টা, এই সমস্ত আশ্চর্য ব্যাপারই মানুষের অজেয় ঐশী শক্তির সাক্ষ্য দিতেছে। যে দুর্বল নিজের ঐশী শক্তির কথা বিস্মৃত হয়, সে হীন নিষ্ক্রিয় জীবন যাপন করে। যে লোক স্বীয় চেষ্টার দ্বারা জয়ী হইয়াছে, একমাত্র সেই নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারা জগতকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে।

আজ জাতীয় জীবনে একটা আশ্চর্য দৌর্বল্য ও অবসাদ দেখা দিয়াছে। অবিলম্বে ইহার প্রতিকার না করিলে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। দুর্বল ও জীণের প্রতি প্রকৃতির কোনো দয়া নাই।

জীবনধারণের জন্য, যতটুকু আবশ্যক, অলস প্রকৃতির লোক ততটুকু সংগ্রহ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে। তাহাতে তাহার কর্মশক্তি হ্রাস পায়। সে ব্যাধিকে বাধা দিতে পারে না। ফলে জীবনীশক্তি কমিয়া যায়, তারপর আসে দারিদ্র, শেষে মৃত্যু। এই ভাবে কূটচক্র ঘুরিতেছে।

কিন্তু পাশ্চাত্যে এরূপ দেখা যায় না। জাতির মহাদুর্দিনেও তাহারা কর্মশক্তি বজায় রাখিয়াছে। তাহাদের শ্রমের বলে তাহারা জাতিকে স্বচ্ছল করিয়া তুলিতেছে।

দুইয়ের পার্থক্যের উদাহরণ স্বরূপ আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলিতেছি। আমার পুরাতন ছাত্রদের মধ্যে অনেকেরই বিজ্ঞানের প্রতি একটা বিশেষ অনুরাগ ছিল। কিন্তু তাহারা তাহাদের এই স্বাভাবিক অনুরাগ বিসর্জন দিয়া আইনব্যবসায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। আদালতে যাইয়া অনিশ্চিত ভাগ্যের অনুসরণ ভিন্ন যেখানে প্রতিভা দেখাইবার অন্য উপায় নাই সে দেশ যে কি দুর্দশায় পড়িয়াছে এবং সে দেশে যে কি দারুণ সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে তাহা অন্ধ ভিন্ন সকলেই দেখিতে পায়।

জাপানের গবর্নমেণ্ট প্রতিভাবান ছাত্রের জন্য কি যত্ন লইয়া থাকেন তাহা দেখিবার সুযোগ আমার ঘটিয়াছিল। প্রতিভাবান ছাত্রদিগকে জাপানের গবর্নমেণ্ট দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া মনে করেন। আমি দেখিয়াছি যে, প্রতিভাবান ছাত্ররা প্রধান প্রধান কর্মচারীদের সহিত ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত। ইউরোপ এবং আমেরিকায় জাপানী ছাত্রদের শিক্ষার এমন ব্যবস্থা করিয়া থাকেন যে, দুই বৎসরের মধ্যে তাহারা খ্যাতনামা শিক্ষকদের নিকট হইতে স্ব স্ব বিষয়ে পূর্ণ শিক্ষা লাভ করে। দেশে ফিরিয়া তাহারা বেকার বসিয়া থাকে না। জাপান গবর্নমেণ্ট পূর্ণ হইতেই তাহাদের জীবিকার ব্যবস্থা করিয়া রাখেন। তাহারাও প্রতিভা খাটাইবার পূর্ণ সুযোগ পায়।

আদর্শ দেশীয় রাজ্য

মহীশূর রাজ্য যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন এবং প্রজাদের মঙ্গলের জন্য যে সমস্ত চেষ্টা করিতেছে এক্ষণে আমি সে আদর্শের কথা আলোচনা করিব। বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিল্পোন্নতির চেষ্টা বিচ্ছিন্ন নহে। একটিকে বাদ দিয়া অপরটি দ্বারা রাষ্ট্রের কল্যাণ সম্ভব নহে। অবশ্য অন্যান্য এমন অনেক দেশ আছে, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগেই লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্ভব। কিন্তু

আমাদের অত টাকা ব্যয় করিবার সামর্থ নাই ; কিন্তু সেজন্য পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। অজেয় শক্তিসম্পন্ন মানুষের মন কি কিছুই করিতে পারে না ? অবসাদ দূর কর, দৌর্বল্য পরিহার কর। স্মরণ রাখিও ভারতবর্ষই আমাদের কর্মক্ষেত্র, এ স্থানেই আমাদের কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে, অন্য কোথাও নহে। সামান্য সম্বলে আমাদের পূর্বপুরুষগণ বিরাট কার্য করিয়া গিয়াছেন, আমরা সে কথা ভুলিয়া না যাই।

যাঁহারা দূরে আছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যে, জাতিগঠনের জন্য এই রাজ্য কতটা চেষ্টা করিতেছেন। প্রধানমন্ত্রী প্রজাদের সমস্ত সংবাদ রাখেন। প্রজাদের স্বচ্ছলতা রাজ্যেরই গৌরব। এই রাজ্যেই ভারতীর রাষ্ট্রচালকগণ স্ব স্ব প্রতিভার পরিচয় দিবার সুযোগ পাইয়াছেন। রেলপথ প্রসার করিয়া, কোলার স্বর্ণখনির উন্নতি করিয়া, জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা করিয়া, শিব সমুদ্রম জলস্রোত হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারের ব্যবস্থা করিয়া স্যার শিবস্বামী আয়ার যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দেখিলে বিস্ময়ে মুগ্ধ হইতে হয়। অর্থের দ্বারা এই সমস্ত কার্যের মূল্য নির্ধারণ সম্ভব নহে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত যুবকদিগের প্রতিভার পরিচয় দিবার যে সুযোগ দেওয়া হইয়াছে তাহার পরিমান সহজ নহে। অন্যতম মন্ত্রী স্যার বিশ্বেশ্বরায়া ভদ্রাবতী লৌহ কারখানা এবং অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠান খুলিয়াছেন। দেখা যাইতেছে যে, এই রাজ্যের অধীবাসীরা স্বপ্নলোকে বাস করে না, স্বপ্নকে সত্য করিয়া তুলিবার মতো ধৈর্য ও শক্তি তাহাদের আছ। তাহাদের এই উৎসাহের উৎস কোথায় ? দেশপ্রেম এবং রাষ্ট্রের প্রতি অনুরক্তিই এই উৎস।

শিক্ষা ও অনুসন্ধিৎসা

শিক্ষাদান ও অনুসন্ধিৎসা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংবদ্ধ। শুধু পুরাতন সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াই শিক্ষা দেওয়া চলে না। অনেক সময় এই সমস্ত সিদ্ধান্ত ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হয়। বড়লোকের কথাকেই অভ্রান্ত সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে শিক্ষা দেওয়ার মত অনিষ্ট নাই। বিদ্যার্থীকে নিজে সত্য আবিস্কারে উদ্বুদ্ধ করাই আচার্যের প্রধান কর্তব্য। এরূপ আচার্য সহজে মিলে না। সেরূপ আচার্য আপনাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে এবং তাঁহাকে কার্যের সুবিধা দিতে হইবে। নিজেদের জন্য সর্বদা বিশেষ সুবিধা খুঁজিয়া বেড়াইবে, এমন একটা শিক্ষিত জাতির সৃষ্টি যেন আপনারা না করেন। একমাত্র জ্বলন্ত প্রদীপই আলোক বিতরণ করিতে সমর্থ। এইরূপ আচার্যের অধীনে থাকিয়া ধৈর্য এবং প্রতিপদে সতর্কতা শিক্ষা করিবে। বিদ্যার্থীরা আচার্যের অংশস্বরূপ হইয়া উঠিবে এবং বংশ পরস্পরায় সত্য ও প্রীতির বিতরণ করিবে। সে প্রীতির ভাব কখনো নাশ হইবে না। আমরা মরিয়া যাইব। রাজ্য ধ্বংস হইতে পারে, কিন্তু তাহারা যে সত্য ও প্রীতি বিলাইয়া যাইবে তাহা ধ্বংস হইবে না। সত্য চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবে। কারণ, সত্য অবিনাশী।

ছাত্রদের প্রতি উপদেশ

মানব জাতির কল্যাণের জন্য জ্ঞানের প্রচার ও প্রয়োগ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রধান কার্য, অবশ্য ইহাই একমাত্র কার্য নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা বিভিন্ন মানব জাতির

আদর্শ ও চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসিয়া থাকি। মানুষের সাময়িক ত্রুটি দেখিয়া আমাদের নিরুৎসাহ হইলে চলিবে না। মানুষের মহত্ব দেখিয়াই আমাদিগকে উৎসাহিত হইতে হইবে। সংগ্রাম হইতে দূরে থাকিয়া নহে, সংগ্রামে যোগ দিয়াই আমরা মানবজাতির শ্রেষ্ঠ সেবা করিতে পারিব।

দেশ আজ তোমাদিগকেই সর্বাপেক্ষা বেশি চাহিতেছে। এই সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমরা ধন্য হইয়াছ, সে কথা স্মরণ রাখিও। তোমরা যে সভ্যতার অধিকারী তাহা যুগযুগান্ত ধরিয়া বাঁচিয়া আছে, অলস নিষ্ক্রিয় থাকিয়া তোমরা সে সভ্যতা নষ্ট করিও না। মানবজাতির দুঃখ নিবারণের জন্য যুগযুগান্ত ধরিয়া যে আহ্বান তোমাদের নিকট আসিয়াছে তোমরা সে আহ্বানে সাড়া দেও। দুঃখ এবং দুঃখের কারণ নিবারণই ক্ষাত্রধর্ম। প্রত্যেকে ক্ষত্রিয় হও। পৃথিবী মানুষের দুঃখের রঙ্গক্ষেত্র, সে দুঃখের অংশ কে লইবে? গুরুভার বহন করিবে দুর্বল না সবল?

অতীত ভারতে কর্মকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, অবসাদকে নহে। যুদ্ধক্ষেত্রেই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত হইয়াছে। যে সুখে আমরা অপরকে অধিকারী করিতে সমর্থ নহি, আমরা যে সুখের অধিকারী নহি। সুতরাং আমি তোমাদিগকে শক্তিমন্ত্রে আহ্বান করিতেছি। আমি তোমাদিগকে অমর আশায় উদ্বুদ্ধ করিতেছি। এই আশা আমাদিগকে চিরদিন সঞ্জীবিত রাখিবে। ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা অদ্ভুত শক্তি নিহীত আছে। যে সভ্যতা নীল উপত্যকার সভ্যতাকে, এসেরিয়া ও বেবিলনের সভ্যতাকে প্রজ্বলিত ও নির্বাপিত হইতে দেখিয়াও বাঁচিয়া আছে, সে— সভ্যতার মধ্যে নিশ্চয়ই একটা স্বতঃশক্তি নিহীত আছে— অতীতের অটল বিশ্বাস লইয়া সে— সভ্যতা আজ ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া আছে।

ফ্রী-প্রেস

ট্রপিক্যাল মেডিসিন কংগ্রেসের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং বহু বৈজ্ঞানিকের সমক্ষে (লোকরঞ্জক) বক্তৃতা স্থান : বসুবিজ্ঞান মন্দির ৬।১২।১৯২৭ সাল

[৭।১২।২৭ তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত।]

সর্বপ্রকার প্রাণক্রিয়ার সমক্রিয়া প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে আমি আমার অনুসন্ধান আরম্ভ করি। যদি এই সমক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা যায়, তবে বিজ্ঞান রাজ্যে একটা বিরাট রহস্যের দ্বারোদঘাটন হইবে। জীবদেহের যে সমস্ত জটিল সমস্যা আমরা সমাধান করিতে সমর্থ হই না, উদ্ভিদ দেহের অনুরূপ ক্রিয়া দেখিয়া সে—সমস্ত সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হইবে। উদ্ভিদ ও জীবের প্রাণের সমক্রিয়া কি করিয়া প্রতিপন্ন করা যায়? নিছক

কল্পনা যতই আনন্দদায়ক হউক না কেন, তাহাতে কোনো ফল হইবে না। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কঠোর পথে অনুসরণ করিতে হয়। নানাপ্রকার কৌশলে মূক উদ্ভিদকে দিয়াই স্বীয় প্রাণক্রিয়ার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

অবয়ব ও অবয়বের কার্য

প্রাণীদেহের প্রত্যেকটি অবয়ব সমগ্র দেহের এক—একটি বিশেষ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। বিভিন্ন শ্রেণীর পাকযন্ত্রের কার্য তুলনা করিলে এই কথাটি স্পষ্টতররূপে বুঝিতে পারা যাইবে। পাকযন্ত্রের কার্য হইতেছে পাচকরস নিঃসরণ দ্বারা ভুক্তদ্রব্যকে দ্রবীভূত করিয়া হজম করা। Sundew নামক কীটভূক উদ্ভিদের পত্রগুলির মধ্যে কতকগুলি শুঁয়া থাকে, সেই শুঁয়াগুলি একপ্রকার টক রস নিঃসরণ করে। এই রসের মধ্যে কীটপতঙ্গ আটক পড়িয়া যায়। পরে কীটপতঙ্গ যখন ছাড়া পাইবার জন্য হস্তাদি বিক্ষেপ আরম্ভ করে, তখন অন্যান্য শুঁয়াগুলি শিকারকে আরও শক্ত করিয়া ধরিয়া থাকে। অতঃপর কীটগুলি দ্রবীভূত হইয়া যায়, শুধু কঙ্কালগুলি অবশিষ্ট থাকে। সম্পূর্ণ উন্মুক্ত পাকস্থলীর কার্যের নিদর্শন এই ক্ষেত্রে দেখা গেল ; কিন্তু প্রাণীদেহের অভ্যন্তরস্থ পাকস্থলীর কার্য্য এত সহজ নহে। যাহা হউক, পচনক্রিয়ার ক্ষমতা দেখিয়া, ডারুইনের অনুসন্ধান লব্ধ তথ্য প্রকাশের পর সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, কীটভূক উদ্ভিদের পাকস্থলী আছে। Venus নামক গাছের পাতার দুইটি অর্ধাংশ মিলিয়া একটি ফাঁদের আকার ধারণ করে। ঠিক যেন বৃক্ষটি মুখব্যাদান করিয়া থাকে, যেই কোনো কীট ঐ ফাঁদে পড়ে অমনি পাতাটি বুজিয়া যায়। Nepenthe-র পাকযন্ত্র একটি থলিয়ার আকৃতি। ইহার পাকযন্ত্র কতকটা প্রাণীদেহের পাকযন্ত্রের অনুরূপ। এইরূপ যদি উদ্ভিদ জীবনে অনুসন্ধান করা যায় তবে দেখা যায় যে, সরল সহজ যন্ত্র কিভাবে ধীরে ধীরে জটিল যন্ত্রে পরিণত হইয়াছে।

প্রাণীদেহে তিনপ্রকার কোষ আছে— পেশী-কোষ, স্নায়ু-কোষ এবং স্বতঃস্পন্দনশীল কোষ। উদ্ভিদদেহেও অনুরূপ ক্রিয়াশীল কোনো কোষ আছে কিনা, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক। আমি পূর্বে বক্তৃতা প্রসঙ্গে উদ্ভিদের নাড়ীর সংকোচন প্রসারণ কার্য দেখাইয়াছি, এক্ষণে শুধু রক্ত বা রস সঞ্চালন ক্রিয়া দেখাইলেই চলিবে। প্রাণীদেহে কতগুলি কোষ আছে, যাহাদের স্বতঃসংস্কোচন বিস্ফারণের দ্বারা এই কার্য হইয়া থাকে। উদ্ভিদ্‌দেহে এরূপ কোন স্বতঃসংকোচন বিস্ফারণশীল কোষ আছে কিনা ?

উদ্ভিদ ও প্রাণীর হৃদযন্ত্র

একটি সংকোচন প্রসারণশীল যন্ত্রের সাহায্যে প্রাণীদেহের রক্ত সঞ্চালনক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। সেই যন্ত্রটির নাম হৃদযন্ত্র। কেঁচো প্রভৃতি নিম্নস্তরের প্রাণীদেহে হৃদযন্ত্রটি একটি লম্বমান নালাকৃতি, এই হৃদযন্ত্রের সংকোচন বিস্ফারণের সহায়ে সঞ্জীবনী রস সঞ্চালিত হয়। উচ্চতর স্তরের প্রাণীর মধ্যেও হৃদযন্ত্রটি লম্বাকৃতি। প্রাণীদেহের হৃদযন্ত্রস্থিত কোষগুলির বৈশিষ্ট স্বতঃস্পন্দশীলতা, বিভিন্ন অবস্থায় এই স্পন্দনের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। কোনো কোনো উত্তেজক ঔষধির ফলে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া দ্রুত সম্পাদিত হইতে থাকে, ফলে দ্রুত রক্ত সঞ্চালিত হয়। আবার অবসাদজনক ঔষধির ফলে ঠিক বিপরীত ভাব দেখা যায়।

রক্তসঞ্চালন কার্যে প্রত্যক্ষীকরণ

একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমি একটি ভেকের রক্তসঞ্চালন কার্য এই যবনিকার উপর প্রতিফলিত করিতেছি। দেখুন প্রধান শিরা এবং উপশিরার মধ্য দিয়া কিরূপ দ্রুতগতিতে রক্তধারা প্রবাহিত হইতেছে। আমি এক্ষণে একটি অবসাদজনক ওষধি প্রয়োগ করিতেছি। দেখুন ঠিক বিপরীত ক্রিয়া দেখা যাইতেছে, এই দেখুন রক্তপ্রবাহ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল।

উদ্ভিদ দেহে রসসঞ্চালণ

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে উদ্ভিদ দেহের রসসঞ্চালণ অনুরূপ হৃদক্রিয়াদ্বারা নিষ্পন্ন হয় কিনা? প্রচলিত সিদ্ধান্ত এই যে, উদ্ভিদ দেহে রসসঞ্চালন জড় ক্রিয়ার ফল, —জীবন্ত কোষের প্রাণ ক্রিয়ার ফল নহে। ইউক্যালিপ্টাস বৃক্ষে ৪৫০ ফুট পর্য্যন্ত উর্দ্ধে রসসঞ্চালিত হয়, কোনো জড়যন্ত্রের সাহায্যে এত উচ্চে জল উত্তোলন করা অসম্ভব। প্রাণ ক্রিয়াদ্বারাই এই কার্য্য হয় কিনা, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য স্ট্র্যাসবার্গার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার অনুসন্ধান অসম্পূর্ণ থাকার ফলে এই প্রাণক্রিয়া সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত অনেকটা খর্ব হইয়া পড়ে।

স্ট্র্যাসবার্গার পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, বিষ প্রয়োগদ্বারা উদ্ভিদ দেহে রসসঞ্চালন হ্রাস পায় না। ইহা হইতে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, যদি উদ্ভিদের দেহে রসসঞ্চালন কার্য্য জীবিত কোষের সাহায্যেই হইত, তবে বিষক্রিয়ার ফলে কোষগুলির নিশ্চয় মৃত্যু হইত এবং রসসঞ্চালন বন্ধ হইত। অন্যান্য অনেকে অন্ধভাবে এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লইয়াছেন! একটু বাদেই আমি আপনাদিগকে যাহা দেখাইব তাহাতে স্ট্র্যাসবার্গারের সিদ্ধান্ত যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, তাহা প্রমাণিত হইবে। পক্ষান্তরে আমি প্রমাণ করিব যে, জীবন্ত কোষের স্পন্দনশীলতার ফলেই রসসঞ্চালন অব্যাহত থাকে।

উদ্ভিদ দেহে কিভাবে রসসঞ্চালিত হয়, আমি এক্ষণে দেখাইতেছি। আমি আরো দেখাইব যে অবস্থায় প্রাণী দেহে রক্তসঞ্চালনের হ্রাসবৃদ্ধি হয়, সে অবস্থায় উদ্ভিদ দেহে রসসঞ্চালনেরও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। রসসঞ্চালনের কোনো পরিমাপক কোন সন্তোষজনক উপায় ইতিপূর্বে উদ্ভাবিত হয় নাই। রসসঞ্চালনের বেগ নির্ণয় করিবার জন্য আমি একটি উপায় বাহির করিয়াছি। এই উপায়ে উদ্ভিদের পত্রগুলিকেই মাপকাটি রূপে গ্রহণ করা যায়। জলাভাবে পাতাগুলি হেলিয়া পড়ে, আবার জল পাইলে পাতাগুলি সোজা হইয়া উঠে; অধিকন্তু কোনো উপায়ে যদি রসসঞ্চালন বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে পাতাগুলি দ্রুত সোজা হইয়া উঠে! আবার অবসাদ জন্মাইয়া রসসঞ্চালন হ্রাস করিলে পাতাগুলি হেলিয়া পড়ে। পাতাগুলির এই উত্থাণপতনের হার এত সামান্য যে চক্ষে ধরা সম্ভব নহে, যন্ত্রসাহায্যে এই হারকে বৃহদাকারে প্রতিফলিত করা সম্ভব, —আমি তাহাই দেখাইতেছি। এই যে গাছটি দেখিতেছেন। ইহা জলশূন্য স্থানে ছিল, কাজেই পাতাগুলি হেলিয়া পড়িয়াছে। আমি এক্ষণে গাছটিতে জলসিঞ্চন করিতেছি। দেখুন পাতাগুলি সোজা হইয়া উঠিতেছে; কিন্তু এই পাতাগুলি ঠিক একচোটে সোজা হইয়া উঠিতেছে না,

কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিতেছে। ইহা দ্বারাই অদৃশ্য সংকোচন প্রসারণশীল যন্ত্রের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে। আমি এক্ষণে পটাশিয়াম ব্রমাইড নামক অবসাদজনক ঔষধি প্রয়োগ করিতেছি। দেখুন জলসিঞ্চনের ফলে পাতাগুলি যেভাবে সোজা হইয়া দাঁড়াইতেছিল এক্ষণে আর সে ভাব নাই। পাতাগুলি এক্ষণে আবার কাঁপিতে কাঁপিতে হেলিয়া পড়িতেছে।

প্রাণীদেহে কর্পূর প্রয়োগের ফলে হৃদক্রিয়া বৃদ্ধি পায়। আমি সামান্য কর্পূর মিশ্রিত জল এই গাছটিতে দিতেছি। দেখুন, দুইটি পরস্পর বিরোধী ক্রিয়ার কি সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। এই দেখুন শেষকালে উত্তেজক ঔষধিটির কার্যই জয়লাভ করিল —প্রতিচালিত আলোক রেখা উধ্বর্গমন করিয়া রসসঞ্চালনের বৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। আমি এক্ষনে গাছটিকে তড়িতাঘাত করিতেছি দেখুন তড়িতাঘাতে আমাদের দেহ যেরূপ বিক্ষেপের সঞ্চার হয়, গাছটিতেও সেরূপ বিক্ষেপের সঞ্চার হইল।

উদ্ভিদ হৃদয়ের সন্ধান

এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, গাছটির মধ্যে নিশ্চয়ই অকর্ষণ বিকর্ষণ কোষ আছে। যে যন্ত্রের সাহায্যে কোষগুলির এই সংকোচন প্রসারণ হয় তাহার অবস্থিতি কোথায়? আমি আমার বৈদ্যুতিক শলাকা (Electric Probe) সহায়ে এই যন্ত্র অর্থাৎ বৃক্ষের হৃদযন্ত্রের অবস্থিতির স্থান নির্ণয় করিয়াছি। আমি ধীরে ধীরে বৈদ্যুতিক শলাকাটি গাছটির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেখিয়াছি। যে মুহূর্তে শলাকাটি হৃদযন্ত্রের সংস্পর্শে আসিয়াছে, অমনি বৈদ্যুতিক স্পন্দন পাওয়া গিয়াছে। তারপর যবনিকার উপর প্রতিফলিত আলোক রেখাটি একবার দক্ষিণে, আর একবার বামে দুলিয়া হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়ার আশ্চর্যজনক পরিচয় দিয়াছে।

জীবন-মৃত্যুর সংগ্রাম

আপনারা দেখিলেন যে, প্রাণীদেহের এবং উদ্ভিদদেহের হৃদক্রিয়া সমপ্রকার। এক্ষণে আমি আরও একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার দেখাই। তাহা প্রাণী এবং উদ্ভিদের হৃদযন্ত্রে ঔষধের সমক্রিয়া। আপনাদের নিকট এই যে গাছটি দেখিতেছেন, এই গাছটিকে ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করা হইয়াছে। যবনিকায় আলোকরেখা দেখুন। দেখিতেছেন যে, গাছটি কিভাবে মৃত্যুর কবলে পড়িয়া যন্ত্রনায় ছটফট করিতেছে, ঠিক প্রাণিদেহের মত। দেখুন ক্রমশঃ সমস্ত যন্ত্রনা শেষ হইয়া আসিল, ঠিক যেন মৃত্যু হইয়াছে। যথা সময়ে যদি যথোপযুক্ত প্রতিক্রিয়াজনক ঔষধি প্রয়োগ করা যায়, তবে গাছটিকে বাঁচানো যাইতে পারে। মৃগনাভি প্রয়োগ করিয়া ঠিক বিপরীত ক্রিয়া দেখানো যাইতে পারে।

---

* উদ্ভিদের বিদ্যুৎ সক্রিয় স্তর খুঁজে পাওয়ার যন্ত্র।

পরিশিষ্ট

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশ চন্দ্রের নির্বাচিত পত্রাবলী

১৮৯৭ সালের এপ্রিল মাসে প্রথম বৈজ্ঞানিক জয়যাত্রা শেষে জগদীশ চন্দ্র দেশে ফেরেন। ফিরেছিলেন বোম্বাই শহর হয়ে ট্রেনে কলকাতায়। জগদীশ চন্দ্রের এই সার্থক বৈজ্ঞানিক সফরকে স্বাগত জানাতে সেদিন হওড়া স্টেশনে ছাত্র সমাবেশ হয়েছিল। সমাবেশে মাননীয় ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ নীলরতন সরকার, আনন্দমোহন বসু, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর,আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, ডঃ পি. কে. রায়, অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রমুখ। এক কথায় সেদিনের সমাবেশে একটি জাতীয় অনুষ্ঠানের রূপ নিয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন না। দিন কয়েক পরে রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিককে অভিনন্দন জানাতে জগদীশ চন্দ্রের তখনকার বাসভবন ১৩৯, ধর্মতলা স্ট্রীটের বাড়িতে একগুচ্ছ ম্যাগনোলিয়া ফুল নিয়ে হাজির হন। জগদীশ চন্দ্র সে সময় বাড়ি ছিলেন না। রবীন্দ্র-জগদীশ প্রগাঢ় বন্ধুত্ব সেদিন থেকেই শুরু। তারপর থেকে বাকি জীবন তাঁরা একসাথে লড়াই করেছিলেন দেশের শিক্ষা, মানসিক ভীরুতা ও সংস্কারের বিরুদ্ধে। বিজ্ঞান গবেষণাগার প্রয়োজনে জগদীশ চন্দ্র সারা জীবন নানা কষ্টসাধ্য সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন। এই সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথ জগদীশ চন্দ্রকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। জগদীশ চন্দ্রের একক বিজ্ঞান সমরকে উৎসাহ দিতে জীবনের বিভিন্ন সময়ে নানা প্রবন্ধ ও কবিতা লিখেছেন। অন্যদিকে জগদীশ চন্দ্র বিশ্বের দরবারে কবি বন্ধুকে প্রতিষ্ঠিত করার ঐকান্তিক চেষ্টা করেছিলেন ও নানা কাজে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন। উভয়ের পত্রালাপ আজ আমাদের জাতীয় সম্পদ। তখনকার দিনের বিখ্যাত "প্রবাসী" পত্রিকার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় বাংলা ১৩৩৩ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে রবীন্দ্রনাথকে লেখা জগদীশ চন্দ্রের চিঠিপত্র ধারাবাহিকভাবে প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত পত্রগুলোর পত্র পরিচয়ে পত্রপ্রাপক রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,…"চলা আর পথ বাঁধা এই দুই উদ্যোগের সব্যসাচিতায় জীবন ছিল সদাই চঞ্চল। এমন সময়ে জগদীশের সঙ্গে আমার প্রথম মিলন। তিনি তখন চূড়ার উপর উঠেন নি। পূর্ব উদয়াচলের ছায়ার দিকটা থেকেই ঢালু চড়াই পথে যাত্রা করে চলেছেন, কীর্তি-সূর্য আপন সহস্র কিরণ দিয়ে তাঁর সফলতাকে দীপ্যমান করে তোলে নি। তখনো অনেক বাধা, অনেক সংশয়। কিন্তু নিজের শক্তি স্ফুরনের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের যে আনন্দ সে যেন যৌবনের প্রথম প্রেমের আনন্দের মতই আগুনে ভরা, বিঘ্নের পীড়নে দুঃখের তাপে সেই আনন্দকে আরো নিবিড় করে তোলে। প্রবল সুখদুঃখের দেবাসুরের মিলে অমৃতের জন্য যখন জগদীশের তরুণ শক্তিকে মন্থন করছিল সেই সময় আমি তাঁর খুব কাছে এসেছি।"

নীচে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের চিঠিগুলো থেকে কিশোরদের উপযোগী কয়েকটি চিঠি ও কয়েকটি চিঠির নির্বাচিত অংশবিশেষ তুলে ধরা হলো তাতে জগদীশ চন্দ্রের নানা মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যাবে ঃ

[এক]

৮৫নং অপার সার্কুলার রোড
২৫এ এপ্রিল ১৮৯৯

সুহৃদ্বরেষু

এ কয়দিন ডাক্তারের অনুসন্ধানে ছিলাম। এজন্য ইতিপূর্বে উত্তর দিতে পারি নাই। নীলরতন বাবুর নিকট এজন্য কয়বার গিয়াছিলাম, কিন্তু সাক্ষাৎ হয় নাই। প্লেগের ধুমধামে তিনি বড়ো ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার কোন আত্মীয় তাঁহার অজ্ঞাতসারে এক প্লেগরোগী সৎকার করিতে লইয়া যান। সৎকার করিয়া গৃহে প্রবেশ করিবার পথে তাঁহার জন্য বিশেষ অভ্যর্থনার আয়োজন ছিল। প্রথমে কেরোসিন সাব্লিমেট জলে তাঁহাকে আপাদমস্তক স্নান করান হয়। তারপর সমস্ত বহিরাবরণ রাজপথে কেরোসিন তৈলে দাহ করা হইয়াছিল। পৃথিবীতে মোটামুটি একটা সামঞ্জস্যের নিয়ম আছে। এ দিকে এত সাবধানতা, অন্যদিকে মৃত রোগীর আত্মীয়েরা মৃত ব্যক্তির জিনিসপত্র অন্ধ আতুরদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন !...

রেশমের কীটের শোচনীয় পরিণাম শুনিয়া দুঃখিত হইবেন। কয়দিন হইল একটি প্রজাপতি সুস্থ শরীরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহার পর ২/৩টি অর্ধমৃত অবস্থায় জন্মিয়াছে। আর কয়টি অর্ধেক বাহির হইয়া রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় কি করিতে হইবে জানি না। যে একটি সুস্থ শরীরে বাহির হইয়াছিল, তাহাকে কি আহার দিতে হইবে জানি না। অনেক পুষ্প সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি, কিন্তু মধু সঞ্চয় করিতে তাহার কোনো আগ্রহ নাই। কোনো বন্ধু আম্রের চাট্‌নী দিতে বলিয়াছেন।...

আপনার
শ্রী জগদীশ চন্দ্র বসু

---

* নীলরতন বাবু— ডাঃ নীলরতন সরকার

* ঠাকুর বাড়ির গৃহশিক্ষক লরেন্স সাহেবের সহযোগিতায় রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে রেশমকীট চাষ করেন। রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরনায় অনভিজ্ঞ জগদীশ চন্দ্রও রেশমকীট চাষ শুরু করেছিলেন। চিঠিতে জগদীশ চন্দ্র রেশমকীট চাষের পরিণতি বর্ণনা করেছেন।

[দুই] দার্জিলিং

২০এ মে ১৮৯৯

সুহৃদ্বরেষু

…এখানে একেবারে নিশ্চেন্ট অবস্থায় জীবন কাটাইতেছি। যেখানে আছি সেখানে কোনো লোকের সাড়া শব্দ নাই ; কেবল পাখির গান ও সম্মুখে হিমাচল। আপনি যদি আসিতে পারিতেন, তবে ভালো হইত। কয় দিনের জন্য আসিতে পারেন কি ? তদভাবে আপনার গ্রন্থাবলী পড়িতেছিলাম। আপনার পৌরাণিক কবিতাগুলি সর্বাংশে সুন্দর হইয়াছে। এগুলি কবে সম্পূর্ণ করিবেন ? …মহাভারত হইতে অনেকগুলি লিখিবেন। *একবার 'কর্ণ' সম্বন্ধে লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। ভীষ্মের দেব-চরিত্রে আমরা অভিভূত হই, কিন্তু কর্ণের দোষগুণ মিশ্রিত অপরিপূর্ণ জীবনের সহিত আমাদের অনেকটা সহানুভূতি হয়। ঘটনাচক্রে যাহার জীবন পূর্ণ হইতে পারে নাই, যাহার জীবনে ক্ষুদ্রতা ও মহৎভাবের সংগ্রাম সর্বদা প্রজ্বলিত ছিল, যে এক এক সময়ে মানুষ হইয়াও দেবতা হইতে পারিত এবং যাহার পরাজয়, জয় অপেক্ষাও মহত্তর, তাহার দিকে মন সহজেই আকৃষ্ট হয়।…

আপনার

শ্রী জগদীশ চন্দ্র বসু

[তিন] S. S. Arabia. Aden

19 July 1900

সুহৃদ্বরেষু,

কবির কল্পনা ও সত্যে কত প্রভেদ ! আপনাদের রচিত সমুদ্র বর্ণনা পড়িয়া সাগ্রহে সমুদ্রযাত্রা প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম। জাহাজে উঠিয়া কেবলমাত্র এক পেয়ালা চা পান করিয়াছিল আর অমনি সমুদ্র গর্জনে দাও, দাও, দাও !! অমনি সুদ সমেত প্রতিদান করিতে হইল ; ইহাকেই বলে আতিথেয়তা ! তাহার পর এই পাঁচ দিন ক্রমাগত একই আদেশবাণী শুনিতেছি, যাহা ছিল সবই দিয়াছি, আর কিছুমাত্র দিবার শক্তি নাই। এ কয়দিন রবি কখন উদয় কখন অস্ত গিয়াছে হয়ত উদয়ই হয় নাই— কিছুই জানি না। বায়ু উল্কাপাত বজ্রশিখা কত কি হইয়াছে কিছুই অবগত নহি। দূরে বেদুইন ভূমি দেখা যাইতেছে, এখন ভাবিতেছি কবে সমুদ্র পার হইব।

আপনার

শ্রী জগদীশ চন্দ্র বসু

---

* বাংলা ১৩০৬ সালে রবীন্দ্রনাথ পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে কিছু কবিতা ও নাটক রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ এই পর্বেই জগদীশ চন্দ্রের অনুরোধে 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' রচনা করেছিলেন।

[চার]

লণ্ডন

২রা নভেম্বর ১৯০০

বন্ধু,

তোমার দুখানা পত্র পাইয়া অতিশয় সুখী হইয়াছি। আজ প্রায় দুমাস যাবৎ অহোরাত্র মনের ভিতর সংগ্রাম চলিতেছে। এখানে থাকিব কি দেশে ফিরিয়া যাইব। তুমিও কি আমাকে প্রলুব্ধ করিবে ?

ভাবিয়া দেখ। যদি সকলেই আমাদের বোঝা ফেলিয়া চলিয়া আসি, তবে কে ভার বহিবে ?

আরও মনে করিয়া দেখ। ৩ বৎসর পূর্বে আমি তোমার নিকট একপ্রকার অপরিচিত ছিলাম। তুমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আসিলে। তারপর একটি একটি করিয়া তোমাদের অনেকের স্নেহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলাম। তোমাদের উৎসাহ ধ্বনিতে মাতৃস্বর শুনিলাম। আমার নিজের আশা ও দুরাশা অনেক কাল পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু তোমাদের স্নেহের প্রতিদান করিতে আমি অসমর্থ। আমি অনেক সময়ে একেবারে শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ি, কিন্তু তোমাদের জন্য আমি বিশ্রাম করিতে পারি না। তোমরা আমাকে এরূপ বাঁধিয়াছ। তোমাদের পশ্চাতে আমি এক দীনা চীর বসন পরিহিতা মূর্তি সর্বদা দেখিতে পাই। তোমাদের সহিত আমি তাঁহার অঞ্চলে আশ্রয় লই। আমি ভাষায় সে সব কথা কি করিয়া প্রকাশ করিব ? তুমি বুঝিবে।

সাধারণতঃ লোকের যে সব বন্ধন থাকে তাহা হইতে আমি মুক্ত। কিন্তু আমি সেই অঞ্চল ডোর ছেদন করিতে পারি না।

আমি অনেক সময়ে না ভাবিয়া লিখি। অনেক সময় বিনা চেষ্টায় মনে অনেক ভাব আসে। শেষে আশ্চর্য হই। সে সব আমার অতীত ; কে আমাকে এ সব কথা শুনাইতেছেন ?

আমার হৃদয়ের মূল ভারতবর্ষে। যদি সেখানে থাকিয়া কিছু করিতে পারি তাহা হইলেই আমার জীবন ধন্য হইবে। দেশে ফিরিয়া আসিলে যে সব বাধা পড়িবে তাহা বুঝিতে পারিতেছি। যদি আমার অভীষ্ট অপূর্ণ থাকিয়া যায় তাহাও সহ্য করিব।...

আমার সম্মুখে কত কাজ অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে বলিতে পারি না। এ পর্যন্ত কিছু করিতে পারি নাই। কল প্রস্তুত করিতে অনেক সময় লাগিতেছে। এতদিনে অনেকের সহিত আলাপ হওয়াতে কার্য আরম্ভ করিবার সুবিধা হইতেছে। এখন মনে হইতেছে দুই বৎসর এখানে থাকিতে পারিলে অনেকটা শেষ করিতে পারিতাম।...

আমার যে অসুখ হইয়াছিল তাহা এখন অনেকটা ভালো হইয়াছে ; কিন্তু দেশে যাইবার পূর্বে operation করা আবশ্যক হইবে। আমি আমার কতকগুলি paper শেষ করিয়া ডাক্তারের হস্তে জীবন অর্পণ করিব।

এখন তোমার বিষয়ে দু'একটি কথা লিখিব। তুমি যে cutting পাঠাইয়াছ তাহাতে আমি একটুও সন্তুষ্ট হই নাই। তুমি পল্লীগ্রামে লুক্কায়িত থাকিবে আমি তাহা হইতে দিব না। তুমি তোমার কবিতাগুলি কেন এরূপ ভাষায় লিখ যাহাতে অন্য কোনো ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব? কিন্তু তোমার গল্পগুলি আমি এদেশে প্রকাশ করিব। লোকে তাহা হইলে কতক বুঝিতে পারিবে। আর ভাবিয়া দেখিও, তুমি সার্বভৌমিক। এদেশের অনেকের সহিত তোমার লেখা লইয়া কথা হইয়াছিল।…

তোমার নূতন লেখা অনেকদিন যাবৎ পাঠাও নাই, পাঠাইও। আমি মনে করি তোমার কবিতা চিরকালের জন্য। তোমার লেখা আমাকে যেরূপ জ্বলন্ত করে সেরূপ যেন অসংখ্য লোককে করিতে পারে।

তোমার
জগদীশ

২৩এ নভেম্বর ১৯০০

[পাঁচ]

সুহৃৎ

…তোমার পুস্তকের জন্য আমি অনেক মতলব করিয়াছি। তোমাকে যশোমণ্ডিত দেখিতে চাই। তুমি পল্লীগ্রামে আর থাকিতে পারিবে না। তোমার লেখা তরজমা করিয়া এদেশীয় বন্ধুদিগকে শুনাইয়া থাকি, তাঁহারা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন না। তবে কি করিয়া publish করিতে হইবে, এখনও জানি না। Publisherরা ফাঁকি দিতে চায়। সে যাহা হউক তোমার ভাগে কেবল glory, লাভালাভের ভাগ্য আমার। যদি কিছু লাভ হয় তাহার অর্ধেক তরজমাকারীর, আর অর্ধেক কোন সদনুষ্ঠানে। ইহাতে তোমার আপত্তি আছে কি? আমি অনেক castle in the air প্রস্তুত করিতেছি।

একবার যদি তোমার নাম প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি তাহা হইলেই যথেষ্ট মনে করিব। ৬টি গল্প বাহির করিতে চাই।*

তোমার
জগদীশ

[ছয়]

C/o Messers. Henry S. King & Co.
লণ্ডন, ৩রা জানুয়ারি ১৯০১

বন্ধু,

সীজারের জাহাজ ডুবিয়া যায় নাই বলিয়া যে আমার ক্ষুদ্র ডিঙ্গি রক্ষা পাইবে একথা বিশ্বাস হয় নাই। এখন দেখিতেছি যে ভাগ্যলক্ষ্মী আমার উপর সীজার অপেক্ষাও সুপ্রসন্ন। কারণ যখম ব্রুটাস্ সীজারের পেটে ছুরী বসাইয়া দিয়াছিলেন, তখন উক্ত সীজার অবিলম্বে পপাত চ! মমার চ! অথচ যখন তিনজন ডাক্তার আমার উদর বিদারণ করিয়া ১॥ ঘণ্টাকাল অতি সহর্ষে বিবিধ প্রকারে অস্ত্রচালনা করিয়াছিলেন, তারপর যে আমি এ ভবধামে ফিরিয়া আসিব, ইহা কল্পনাতীত। ক্লোরোফর্মের নেশা যখন চলিয়া যায় তারপর জীবনের উপর একান্ত ধিক্কার জন্মিয়াছিল এবং আহার ত্যাগ করিয়াছিলাম। তখন তোমার বন্ধুজায়া আমার সম্মুখে মাছের ঝোল ডাল ভাত রাখিতে আরম্ভ করিলেন— এমনকি বিদেশী মৎস্য দেশীরূপে কাঁতত হওয়াতে আমাকে ভ্রান্ত করিয়াছিল ; তখন স্বদেশ প্রেম জীবন অপেক্ষাও প্রিয়তর হইয়াছিল। এইরূপে প্রায় ৪ সপ্তাহ পর এখন একটু একটু করিয়া বল পাইতেছি। আরও ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত বিশ্রাম করিতে হইবে, পরে কাজ আরম্ভ করিতে পারিব।

আমি আর এক বৎসরের ছুটি চাহিয়াছিলাম, তাহার পরিবর্তে ৬ মাস পাইয়াছি। সুতরাং সমস্ত কার্য সমাধা করিতে পারিব না।···

···তোমাকে হয়ত পূর্বে লিখিয়াছি যে, বিখ্যাত Electrical Company Messrs. Muirhead & Co. আমার suggestions অবলম্বন করিয়া Wireless Telegraphy সম্বন্ধে অতি আশ্চর্য ফল লাভ করিয়াছেন। আরও তিনি বলিয়াছেন যে এতদিন পর্যন্ত তাঁহারা না বুঝিয়া অন্ধকারে ঘুরিতেছিলেন ; অনেক বিষয়ে বৃথা চেষ্টা করিয়া হতাশ্বাস হইয়াছিলেন, কিন্তু আমার থিওরি অনুসারে এখন ঠিক পথে যাইয়া অনেক উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছেন। আমি আর একটি নূতন paper লিখিয়াছি, তাহাতে practical wireless telegraphyর অনেক প্রকার সুবিধা হইবে মনে হয়। Dr. Muirhead আমাকে নূতন আবিষ্কারগুলি গোপন রাখিতে অনুরোধ করিতেছেন ; কিন্তু আমার এখানে সময় অল্প, আমার আরও অনেক কাজ করিতে হইবে, একবার যদি অর্থকরী বিদ্যার দিকে আকৃষ্ট হই তাহা হইলে আর কিছু করিতে পারিব না। তোমাকে আমি বুঝাইতে পারিব না, আমি কি এক নূতন রাজ্যে

*রবীন্দ্র-রচনার অনুবাদ প্রকাশ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ জগদীশ চন্দ্রকে লিখেছিলেনঃ "আমার রচনালক্ষ্মীকে তুমি জগৎ-সমক্ষে বাহির করিতে উদ্যত হইয়াছ—কিন্তু তাহার বাঙ্গলাভাষা বস্ত্রখানি টানিয়া লইলে দ্রৌপদীর মতো সভা সমক্ষে তাহার অপমান হইবে না তো? সাহিত্যের ঐ বড় মুস্কিল, ভাষার অন্তঃপুরে আত্মীয় পরিজনের কাছে সে যে ভাবে প্রকাশমান, বাহিরে টানিয়া আনিতে গেলেই তাহার ভাবান্তর উপস্থিত হয়।"

উপস্থিত হইয়াছি, কি আশ্চর্য নূতন তত্ত্ব একটু একটু করিয়া দেখিতে পাইতেছি। সে সব আমি এখন ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেছি না ; সেগুলি দিন দিন পরিস্কার-রূপে দেখিতে পাইব তাহার কোনো সন্দেহ নাই ; কিন্তু একভাবে দিনের পর দিন সেই সত্য লাভের জন্য ধ্যান করিতে হইবে। সেই একাগ্রতার ভাব যদি কোনরূপে disturbed হয় তাহা হইলে আমার দৃষ্টিশক্তি একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়। আর আমি এ পর্যন্ত যাহা করিয়াছি, তাহা অতি সামান্য, আরও অনেক আছে। কিন্তু সেসব করিতে অনেক সময় ও অর্থসাপেক্ষ।···

···তোমার পূর্বপত্রে আমি যাহাতে স্বাধীনরূপে একটু কার্য করিতে পারি এ সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব লিখিয়া আমার মত জানিতে চাহিয়াছ। এ সম্বন্ধে আমি কি বলিব। তুমি আমার হইয়া যাহা ভালো মনে কর আমি তাহাই করিব। তবে এ সম্বন্ধে দুএকটি বিষয় তোমাকে জানাইতেছি।

(১) তুমি কি মনে কর যে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দু'একজন ব্যতীত কেহ আমার কার্যে সাহায্য করিতে ব্যগ্র ? দেখ আমি দু'একজনকে সন্তুষ্ট করিতে পারি, কিন্তু তাহার অধিক করিতে সমর্থ হইব না।

(২) আর এক কথা এই যে যদিও নিম্নকর্মচারী হইতে আমি বাধা পাইয়াছি, কিন্তু Lt. Governor আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু বাহিরে এই দুই রাজশক্তির বিভিন্নতা লোকে বুঝিবে না।···

(৩) যদি বক্তৃতা কিম্বা পুস্তক প্রকাশ করিয়া আমি তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারি তাহা হইলে সুখী হইব।

আমাকে প্রতি তৃতীয় বৎসরে এ দেশে আসিয়া আমার কার্য সম্বন্ধে প্রচার করিতে হইবে।

প্রেসিডেন্সি কলেজের সহিত সংশ্রব সহজে একেবারে কাটিতে চাহি না। কারণ তাহা হইলে আমার কার্যে কোনো বাঙ্গালী নিযুক্ত হইবে না। দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য ছাত্র-দিগের অনুসন্ধান কার্যে তাহা হইলে সুবিধা হবে না। তবে কতদিন প্রেসিডেন্সি কলেজে থাকিতে পারিব সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।···

তোমার
জগদীশ

[সাত]

লণ্ডন

৬ই জুলাই ১৯০১

বন্ধু,

তোমার পত্র ও কবিতা পাইয়া আমি কিরূপ উৎসাহিত হইয়াছি জানাইতে পারি না। তুমি কি জান যে, এই বিদেশে থাকিয়া, দিনরাত্রি পরিশ্রম করিয়া আমার মন কিরূপ অবসন্ন ও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে? সম্মুখে অজ্ঞাত রাজ্য, আমি একাকী পথ খুঁজিয়া একান্ত ক্লান্ত— কখনও একটু আলোক পাই তাহারই সন্ধানে চলিতেছি। তোমার স্বরে আমি ক্ষীণ মাতৃস্বর শুনিতে পাই— সেই মাতৃদেবী ব্যতীত আমার আর কি উপাস্য আছে— তাঁহার বরেই আমি বল পাই—আমার আর কে আছে? তোমাদের স্নেহে আমার অবসন্নতা চলিয়া যায়, তোমরা আমার উৎসাহে উৎসাহিত, তোমাদের বলে আমি বলীয়ান। তোমাদের আশাতে আমি আশান্বিত। আমি আর নিজের সুখদুঃখের কথা ভাবিব না; কি করিতে হইবে বলিও। তোমরা যে আমাকে ঘিরিয়া আছ। আমি যে একাকী নই তাহা এখন বুঝিতে পারিয়াছি। তবে আমি যে কার্যভারে ও নিরাশায় অনেক সময় অবসন্ন হইয়া পড়ি, একথা মনে রাখিও, মাঝে মাঝে তোমাদের উৎসাহ বাক্যে আমাকে পুনর্জ্জীবিত করিও।

আর একটি কাজ তোমাকে করিতে হইবে। তুমি যদি আমাকে তোমার হৃদয়ে স্থান দিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি আমার সুখে সুখী, আমার কষ্টে দুঃখী। আমি আমার সম্মুখের কার্য ভিন্ন অন্য কথা ভাবিতে পারি না, ভাবিলেও কি উচিত বুঝিতে পারি না। আমার কি শ্রেয়ঃ তুমিই তাহা আমার হইয়া স্থির করিও। তুমি আমার সমস্ত বিষয় জানিয়া যাহা ভালো তাহাই স্থির করিও।

তবে এখন সব কথা বলিতেছি। আমি এদেশে একজনকে জানিয়া অতিশয় সুখী— তাঁহার অত্যাশ্চর্য জীবনকাহিনী তোমাকে দেখা হইলে বলিব। তাঁহার ন্যায় বহু বিজ্ঞানে জ্ঞানী বোধ হয় আর কেহ নাই। তিনি গত ৫০ বৎসর ইয়োরোপীয় বিজ্ঞানে যে সব যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, তাহার ইতিহাস এবং তাহাদের নেতাদের জীবনচরিত বিশেষরূপে জানেন। তিনি আমার এই নূতন বিষয় জানিয়া বড়ই উৎসাহিত হইয়াছেন।...

...আমি এছাড়াও অন্য তিনটি সম্পূর্ণ নূতন বিষয়ে Paper লিখিয়াছি। শুনিয়া সুখী হইবে Royal Society তাহা Publish করিবেন।

কিন্তু এই সম্পূর্ণ অভাবনীয়, সম্পূর্ণ নূতন বিষয়, যদি আমাদের দেশ হইতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত তাহা হইলে আমি জীবন সার্থক মনে করিতাম।

আমি দুই বৎসর Extension-এর জন্য India Office-এ আবেদন করিয়াছিলাম। Under Secretary of State বলিলেন, পাইতে কোনো কষ্ট হইবে না। তারপর জানি না হঠাৎ কি হইয়াছে...হঠাৎ খবর পাইলাম সে যদিও আমার

Scientific work is very important' yet the secretary of state regrets ইত্যাদি। আমাকে সেপ্টেম্বরের শেষভাগে ফিরিয়া যাইতে হইবে !

ইতিমধ্যে British Asscn. ইত্যাদি স্থান হইতে নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলাম। আস্তে আস্তে আমার মত যে গৃহীত হইবে তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছিল, কিন্তু এই সংবাদে সমস্ত ভাঙ্গিয়া গেল। বন্ধু, তুমি কি আমার মনের কষ্ট বুঝতে পার ?

আমি কি করিব জানি না। Furloughর জন্য আবেদন করিব, কিন্তু যদি আমার এ দেশে থাকা তাহাদের অনভিপ্রেত হয় তাহা হইলে যে ছুটি পাইব মনে হয় না।

তুমি তপস্যার কথা লিখিয়াছ, বল ত আমি কি করিয়া মনস্থির করিতে পারি ?

তুমি আমাকে নিশ্চিন্ত করিবার ভার লইতে চাও। দেখ, আমার কার্য করিবার ইচ্ছা জান। তবে কতকাল স্বাস্থ্য থাকিবে জানি না, কতকাল কার্য করিতে পারিব তাহাও জানি না। তোমরা যদি কোনদিন নিরাশ হও।...

আমাকে শীঘ্র পত্র লিখিও।

তোমার
জগদীশ

লন্ডন

[আট]

১৫ ই অক্টোবর ১৯০১

বন্ধু,

তুমি লিখিয়াছ আমার বন্ধুত্ব তোমাকে এমন প্রবল ও গভীরভাবে আকৃষ্ট করিবে তাহা এক বৎসর পূর্বে জানিতে না। হয়ত জান না আমার অবস্থাও ঐরূপ। কেন আকৃষ্ট হইয়াছি তাহার কারণ এই যে হৃদয়ের অনেক আকাঙ্ক্ষা যাহা আমার মনেই থাকিত তাহা তোমার মুখে তোমার লেখাতে পরিস্ফুট দেখিতে পাই। নিরাশার মধ্যে কে মন বাঁধিতে পারে ? তবুও এক বিশ্বাস যে আমরা একদিন আলোর সন্ধান পাইবই, সেই আশায় তোমাকে দেখিয়া বিশ্বস্ত হইয়াছি। দুই, অভ্যন্তরের শত্রু হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে, প্রথম মিথ্যা অভিমানী স্বজাতিবৎসল, আর স্বার্থে সন্তুষ্ট স্বজাতিদ্রোহী। আমার মনে হয় এখন বিনয়ী, বিশ্বাসী ধৈর্যশীল স্বজাতি প্রেমিকের সংখ্যা দিন দিন বাঁধিত হইতেছে। তুমি ইহাদিগকে আকৃষ্ট করিও, এবং একসূত্রে গ্রথিত করিও। তুমি যে নূতন বিদ্যাশ্রম খুলিয়াছ তাহাতে সুখী হইলাম। বৎসরে ২/৪টি যুবকও যদি এইভাবে প্রণোদিত হয় তাহা হইলে আমরা বিনষ্ট হইব না।

তুমি জান না তোমার পত্র পাইয়া আমি কিরূপ আশ্বস্ত হই। আমার পদে পদে কত বিঘ্ন তাহা তুমি মনেও করিতে পার না। আমি কখনো কখনো একেবারে নিরাশ্বাস

হই। তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি আমার কার্যে যত নূতনত্ব থাকিবে, সে পরিমাণ বাধা পাইব। প্রচলিত যে মত, যাহার ভিত্তিতে সমস্ত Electro-physiology স্থাপিত হইয়াছে তাহার উপর হাত দিলে অনেক খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকের কার্যের উপর হস্তক্ষেপ হয়। অথচ সত্য অপলাপ করিয়া চুপ করিয়া থাকিলে কোনদিন সত্য প্রচারিত হইবে না। আর আমার কার্য এরূপ কঠিন যে ইংলণ্ডে ২/৩ জন লোক ব্যতীত আমার শ্রোতামণ্ডলী নাই, তাহারাও পুরাতন মতের অবলম্বী। Physicist এবং Physiologistদের মধ্যে অনেক কাল সংগ্রাম চলিয়াছে, এখন একে অন্যের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন না।

আমাকে এজন্য সম্পূর্ণ একাকী কার্য করিতে হইবে, কার্যও এত বিস্তীর্ণ যে অনেক সময় লাগিবে। কত সময় লাগিবে তাহা এখন বলা অসম্ভব। অর্থাৎ প্রতি বিষয় নূতন করিয়া স্থাপিত করিতে হইবে।

তোমাকে বলিয়াছি যে আমি আমার থিওরির প্রত্যহ নূতন ও অত্যাশ্চর্য প্রমাণ পাইতেছি। ক্রমে ক্রমে অন্ধকারে আলোরাশি দেখিতেছি। তুমি যদি এখানে থাকিতে তাহা হইলে তোমাকে দেখাইয়া বড়ো সুখী হইতাম। তুমি অল্পায়াসে বুঝিতে পারিতে, এবং নিশ্চয়ই উৎসাহিত হইতে।

যাহা প্রমাণ দ্বারা এক মুহূর্তে দেখাইতে পারি তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা দুরূহ। তবুও মনে করিতেছি যে একখানা পুস্তক লিখিব। তাহাতে পুঙ্খানুরূপে সমস্ত Experiment বিবৃত থাকিবে। তাহাও অনেক সময় সাপেক্ষ।

Princoe Kropotkin সেদিন বিশেষরূপে আমার সমস্ত Experiment দেখিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় মনস্বী ইয়োরোপে দুর্লভ। তিনি দুর্লভ। তিনি সমস্ত দেখিয়া বলিলেন "আপনার experiment এবং argument পরম্পরার মধ্যে সূচ্যগ্র প্রবেশ করাইবার ছিদ্র নাই। আপনি অবধ্য কেহ আপনার কেশ স্পর্শ করিতে পারিবে না। আপনি আবরণ ছিন্ন করিয়াছেন। কিন্তু এজন্যই আপনাকে বহু প্রতিবাদ সহ্য করিতে হইবে।"

তোমার

জগদীশ

• Prince Kropotkin— রাশিয়ার একজন উদারচেতা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। জারের আমলে তিনি নির্বাসিত হন। লণ্ডনে থাকাকালীন কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন।

Royal Institution of Great Britain

[নয়]

২৯এ নভেম্বর
১৯০১

বন্ধু,

গাছ মাটি হইতে রস শোষণ করিয়া বাড়িতে থাকে, উত্তাপ ও আলো পাইয়া পুষ্পিত হয়। কাহার গুণে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইল? কেবল গাছের গুণে নয়। আমার মাতৃভূমির রসে আমি জীবিত, আমার স্বজাতির প্রেমালোকে আমি প্রস্ফুটিত। যুগ যুগ ধরিয়া হোমানলের অগ্নি অনির্বাপিত রহিয়াছে, কোটি কোটি হিন্দুসন্তান প্রাণবায়ু দিয়া সেই অগ্নি রক্ষা করিতেছেন, তাহারই এক কণা এই দূর দেশে আসিয়া পড়িয়াছে। আমি যে তোমাদেরই প্রাণের অংশ, তোমাদেরই দুঃখ সুখের অংশী একথা সর্বদা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিও। তাহা হইলে আমি শত বাধা পাইয়াও ভগ্নোদ্যম হইব না এবং তোমাদের জন্য জয় লাভ করিব।

আমার রয়াল ইনস্টিটুসনের বক্তৃতা পাঠাইতেছি। বিষয়টি বড় কঠিন, সাধ্যানুসারে সহজ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এক ঘণ্টা সময়ে যতটুকু বলা যায় তাহাই বলিয়াছি। কিন্তু আরও কত আশ্চর্য বিষয় বলিবার আছে তাহা বলিতে হইলে একখানা পুস্তক লিখিতে হয়। তাহাই করিতে হইবে।

তুমি কবে আসিবে?

তোমার
জগদীশ

[দশ]

লণ্ডন
৩০ এ মে ১৯০২

বন্ধু,

এতকাল কেবল কার্য সংবাদ লিখিয়াছি। একদিনও মন খুলিয়া চিঠি লিখিতে সময় পাই নাই। আজ আর সব কথা ভুলিয়া তোমার গৃহে অতিথি হইলাম। এক এক সময় মনে হয় দূর হউক দুঃখের কথা— মানুষের হৃদয় বলিয়া ত একটা জিনিস আছে। সন্ধ্যার সময় তোমার ঘরে যেন বসিয়াছি, আমার ক্রোড়ে আমার ছোটো বন্ধুটি বসিয়া আছে, অদূরে বন্ধুজায়া, আর তুমি তোমার লেখা পড়িয়া শুনাইতেছ। আমি তোমার লেখাগুলি পড়িতেছিলাম, তোমার স্বর যেন শুনিতে পাইতেছি। তুমি যে কালিদাসের সময়ের কথা লিখিয়াছ, মনে হয় যেন পূর্ব জন্মের কথা শুনিতেছি। সে সব দিনের কথা স্মরণ করিয়া মন কেমন পুলকে বিহ্বল হয়। এরূপ মধুর স্মৃতি এরূপ উদ্বেল সরল প্রেম, এরূপ সুখ এরূপ কল্যাণ অন্য কোনো জাতিতে কি

কখনও ছিল ? তোমার আর একটি কথা আমার নিকট বড়ই ভাল লাগিয়াছে— সে কথা কল্যাণী— তুমি ঠিকই বলিয়াছ, এ কথার অর্থ অন্য ভাষায় প্রকাশ পায় না।

তুমি নগর হইতে দূরে যে আশ্রম স্থাপিত করিয়াছ সেখানে কবে আসিতে পারিব মনে মনে কল্পনা করিতেছি। তারপর তোমার কল্পনার সাহায্যে, সেই অতীত সুখের দিন ফিরিয়া আসিবে। আমার নিকট এই বর্তমান ত একেবারে অলীক দুঃস্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। কল্পনা রাজ্যেই আমাদের প্রকৃত জীবন।

তোমার এই নূতন স্থান কিরূপ মনে করিতে পারি না। আমার স্মৃতি শিলাইদহে আবদ্ধ। সেখানে কি ফিরিয়া যাইবে না ? অন্ততঃ আমার সঙ্গে একবার যাইবে। আর একবার একত্র তীর্থযাত্রা করিব।

তোমার 'চোখের বালি' বৈশাখ মাস পর্যন্ত দেখিয়াছি। বেশ লাগিয়াছে, ভয় ছিল তুমি যেরূপ অবস্থায় ফেলিয়াছ তাহাতে কি করিবে। কিন্তু সবই সুন্দর হইয়াছে।

আমার এখনকার কাজের সংবাদ জানাই। স্রোত বোধ হয় অনুকূলেই পরিবর্তন হইয়াছে। সেদিন Linnean Societyর বাৎসরিক অধিবেশনে আমার কার্য সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা হইয়াছিল। যদি অধিক দিন থাকিতে পারি তাহা হইলে সবই অনুকূল হইতে পারে মনে হয়। তবে জয় পরাজয়— জোয়ার ভাটা। Germanyর Bonn Universityতে বক্তৃতা করিবার অনুরোধ আসিয়াছে। তোমাদের প্রতিনিধির উপর একটু সদয় হইও।

তোমাদের নিকট একটু উৎসাহ পাইবার জন্য মাঝে মাঝে যে অবসাদ আসে তাহার কথা লিখিয়াছিলাম আর অমনি তুমি বলিয়া বসিলে সীজারের নৌকাডুবি কখনও হয় না। একবার সমুদ্রে পড়িলে বুঝা যাইত নৌকাডুবি হয় কি না। তুমি কি মনে কর যে আমি এক কিষ্টু-বিষ্টু হইয়াছি। গলায় পাথর বন্ধিয়া জলে ফেলিলে ভাসিয়া উঠিব ? দোহাই এরূপ কবি কল্পনা হইতে আমাকে রক্ষা কর !

আগামী সপ্তাহে Photographic Societyতে বক্তৃতার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছি— দৃষ্টি ও ফটোগ্রাফী সম্বন্ধে বলিতে হইবে। চক্ষে যে ছায়া পড়ে তাহা মিলাইয়া যায়, কেবল তাহার প্রতিধ্বনি সুপ্ত ও জাগরিত স্মৃতিরূপে থাকিয়া যায়। কিন্তু photoর ছবি একেবারে অপরিবর্তিত রূপে মুদ্রিত হইয়া যায়। কি করিয়া সেই আণবিক আড়ষ্টতা (molecular arrest) সাধিত হয় তাহার সম্বন্ধে অতি আশ্চর্য experimentএ সফলতা লাভ করিয়াছি। হঠাৎ মনে হইল তুমি আমার আবিষ্কার চুরি করিয়া ইতিপূর্বে কবিতারূপে প্রচার করিয়াছ। সুরদাস যখন তাহার চক্ষু শলাকা বিদ্ধ করিতে যাইতেছিল, তখন তাহার মনে হইল যে চির অন্ধকারে পলকহীন স্মৃতি চিরমুদ্রিত থাকিবে।

তোমার
জগদীশ

[এগারো]

৯৩ নং অপর সর্কুলার রোড
১৮ই আগস্ট ১৯০৩

বন্ধু,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি যে নানা দুশ্চিন্তার মধ্যে আছ ইহা মনে করিয়া বড় কষ্ট হয়। তোমার নিজের শরীর যে ভালো নয় তাহা তুমি না লিখিলেও বুঝিতে পারি।

…তোমার সহিত শুভক্ষণে দেখা হইয়াছিল, কেবল তোমার সঙ্গেই মন খুলিয়া বলিতে পারি। আর তোমার সঙ্গে কাজ করিয়াই সুখী।…একজনকে চেনা ও সম্পূর্ণ আপনার বলিয়া জানা কত সৌভাগ্যের কথা। আমি এত লোকের মধ্যে এখানে সম্পূর্ণ একাকী মনে করি। তুমি কবে আসিবে তাহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছি।

আমি একটা খুব বড়ো তথ্যের অনুসন্ধান লইয়া ব্যস্ত আছি। কিন্তু তুমি কাছে নাই বলিয়া কার্যে অবসাদ জন্মে। আরও নানা রকমে বাধা পাইতেছি। সে সব কথা এখন থাকুক।

তুমি যে পুরীর জায়গা আমাকে দিতে চাহিয়াছ! তুমি কি মনে কর আমার কোনো স্থানের উপর কোনমাত্র টান আছে? কেবল একসময় মনে করিয়াছিলাম যে, দুজনে একটি কুটির নির্মাণ করিয়া মাঝে মাঝে যাইয়া থাকিব। তোমারই জায়গা থাকুক; তুমি যদি এরূপ নিরাসক্ত হও, আর তুমি যদি পুরীতে সঙ্গী না হও, তবে আমার নিকট ওরূপ নির্জন বাস অসহ্য হইবে।

তোমার
জগদীশ

[বারো]

২৩ অক্টোবর
১৯০৫

বন্ধু,

তোমাকে একটা বিষয় পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। সর্বপ্রথম আমাদের বঙ্গভবন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।* একটি মূর্তিমান এবং বর্ধমান জিনিস আমাদের উৎসাহের প্রধান সহায় হইবে। তারপর এই স্থান কেন্দ্র করিয়া যত বড়ো কাজ আছে হইবে। এই স্থানে 5000 লোকের বসিবার হল হইবে, সেখানে প্রতি পক্ষে নিয়মিত রূপ ছাত্রদের জন্য বক্তৃতা, কথকতা ইত্যাদি হইবে। তারপর আমাদের সেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা এখানে নিয়মিত রূপ দেওয়া হইবে। এ বিষয়টি অতি গুরুতর, কারণ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ছাত্রদিগকে বহিষ্কারের জন্য বিবিধ সাংঘাতিক চেষ্টা হইতেছে— ইহার প্রতিবিধান একান্ত আবশ্যক।

তারপর জাতীয় ভবনে তোমার সমাজের অধিবেশন হইবে। নানা department শিল্প বাণিজ্য ইত্যাদির শাখা থাকিবে। Subscription তুলিয়া Bill ইত্যাদি করিবার চেষ্টা ভুল। এই কেন্দ্র হইতে নানা বিষয়ের অনুসন্ধান, সংবাদ ইত্যাদির দরকার।

এ স্থানে বঙ্কিম, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায় ইত্যাদির স্মৃতিচিহ্ন থাকিবে ইত্যাদি।

তুমি এ বিষয় অতি সুন্দর প্রবন্ধ প্রস্তুত করিবে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন একস্থানে পঠিত হইবে।

এ সময় আমাদের বিজ্ঞজনেরা বিবিধ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিবেন এবং ঘুমাইয়া পরামর্শ দিবেন। এখনই জাগ্রত থাকিবার সময়। তোমাকে চৌকিদারী করিতে হইবে।

তোমার
বন্ধু

[তেরো]

C/o. Henry S. King & Co.
9, Pall Mall
London
19th Dec. 1907

আমার বন্ধু, তোমাকে কেবলমাত্র আমার হৃদয়ের বেদনা জানাইতেছি। তোমার সুখদুঃখের সাথী আমি। কি করিয়া তোমাকে সান্ত্বনা করিব জানি না।[১]

আমাদের দুজনেরই অনেক প্রিয়তম পরপারে। সুতরাং সে দেশ আর দূর দেশ মনে হয় না।

কেবল এ কয়দিন যথাসাধ্য কার্য সমাপণ করিতে হইবে। তোমার বিদ্যালয়ের কথা যতই মনে করি, ততই মন উৎফুল্ল হয়। অন্ততঃ কয়েকটি জীবন যে তোমার শিক্ষায় অমর হইবে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অরবিন্দের[২] চিঠি পাইয়া বুঝিতে পারিতেছি যে তোমার আশীর্বাদ সার্থক হইবে। এখানে নূতন রকমের

* বর্তমান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে অবস্থিত ফেডারেশন হলের পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করেই জগদীশ চন্দ্র এই চিঠিখানি লিখেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর তারিখে আনন্দমোহন বসু ভবনটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

কল দেখিয়া ইচ্ছা হয় যে তোমার স্কুলে ছোটো workshop খোলা হয়! ছোট অনেক যা আগে চাকার পেছনে থাকত কেরাসিনের এঞ্জিন (one horse power) ১৫০ টাকা মাত্র, অতি সহজেই চলে। বিদ্যুতের আলোর dynamo তাহার দ্বারা চালান যাইতে পারে। উহার জন্য আর ৫০ টাকা। আমার শিষ্য সুরেশের সহিত তোমার স্কুল সম্বন্ধে সর্বদা আলোচনা করি। ছোট American Lathe সম্ভবতঃ ২০০, টাকার মধ্যে পাওয়া যাইবে। ৫/৬ শত টাকা হইলে তোমার Workshop আরম্ভ করা যাইতে পারে।···

তোমার
জগদীশ

---

১ রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের অকাল মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে জগদীশ চন্দ্র চিঠিখানি লিখেছিলেন। শমীন্দ্রনাথ ১৯০৭ সালের ২৩শে নভেম্বর তারিখে মাত্র ১৩ বছর বয়সে মুঙ্গের শহরে মারা যায়।

২ অরবিন্দ— অরবিন্দমোহন বসু। জগদীশ চন্দ্রের ভাগিনেয়। আনন্দমোহন বসু ও স্বর্ণপ্রভা বসুর কনিষ্ঠ পুত্র। পরবর্তিকালে তিনি রবীন্দ্রনাথের "বলাকা" ইংরেজি অনুবাদ করেন।

১৯ নভেম্বর ১৯১৩

[চৌদ্দ]

বন্ধু,

পৃথিবীতে তোমাকে এতদিন জয়মাল্যে ভূষিত না দেখিয়া বেদনা অনুভব করিয়াছি। আজ সেই দুঃখ দূর হইল। দেবতার এই করুণার জন্য কি করিয়া আমার কৃতজ্ঞতা জানাইব? চিরকাল শক্তিশালী হও, চিরকাল জয়যুক্ত হও। ধর্ম তোমার চির সহায় হউন।

তোমার
জগদীশ

---

* রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি উপলক্ষে জগদীশ চন্দ্র চিঠিখানি লিখেছিলেন।

[পনেরো]

93 Upper Circular Road
Calcutta, the 22nd Oct 1928

বন্ধু,

কয়দিন হইল কলিকাতা আসিয়াছি। সতীশ দাস মৃত্যুমুখে, আর দুচারদিন। তোমার বধূ (ঠাকুরাণী) এবং আমি যে কিরূপ দুশ্চিন্তার আছি তাহা বুঝিতে পারিবে। আমাদের যে দুচারদিন বাকি আছে তাহারই প্রকৃত পন্থা বাহির করিতে হইবে।

তুমি যে মনের কষ্টে আছে তাহাতে আমি তোমার বিষয় সর্বদা ভাবিতেছি। ত্রিশ বৎসর হইতে আমরা সহযোগী এবং সহকর্মী। তোমার কষ্ট আমাকে আঘাত করে। যদি কোনরকমে তোমার অভীষ্ট সমাধান সহায় হইতে পারি, তাহা হইলে আমি সফলকাম হইব।

তুমি যাহা সাধন করিয়াছ তাহা অবিনশ্বর রহিবে। আর যে বেশি তোমার দান তাহা অযাচিত। সে কার্যে আমি চিরসহায় মনে করিও।

আমরা দুজনেই প্রবল শত্রুকে প্রবল মিত্র করিয়াছি। তবে যেখানে শত্রুও নাই, সেই ক্ষুদ্রতার মধ্যে মনের জোর কঠিন। তাহার মধ্যেও বড়ো কার্য হইয়াছে এবং হইবে। একথা সর্বদা মনে রাখিও। আমাদের মধ্যে যে বহুদিনের একতা, তাহা দেবতার দান বলিয়া মনে করি।

১লা ডিসেম্বর আমার ৭০ বৎসর হইবে। সেদিন আমি সমস্ত বোঝাপড়া ঠিক করিব। সেদিন তোমার সহিত দেখা হইলে সুখী হইব। তোমার শুভেচ্ছা যেন আমাকে বলীয়ান করে।

শেষদিন পর্যন্তও যে সাধনা আমরা আরম্ভ করিয়াছি তাহাতেই জীবন অবসান করিব। ম্রিয়মান হইব না। অন্ততঃ আমরা দুজন একে অন্যের ভার বহন করিব। এর চেয়ে আর বেশি কি হইতে পারে।

তোমার
জগদীশ

---

* সতীশ দাস— জগদীশ চন্দ্রের শ্যালক সতীশরঞ্জন দাস। কর্মজীবনে তিনি ভাইসরয় কাউন্সিলের ল'মেম্বার ছিলেন।

প্রবাসী পত্রিকার পঁচিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে আচার্য জগদীশ চন্দ্রের শুভেচ্ছা বাণী

সম্পাদক বরেষু,

তোমার সম্পাদিত প্রবাসী এবার ষড়বিংশ বর্ষে পদার্পণ করিবে শুনিয়া পরম আনন্দিত হইলাম। এই উপলক্ষ্যে আমার শুভ আশীর্বাদ জানাইতেছি। তুমি প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছ, ভয়কে জয় করিয়াছ, তেজস্বী হইয়াছ, সত্যব্রত পালন করিতেছ। শিষ্যের জন্য ইহা অপেক্ষা আমার বৃহত্তর আকাঙ্খা আর কিছুই নাই। তোমার গৌরবে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি।

পঁচিশ বৎসর পূর্বে যখন বঙ্গের বাহিরে সুদূর এলাহাবাদ হইতে প্রবাসী প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন মনে করিয়াছিলাম, প্রবাস হইতে প্রকাশিত হইল বলিয়াই বোধহয় পত্রিকাখানির নামাকরণ হইল প্রবাসী। পরে জানিতে পারিলাম, তখন হইতেই দেশের প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিয়াছিলে। প্রবাসীর মলাটে লিখা থাকিত,

"নিজ বাস ভুমে পরবাসী হলে,
পরদাস-খতে সমুদায় দিলে॥"

অনেকদিন হইতেই দেশে চারিদিকে একটা জড়ত্ব ও অবসাদ দেখা যাইতেছে। অতি সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থপরতা প্রতিদিন জাতীয় জীবন কলুষিত করিতেছে। দেশের যখন দুর্দিন আসে, তখন দুঃখকে সে নানাদিক্ দিয়াই নিদারুণ করিয়া তোলে।

কেবলমাত্র অতীতের গুণকীর্তন করিয়া আমরা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছি এবং দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিতেছি। কথার গ্রন্থিবন্ধনে আমরা যে জাল বিস্তার করিয়াছি, সেই জালে আপনারাও আবদ্ধ হইয়াছি।

জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে হইলে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইবে; দৃঢ় ও শক্তিসম্পন্ন হইতে হইবে। ভয়ের অতীত হইতে হইবে; সহস্র প্রতিকুল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে। অবিরাম চেষ্টা ও বিরুদ্ধ শক্তির সহিত যুদ্ধ করিয়া এবং মনের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াই আমরা দেশের ও জগতের কল্যাণসাধন করিতে পারিব। শরীর মৃত্তিকায় মিশিয়া গেলেও জাতীয় আশ ও আকাঙ্খা ধ্বংস হয় না। মানসিক শক্তির ধ্বংসই প্রকৃত মৃত্যু।

এই নিরাশার মধ্যেও যথেষ্ট আশার আলোক আছে। যখন নিশির অন্ধকার সর্বাপেক্ষা ঘোরতর, তখন হইতেই প্রভাতের সূচনা। আঁধারের আবরণ ভাঙ্গিলেই আলো। কোন্ আবরণে আমাদের জাতীয় জীবন আঁধারময় ও ব্যর্থ করিয়াছে? আলস্যে, স্বার্থপরতায় ও পরশ্রীকাতরতায়। এ-সব অন্ধকারের আবরণ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে।

যে-শিক্ষা দ্বারা এই জাতি ক্ষুদ্রত্ব পরিহার করিয়া বৃহত্তের অনুসন্ধান করিত, যাহা দ্বারা মনুষ্য ভয়ের অতীত হইত। যে বীর ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে শক্তিহীনের দুর্বহ ভার শক্তিশালী স্বেচ্ছায় বহন করিত,—সেই শিক্ষা ও দীক্ষা এখনও এদেশ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। এই শিক্ষা যেন তোমার লেখা দ্বারা সর্বত্র প্রচারিত হয়।

জগদীশচন্দ্র বসু
প্রবাসী, বৈশাখ,
১৩৩৩।

প্রিয়বরেষু,

তোমার জন্মদিনে আমার শুভ আশীর্বাদ পাঠাইতেছি।

প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছ, তেজস্বী হইয়াছ, সত্যব্রত পালন করিতেছ। আমার শিষ্যের জন্যে ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর আকাংখা আর কিছুই নাই। তোমার গৌরবে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি।

যে শিক্ষা দ্বারা এই জাতি ক্ষুদ্রত্ব পরিহার করিয়া বৃহত্ত্বে অনুসন্ধান করিত, যাহা দ্বারা মানুষ ভয়ের অতীত হইত, যে বীর ধর্মের অনুষ্ঠানে শক্তিহীনের দুর্বহ ভার শক্তিশালী স্বেচ্ছায় বহন করিত, সেই শিক্ষা ও দীক্ষা এখনও এদেশ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। তোমার লেখাদ্বারা এই শিক্ষা সর্বসাধারণে প্রচারিত করিতেছে। দিন দিন তোমার অন্তর্দৃষ্টি প্রখরতর হউক, এবং মানুষ্য সেবায় তোমার শক্তি বর্দ্ধিত হউক।

আশীর্বাদক
শ্রীজগদীশ চন্দ্র বসু

* ১৮৮৫ সালে যখন জগদীশ চন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনারত তখন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সেখানকার ছাত্র। সেই সুবাদে রামানন্দবাবু অন্যান্য ছাত্র বন্ধুদের সাথে প্রায়ই যেতেন জগদীশ চন্দ্রের তখনকার বৌবাজার স্ট্রীটের ভাড়া বাড়ীতে। সেই থেকেই সূত্রপাত। পরবর্তীকালেও আচার্যদেবের সাথে রামানন্দবাবুর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এই অপ্রকাশিত চিঠি (খসড়া) থেকে বোঝা যায় কি স্নেহের চোখে আচার্যদেব দেখতেন ছাত্র রামানন্দকে।

বিদ্যাসাগর বাণীভবনের ছাত্রীদের প্রতি আচার্য জগদীশ চন্দ্র

আচার্যের অষ্টসপ্তমিতম জন্মদিনে যখন ছাত্রীরা জগদীশ চন্দ্রের বাসভবনের বৈঠকখানায় শ্রদ্ধা জানাতে আসেন তখন তিনি ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন :—

"আজ তোমাদের দেখে খুব খুশী হয়েছি। আশীর্বাদ করি তোমাদের আশা পূর্ণ হোক।

"এই যে দেয়ালে ছবি* দেখছ। এটা দেখে সবাই বোধ হয় বুঝতে পেরেছ? এটি হচ্ছে ভারতমাতার ছবি (অবনীন্দ্রনাথের ভারতমাতার ছবি)। ইনি স্ত্রীলোক ; রমণীর কাজ হ'চ্ছে সকলের অভাব পূরণ করা। এই দেখ ইনি এক হাতে অন্নবস্ত্র অন্য হাতে জ্ঞান ও ধর্ম বিতরণ করছেন।"

"তোমারও মাতৃজাতি। তোমরা যে শিক্ষা পাচ্ছ সেই শিক্ষা শেষ করে যখন স্বাবলম্বী হবে. তখন তোমাদের সেই জ্ঞান অন্যকে বিতরণ করে সেবার দ্বারা অপরের দুঃখ ও অভাব দূর করবে। তখন তোমাদের শিক্ষাও সার্থক হবে। আমাদের দেশের প্রাচীন শিক্ষার ধারাই এই। আশীর্বাদ করি, অন্যের সেবার দ্বারা অন্যের জ্ঞানের অভাব দূর করে তোমরা তোমাদের জীবন সার্থক কর।"

স্বর্গীয় মহাত্মা আনন্দমোহন বসু

[১৯০৬ সালের ২০শে আগষ্ট (বাঃ ১৩১৩ সনের ৪ঠা ভাদ্র) ভারতের প্রথম র‍্যাংলার আনন্দমোহন বসু পরলোক গমন করেন। সেই উপলক্ষে জগদীশ চন্দ্র আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপণ করেন। গ্রন্থটি শ্রীনাথচন্দ প্রণীত "ব্রাহ্ম সমাজে চল্লিশ বৎসর" গ্রন্থ থেকে পুনঃ মুদ্রিত করা হলো (পাতা ৪১৯)]

১৮৯৮ খৃঃ অব্দে তিনি শেষবার ইউরোপ হইতে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহার অভিনন্দন উদ্দেশে কলিকাতা টাউন হলে ২৬শে সেপ্টেম্বর যে মহতী সভা আহূত হয় তাহাতে উত্তর দিতে গিয়া তিনি সহসা মূর্চ্ছিত হন। তাঁহার সাংঘাতিক ব্যাধির এই প্রথম প্রকাশ। ইহার পরবর্তী আট বৎসর তাঁহাকে বহুবার মৃত্যুর সন্ধিস্থলে

---

* আচার্য জগদীশচন্দ্রের বৈঠকখানায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা এই ভারতমাতার ছবি আজও সযত্নে রক্ষিত আছে। (ওপরের কথাগুলো নারীশিক্ষা সমিতির চল্লিশতম বাৎসরিক বিবরণীতে লিপিবদ্ধ আছে)

পতিত হইতে হইয়াছে। এই ঘটনার পর হইতে তিনি পরলোকে প্রস্থানের জন্য দ্রুত প্রস্তুত হইতেছিলেন। বিগত ১৯০৫ খৃঃ অব্দের ১১ই মাঘ প্রভাত হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্যন্ত ব্রহ্মোৎসবে নিমগ্ন হইয়া ছিলেন। রোগ-ভগ্ন শরীরের এত দীর্ঘ সময় উৎসব ক্ষেত্রে থাকিলে পীড়া বৃদ্ধি পাইবে, পরিজন এই আশংকা প্রকাশ করিলে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, "পৃথিবীতে মাঘের উৎসব সম্ভোগ, এই আমার শেষ, ইহার জন্য প্রাণ গেলে ক্ষতি কি?" তৎপরদিন ১২ই মাঘ পীড়া সংকটভাব ধারণ করিল; প্রলাপ অবস্থায় কেবল এই কথা, "মা আমায় ডাকিতেছেন, আমায় আর এখানে ধরিয়া রাখিও না।" সেই বর্ষের ১৬ই অক্টোবরের স্মরণীয় দিনে অখণ্ড বঙ্গভবনের ভিত্তি স্থাপন উদ্দেশে যাত্রা করিবার পূর্বে, পরিবারস্থ সকলের নিকট সস্নেহে বিদায় লইলেন। মৃত্যুর একমাস পূর্বে যাহা করিয়াছেন, যাহা বলিয়াছেন, সমুদায়—অন্তিম দিন নিকটবর্তী স্মরণ করিয়া করিয়াছেন। মৃত্যুর জন্য এমন দিনে দিনে, পলে পলে প্রস্তুত হইতে আমি কাহাকেও দেখি নাই। বিগত ১৮ই আগষ্ট রাত্রিতে যথারীতি ভোজন করিলেন। তাহার পর পরিজন সহিত সার্দ্ধদশ ঘটিকা পর্যন্ত প্রফুল্লমনে কথাবার্তা কহিলেন। পত্নীর নিকট জীবনের ভ্রম প্রমাদ ত্রুটির জন্য মার্জনা চাহিলেন। নিদ্রা যাইবার পূর্বে কর্মচারীকে ডাকিয়া কহিলেন, "আমার মৃত্যু হইলেই তুমি সুরেন্দ্রনাথকে সর্বাগ্রে টেলিগ্রাম করিও।" ইহাই তাঁহার শেষ কথা। পরদিন প্রভাত হইলে দেখা গেল, তাঁহার সংজ্ঞা নাই। তিনি আমাদের অনেকবার বলিতেন, "প্রগাঢ় শান্তিতে আমি পৃথিবী হইতে বিদায় লইব।" তাহাই হইল। ২০এ আগষ্ট সোমবার সন্ধ্যা সার্দ্ধ ছয় ঘটিকার সময় সূর্যের শেষ জ্যোতির সহিত তাঁহার আত্মাকে যখন ধীরে ধীরে এ জগতে অস্তমিত হইতে দেখিলাম, তখন শোক-স্তম্ভিত হইতে দেখিলাম, তখন শোক-স্তম্ভিত মন মথিত করিয়া এই প্রশ্ন উদিত হইল—"এই কি মরণ?"

"তাঁহার শোকে সংবাদ পত্রে, সভামধ্যে, রাজপথে এবং অন্তপুরে যে ক্রন্দন-ধ্বনি উঠিয়াছিল, লেখনী তাহা বর্ণনা করিতে অক্ষম। অন্তিম শয্যা হইতে গঙ্গাতীর পর্যন্ত তাঁহার শবদেহের শ্মশান-যাত্রা কাব্যের এক করুণ অধ্যায় পূর্ণ করিবার যোগ্য। স্থানে স্থানে মহিলাগণের সভা, সর্বত্র ছাত্রগণের অধিবেশন, বালকগণের কাতর রোদন, বালিকাগণের অশ্রুপাত, আনন্দমোহনের প্রতি দেশের যে কি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল, তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছে, আমাদের হৃদয়ে যে দারুণ শেল বিদ্ধ হইয়াছে, কোন্ ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিব?"

নিরুদ্দেশের কাহিনী

[এইচ্ বোস বা হেমেন্দ্রমোহন বসু ছিলেন আনন্দমোহন বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র। সেকালে অনেক কিছু নূতনত্বের প্রাণ পুরুষ ছিলেন মানুষটি। নিজের তৈরী "প্যাথোফোনের" সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গান রেকর্ড করা থেকে শুরু করে ভারতে স্বদেশী মালিকানায় সাইকেল ব্যবসা তিনিই শুরু করেন। সেকালের "কুন্তলীন পুরস্কারের" প্রবর্তকও তিনি। প্রতি বছর কুন্তলীন পুরস্কারের নির্বাচিত গল্পগুলো বইয়ের আকারে প্রকাশিত হত। বইয়ের নীচে প্রকাশকের নাম লেখা থাকতো –"এইচ বসু, পারফিউইমার, দেলখোস হাউজ।"

রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিই কুন্তলীন পুরস্কারের জন্য লিখেছিলেন। প্রথম বছরের প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত রচনাটি হলো "নিরুদ্দেশের কাহিনী।" এই হাস্যরসের রচনাটি লেখক অজ্ঞাত নামে লিখেছিলেন। পরে জানা যায় লেখক, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু। উল্লেখ্য.পুরস্কারের নগদ মূল্য ৫০ টাকা জগদীশচন্দ্র তাঁর ভগ্নী লাবণ্যপ্রভা বসু প্রমুখের রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়ের ভাণ্ডারে দান করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই প্রবন্ধটিই পরিমার্জিত রূপে "পলাতক" নামে "অব্যক্তে" স্থান পায়।]

প্রথম পরিচ্ছেদ

গত বৎসর এই সময়ে এক অত্যাশ্চর্য ভৌতিক কান্ড ঘটিয়াছিল। তাহা লইয়া সমস্ত বৈজ্ঞানিক জগতে আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। এই বিষয় লইয়া বিলাতের Nature, ফরাসী দেশের La Nature এবং মার্কিন দেশের Scientific Americanএ অনেক লেখালেখি চলিয়াছে—কিন্তু এ পর্যন্ত কিছু মীমাংসা হয় নাই।

২৮এ সেপ্টেম্বর তারিখে Englishman কাগজে সিমলা হইতে এক তারের সংবাদ প্রকাশ হয়—

"Simla Meteorological office, ২৭এ সেপ্টেম্বর।"

"বঙ্গোপসাগরে শীঘ্রই ঝড় হইবার সম্ভাবনা।"

২৯এ তারিখের কাগজে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হইল—

"Meteorological office, 5, Russel Street :

"দুইদিনের মধ্যেই প্রচণ্ড ঝড় হইবে। ডায়মণ্ডহারবারে Dauger Signal উঠানো হইয়াছে।"

৩০এ তারিখে যে Special Bulletin বাহির হইল তাহা অতি ভীতিজনক—

"আধ ঘণ্টার মধ্যে Barometer দুই ইঞ্চি নামিয়া গিয়াছে। আগামীকল্য ১০ ঘটিকার মধ্যে কলিকাতায় অতি প্রচণ্ড ঝড় হইবে, এরূপ তুফান বহু বৎসরের মধ্যে হয় নাই।"

বাংলা গবর্ণমেণ্ট হইতে ডায়মণ্ডহারবারের Sub-Divisional officer এর নিকট তারে খবর হইল—"Stop all outgoing vessels." এই সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে কলিকাতায় প্রচারিত হইল।

কলিকাতার অধিবাসীরা সেই রাত্রি কেহই নিদ্রা যায় নাই। আগামী কল্য কি হইবে তাহার জন্য সকলে ভীত চিত্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

Reuterএর Agent Times এ telegraph করিলেন—"The *Capital of our Indian Empire in danger."

১লা অক্টোবর আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হইল। দুই-চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে লাগিল।

সমস্ত দিন মেঘাবৃত ছিল, কিন্তু বৈকালে ৪ ঘটিকার সময় হঠাৎ আকাশ পরিস্কার হইয়া গেল। ঝড়ের চিহ্নমাত্রও রহিল না।

তার পরদিন Meteorological office খবরের কাগজে লিখিয়া পাঠাইলেন—

"কলিকাতায় ঝড় হইবার কথা ছিল, বোধ হয় উপসাগরের কূলে প্রতিহত হইয়া ঝড় অন্য অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে।"

ঝড় কোন্ দিকে গিয়াছে তাহার অনুসন্ধানের জন্য দিক্‌দিগন্তরে লোক প্রেরিত হইল কিন্তু তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

তারপর Englishman লিখিলেন—এত দিনে বুঝা গেল যে বিজ্ঞান সর্বৈব মিথ্যা।

Daily News লিখিলেন—যদি তাহাই হয় তবে গরিব টেক্স দাতাদিগকে পীড়ন করিয়া Meteorological এর ন্যায় অকর্মণ্য অফিস রাখিয়া লাভ কি?

তখন Pioneer, Civil and Military Gazettet Statesman তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন—উঠাইয়া দেও।

গবর্ণমেণ্ট বিভ্রাটে পড়িলেন। অল্পদিন পূর্বে Meteorological office এর জন্য লক্ষাধিক টাকার ব্যারোমিটার থার্মোমিটার আনানো হইয়াছে। সেগুলি এখন ভাঙা শিশি বোতলের মূল্যেও বিক্রয় হইবে না। আর Meteorological officeএর বড় সাহেবকে অন্য কি কার্যে নিয়োগ করা যাইতে পারে?

গবর্ণমেণ্ট নিরুপায় হইয়া কলিকাতা Medical Collegeএ লিখিয়া পাঠাইলেন, "আমরা ইচ্ছা করি Medical Collegeএ এ একটি নূতন chair স্থাপিত হয়।

নিম্নলিখিত বিষয়ে lecture দেওয়া হইবে—"On the Effect of Varition of Barometric Pressure on the Human System.

Medical College এর Principal লিখিয়া পাঠাইলেন—"উত্তম কথা, বায়ুর চাপ কমিলে ধমণী স্ফীত হইয়া উঠে, তাহাতে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি হয়। তাহাতে সচরাচর আমাদের যে স্বাস্থ্য ভগ্ন হইতে পারে তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে কলিকাতাবাসীরা আপাততঃ বহুবিধ চাপের নীচে আছে—

১ম চাপ	বায়ু প্রতি বর্গইঞ্চি	১৫ পাউণ্ড
২য়	ম্যালেরিয়া	২০ পাউণ্ড
৩য়	পেটেণ্ট ঔষধ	৩০ পাউণ্ড
৪র্থ	ইউনিভারসিটি	৫০ পাউণ্ড
৫ম	ইনকম ট্যাক্স	৮০ পাউণ্ড
৬ষ্ঠ	মিউনিসিপাল ট্যাক্স	১ টন

"বায়ুর দুই ইঞ্চি চাপের ইতর বৃদ্ধি "বোঝার উপর শাকের আটি" স্বরূপ হইবে। সুতরাং ; কলিকাতায় এই chair স্থাপন করিলে বিশেষ উপকার যে হইবে এরূপ বোধ হয় না।

তবে সিমলা পাহাড়ে বায়ুর চাপ ও অন্যান্য চাপ অপেক্ষাকৃত কম। সেখানে উক্ত chair স্থাপিত হইলে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে।"

ইহার পর গবর্ণমেণ্ট নিরুত্তর হইলেন। Meteorological অফিস এবারকার মত অব্যাহতি পাইলেন।

কিন্তু যে সমস্যা লইয়া এত গোল হইল, তাহা পূরণ হইল না।

একবার এক বৈজ্ঞানিক Natureএ লিখিয়াছিলেন বটে ; তাঁহার theory এই যে, কোন অদৃশ্য ধূমকেতুর আকর্ষণে বায়ুমণ্ডল আকৃষ্ট হইয়া উর্ধ্বে চলিয়া গিয়াছে।

কেহ কেহ বলিলেন যে, সেই সময় ছোটলাট, ডায়মণ্ডহারবার পরিদর্শন করিতে যান। তাঁহার দোর্দণ্ড প্রতাপে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়। তাঁহার ভয়ে ঝড় পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছে।

এসব অনুমান মাত্র। এখনও এ বিষয় লইয়া বৈজ্ঞানিক জগতে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে। এবার Oxford British Associationএ Herr Sturm F. R. S., "On a vanished Typhoon" সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। তাহা লইয়া বিশেষ আন্দোলন হইবার সম্ভাবনা।

এই ঘটনার প্রকৃত তত্ত্ব পৃথিবীর মধ্যে একজন মাত্র জানে সে আমি।

পরের অধ্যায়ে ইহা বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গত বৎসর আমার ভয়ানক জ্বর হইয়াছিল। প্রায় একমাস কাল শয্যাগত ছিলাম। ডাক্তার বলিলেন, সমুদ্রযাত্রা করিতে হইবে। নতুবা পুনরায় জ্বর হইলে বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। আমি জাহাজে Ceylon যাইবার জন্য উদ্যোগ করিলাম।

এতদিন জ্বরের পর আমার মস্তকের ঘন কুন্তলরাশি একান্ত বিরল হইয়াছিল। একদিন আমার অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, দ্বীপ কাহাকে বলে?" আমার কন্যা ভূগোল তত্ত্ব পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল! আমার উত্তর পাইবার পূর্বেই বলিয়া উঠিল "এই দ্বীপ"—ইহা বলিয়া প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায় আমার বিরল কেশ মসৃণ মস্তকে দু-এক গোছা কেশের মণ্ডলী দেখাইয়া দিল।

তারপর বলিল, "তোমার ব্যাগে এক শিশি 'কুন্তলীন' দিয়াছি জাহাজে প্রত্যহ ব্যবহার করিও, নতুবা নোনা জল লাগিয়া এই দু-একটি দ্বীপেরও চিহ্ন থাকিবে না।"

২৮এ তারিখে আমি chuson জাহাজে সমুদ্রযাত্রা করিলাম। প্রথম দু'দিন ভালোরূপেই গেল। ১লা তারিখ প্রত্যুষে সমুদ্র এক অস্বাভাবিক মূর্তি ধারণ করিল, বাতাস একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। সমুদ্রের জল পর্যন্ত সীসার রঙের ন্যায় বিবর্ণ হইয়া গেল।

জাহাজের কাপ্তানের বিমর্ষ মুখ দেখিয়া আমরা ভীত হইলাম। কাপ্তান বলিলেন, "যেরূপ লক্ষণ দেখিতেছি, অতি সত্বরই প্রচণ্ড ঝড় হইবে। আমরা কূল হইতে বহু দূর—এখন ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

এই সংবাদ শুনিয়া জাহাজে যেরূপ ঘোর শোক ও ভীতিসূচক কলরব হইল তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।

দেখিতে দেখিতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া গেল। চারিদিক মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকার হইল। এবং দূর হইতে এক এক ঝাপটা আসিয়া জাহাজখানাকে আন্দোলিত করিতে লাগিল।

তাব পর মুহূর্ত মধ্যে যাহা ঘটিল তাহার সম্বন্ধে আমার কেবল এক অপরিষ্কার ধারণা আছে—পাতালপুরী হইতে যেন রুদ্ধ দৈত্যগণ একেবারে নির্মুক্ত হইয়া পৃথিবী সংহারে উদ্যত হইল।

সমুদ্র, বায়ুর গর্জনের সহিত স্বীয় মহাগর্জনের সুর মিলাইয়া সংহার মূর্তি ধারণ করিল।

তারপর অনন্ত ঊর্মিরাশি, একের উপর অন্যে আসিয়া একেবারে জাহাজ আক্রমণ করিল।

এক মহা-ঊর্মি আসিয়া জাহাজের উপর দিয়া চলিয়া গেল—মাস্তুল, Life boat ভাঙিয়া ভাসাইয়া লইয়া গেল।

আমাদের অন্তিমকাল উপস্থিত। মুমূর্ষু সময়ে লোকে যেরূপ জীবনের প্রিয়বস্তু স্মরণ করে, সেইরূপ আমার প্রিয়জনের কথা মনে হইল। আশ্চর্য এই, আমার কন্যা আমার বিরল কেশ লইয়া যে উপহাস করিয়াছিল, এ সময়ে তাহা পর্যন্তও স্মরণ হইল।

"বাবা, এক শিশি কুন্তলীন তোমার ব্যাগে দিয়াছি।"

— হঠাৎ এক কথায় আর—এক কথা মনে পড়িল। বৈজ্ঞানিক কাগজে ঢেউয়ের উপর তৈলের প্রভাব সম্প্রতি পড়িয়াছিলাম। তৈল যে চঞ্চল জলরাশিকে মসৃণ করে এ বিষয়ে অনেক ঘটনা মনে হইল।

অমনি আমার ব্যাগ হইতে কুন্তলীনের শিশি খুলিলাম। তাহা লইয়া অতি কষ্টে ডেকের উপর উঠিলাম। জাহাজ টলমল করিতেছিল।

উপরে উঠিয়া দেখি সাক্ষাৎ কৃতান্তসম পর্বত প্রমাণ ফেনিল এক মহা-ঊর্মি জাহাজ গ্রাস করিবার জন্য আসিতেছে।

আমি 'জীব আশা পরিহরি' সমুদ্র লক্ষ্য করিয়া কুন্তলীন-বাণ নিক্ষেপ করিলাম। ছিপি খুলিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। মুহূর্ত মধ্যে তৈল সমুদ্র-ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

ইন্দ্রজালের প্রভাবের ন্যায় মুহূর্ত মধ্যে সমুদ্র প্রশান্ত মূর্তি ধারণ করিল। কমণীয় তৈলস্পর্শে বায়ুমন্ডল পর্যন্ত শান্ত হইল। ক্ষণ পরেই সূর্য দেখা দিল।

এইরূপে আমরা নিশ্চিত মরণ হইতে উদ্ধার পাই। এবং এই কারণেই সেই ঘোর বাত্যা কলিকাতা স্পর্শ করে নাই। কত সহস্র সহস্র প্রাণী যে এই সামান্য এক বোতল কুন্তলীনের সাহায্যে অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে?

শ্রী—

পুঃ—প্রায় ছয় মাস পরে Scientific American এ উপরোক্ত ঘটনার নিম্নলিখিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বাহির হইয়াছিল—

THE SOLUTION OF A MYSTERY

The vanished cyclone of calcutta remained so long a mystery to vex the soul of meteorologists. We are now glad to be able to offer an explanation of this seeming departure from all laws that govern atmospheric disturbances.

It wo ıld appear that a passenger on board the chusan threw overboard a bottle of KUNTALINE while the vessel was in the Bay of Bengal. and the storm was at its height. The film of oil spread rapidly over the troubled waters, and produced a wave of condensation. Thus counteracting the wave of rarefaction to which the cyclone was due. The superincumbent atmosphere being released from its dangerous tension subsided into a state of calm. Thus by the mere chance a catastrophe was averted — Scientific American.

বৃক্ষের জন্ম ও মৃত্যু

[প্রবন্ধটি গাছের কথা ও উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু প্রবন্ধের আদিরূপ। মুকুল পত্রিকায় প্রকাশকালে সম্ভবত সম্পাদক কিম্বা বোন লাবণ্যপ্রভার তাগিদে বড় প্রবন্ধ প্রকাশের প্রয়োজনে জগদীশ চন্দ্র এই মূল প্রবন্ধকে ভেঙ্গে মার্জিত ও পরিবর্ধিত আকারে "গাছের কথা ও 'উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু' শীর্ষক দুটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই মূল প্রবন্ধটি ১৩৮৯ সালের শারদীয় কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল]

জীবিত ও মৃতের প্রভেদ

সজীব ও নিজীব বস্তুতে কি প্রভেদ জান? মৃত ও জীবিত জন্তুর মধ্যে কি কি ভিন্নতা বলিতে পার? একখানা কাষ্ঠ ও একটি জীবন্ত বৃক্ষে কি পার্থক্য?

জীবন বর্ধনশীল আর মরণ ক্ষয়শীল। মৃত জিনিষ কোনদিন বাড়ে না, যার মধ্যে কোনরূপ গতি কি স্পন্দন নাই তাকে আমরা মৃত বলি। যাহা জীবিত তাহা ক্রমাগত বাড়িতেছে—যাহার বৃদ্ধি স্থগিত হইয়া যায় তাহার ক্ষয় হইতে আরম্ভ হয়। মৃত্যু ক্রমশ নিকটে আইসে।

পাণ্ডবদিগের বনবাসকালে একবার যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত অরণ্যে যাইতে যাইতে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। তৃষ্ণায় অতি কাতর হইয়া প্রথমতঃ সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতাকে জলাশয়ে পাঠাইয়া দেন। সহদেব অন্বেষণ করিতে এক সরোবর দেখিতে পাইলেন। এক যক্ষ সেই সরোবর অধিকার করিয়া বসিয়াছিল।

পাণ্ডুপুত্র জল আনিতে যাইতেছেন দেখিয়া যক্ষ কহিল অগ্রে আমার কয়টি প্রশ্নের উত্তর দেও, পরে জল পান করিও। নতুবা জল স্পর্শ করিলেই প্রাণ হারাইবে। পাণ্ডুপুত্র এই কথা শুনিয়া জল পান করিতে যাইয়া যক্ষের শাপে প্রাণ হারাইলেন। এদিকে সহদেব ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব করিতেছেন দেখিয়া যুধিষ্ঠির তৎপশ্চাতে

নকুল অর্জুন ও ভীমকে একে একে পাঠাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের সকলেরই এক দশা ঘটিল। যক্ষের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া এবং তাহার বাক্য অবহেলা পূর্বক জলস্পর্শ করিয়া একে একে চারিটি ভাই সেই যক্ষের মায়াবলে সরোবরের তীরে মৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন।

অতঃপর যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের অন্বেষণ করিতে করিতে সরোবর তীরে উপস্থিত হইলেন। তখন যক্ষ তাহাকে কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন। যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন।

কে জন্মিয়া স্পন্দিত হয় না?

যুধিষ্ঠির কহিলেন অন্ড জন্মিয়া স্পান্দিত হয় না। জীবিত বস্তু সচরাচর গতিশীল। অন্ডে জীবন লুক্কায়িত থাকে, অথচ জীবনের লক্ষণ যে গতি ও বৃদ্ধি দেখা যায় না।

বীজে নিদ্রিত জীবন

যেমন অন্ডে জীবন ঘুমাইয়া থাকে, উত্তাপ পাইলে অন্ড হইতে জীবশিশু জন্ম লাভ করে। সেইরূপ বীজে বৃক্ষশিশু লুক্কায়িত থাকে, মৃত্তিকা, উত্তাপ ও জল পাইলে বীজ হইতে বৃক্ষশিশুর জন্ম হয়।

বীজানুতে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ

বীজের উপরে এক কঠিন আবরণ তদ্বারা বৃক্ষশিশু আবৃত থাকে। বীজের আকার নানাপ্রকার, কোনটি অতি ক্ষুদ্র কোনটা অতি বৃহৎ। বীজের আকার হইতে বৃক্ষের আকার নির্ণয় করা যায় না। প্রকান্ড বটবৃক্ষ সরিষার অপেক্ষা ক্ষুদ্র বীজ হইতে উৎপন্ন হয়। কে মনে করিতে পারে এই ক্ষুদ্র বিন্দুর মধ্যে ভবিষ্যতের প্রকান্ড বৃক্ষ লুকাইয়া আছে।

কে বীজ বপন করে?

তোমরা হয়ত কৃষকদিগকে শস্য বপন করিতে দেখিয়াছ। মানুষেরা কেবল বীজ বপন করে এমন নহে। অনেক সময়ে পাখীরা ফল খাইয়া অনেক দূরদেশে বীজ লইয়া যায়। এই প্রকারে সমুদ্রের মধ্যে জনমানব শূন্য দ্বীপে বীজ উতপ্ত হয়। এতদ্ভিন্ন অনেক বীজ বাতাসে উড়িয়া অতি দূর দেশে ছড়াইয়া পড়ে। শিমুল ফুল যখন পাকিয়া উঠে তখন এক একটি বীজ তুলার উপর ভর করিয়া বাতাসে অনেক দূর চলিয়া যায়। এই প্রকারে দিবারাত্রি দেশ দেশান্তরে বীজ বপন হইতেছে।

প্রত্যেক বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে কিনা কেহ বলিতে পারে না, হয়ত কঠিন প্রস্তরের উপর বীজ পড়িল। সেখানে আর অংকুর বাহির হইতে পারিল না। কঠিন প্রস্তরে কি করিয়া ক্ষুদ্র শিশু পালিত হইবে। অঙ্কুরোদ্গমের জন্য উত্তাপ, জল ও মৃত্তিকার আবশ্যক।

বীজের জীবনী শক্তি

যেখানেই পড়ুক না কেন বহুকাল পর্যন্ত বৃক্ষশিশু বীজের মধ্যে নিরাপদে নিদ্রিত থাকে—যতদিন বাড়িবার উপযুক্ত স্থান না পায় ততদিন উপরকার দৃঢ় আবরণ বর্মের ন্যায় বৃক্ষ শিশুকে বাহিরের বিপদ হইতে রক্ষা করে। শুনিতে পাই মিশর দেশে পিরামিডের মধ্যে শস্যের বীজ পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি প্রায় ৬০০ বৎসর পুরাতন। সেই বহু পুরাতন বীজ মাটিতে বপন করিলে পর তাহা হইতে শস্য উৎপন্ন হইয়াছে।

"অপার তাহার করুণা"

কি আশ্চর্য কথা। এত সহস্র বৎসর শিশু ঘুমাইয়া ছিল। মৃত্তিকা স্পর্শে জাগিয়া উঠিল। এতদিন কে ইহাদের জীবন রক্ষা করিয়াছিল। কার প্রাসাদে মৃত্যু আসিয়া ইহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে নাই। পণ্ডিতেরা বলেন একটি ক্ষুদ্র পক্ষী-শাবকেও বিধাতার (প্রকৃতির) স্নেহ দৃষ্টির অন্তরালে হয় না। বীজের জীবন একটি পক্ষীর জীবন হইতে অনেক ক্ষুদ্র। পক্ষীরা চেতন, বীজ অচেতন। তবু দেখ বিধাতা (প্রকৃতি) তাহার ঘুমন্ত প্রাণটুকুকে কেমন যত্নে রক্ষা করেন।

ধাত্রী ক্রোড়ে শিশু

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বীজ পক্ক হয়। আম, লিচু প্রভৃতির বীজ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে হয়। ধান যব ইত্যাদি শস্য আশ্বিন কার্তিক মাসে পক্ক হয়। মনে কর একটিগাছের বীজ আশ্বিন মাসে পাকিয়াছে। আশ্বিন মাসের শেষে দু-একদিন প্রচণ্ড ঝড়ে গাছগুলি মূল পর্যন্ত কাঁপিতে মাকে। তাহার পাতা ছিন্ন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা ভগ্ন হইয়া চারিদিকে পড়িতে থাকে। এই সময়ে বীজগুলি বিক্ষিপ্ত হয়। প্রবল বাতাসের বেগে কেথায় লইয়া যায় কে বলিতে পারে? মনে কর একটি বীজ সমস্ত দিন রাত্রি মাটিতে লুটাইতে লুটাইতে একটি মৃত্তিকা স্তূপের নীচে অথবা একখণ্ড ভগ্ন ইষ্টকের নীচে আশ্রয় লইল। কোথায় ছিল, কোথায় আসিয়া পড়িল ক্রমে ক্রমে ধূলি মৃত্তিকা আসিয়া তাহাকে আচ্ছাদন করিল—এখন হইতে সে মানুষের চক্ষু হইতে অন্তর্ধান হইল।

মনুষ্য চক্ষুর আড়াল হইল বটে কিন্তু বিধাতার (প্রকৃতির) চক্ষুর অন্তরালে যায় নাই। পৃথিবী ধাত্রীর ন্যায় তাহাকে ক্রোড়ে লইল। সে মৃত্তিকার আবরণে বাহিরের শীত ও ঝঞ্ঝাপাত হইতে রক্ষা পাইল। এখন অদৃশ্য হইয়া বীজটি নিদ্রিত হইয়া রহিল। মাসের পর মাস কাটিয়া গেল, শীত অবসানে বসন্ত আসিল। তারপর কর্ষার আরম্ভে দ'একদিন বৃষ্টি হইল। জল স্পর্শে ঘুমন্ত শিশু জাগিয়া উঠিল। এখন আর লুকাইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। বাহিরের আলোর······কে যে শিশুকে বলিতেছে "আলোকে আইস" উপরে সূর্যকিরণ দেখিবে। আর ঘুমাইও না।" আস্তে আস্তে বীজের বাহিরের আবরণটি খসিয়া পড়িল, দুটি কোমল পাল্লার মধ্য হইতে অঙ্কুর বাহির হইল। অঙ্কুরের এক অংশ নীচের দিকে যাইয়া মৃত্তিকা দৃঢ়রূপে ধরিয়া রহিল। আর এক অংশ মাটি ভেদ করিয়া আলো লক্ষ্য করিয়া উপরে উঠিল। তোমরা কি অঙ্কুর উঠিতে দেখিয়াছ? মনে হয়, শিশুটি যেন ক্ষুদ্র মস্তক তুলিয়া বিস্ময়ের সহিত নতুন রাজ্য উঁকি দিয়া দেখিতেছে।

কুমুদিনীর নিশি জাগরণ

[বসু বিজ্ঞান মন্দিরে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বক্তৃতার সারাংশ 'প্রবাসী' জৈষ্ঠ ১৩২৬ সনের সংখ্যায় জগদীশ চন্দ্র বসু ও শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য যুগ্মনামে প্রকাশিত]

বৈজ্ঞানিকের আগেই কবি আসর লইয়াছেন। "ফুল্ল জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনী" তে কুমুদিনীর উল্লেখ ও দিবসে "নির্ম্মল উজ্জ্বল সূর্যকরের প্রভাবে নলিনীর বিকাশ দেখিয়া কবি গাহিলেন

> গিরৌ ময়ূরাঃ গগনে পয়োদাঃ
> লক্ষান্তরে ভানুঃ জলে চ পদ্মম্।
> ইন্দুর্দ্বিলক্ষে কুমুদস্য বন্ধু—
> র্যো যস্য মিত্রং নহি তস্য দূরম॥"

কবি এইখানে থামিলেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকও কবির ন্যায় এই বৈচিত্রময় ব্রহ্মাণ্ডে এক মহান ছন্দ এবং বিরাট ঐক্যের সন্ধানে ফিরিতেছেন। তাই বৈজ্ঞানিক মনতমসাবৃত অমানিশায় কুমুদিনীর স্বরূপ দেখিবার ভার লইলেন; প্রদীপ হাতে কাছে আসিয়া বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিয়া সেই ঘোর অন্ধকারে প্রিয়সখার অদর্শনজনিত কোন চিহ্নই তিনি কুমুদিনীতে দেখিতে পাইলেন না। বৈজ্ঞানিক দেখিলেন কুমুদবন্ধু আকাশে দেখা দিল আর না দিল প্রতিরাত্রেই কুমুদের সেই একই উন্মেষ—সেই একই উল্লাস; আরও দেখিলেন যে রবিকর স্পর্শমাত্রেই কুমুদিনীর সঙ্কোচ ঘটে না, তাহার সুষুপ্তি আসে সূর্যোদয়ের অনেক পরে।

একখানি ফরাসী অভিধানে কাঁকড়া সম্বন্ধে লেখা ছিল—কাঁকড়া একটি ছোট লাল মাছ যাহা পিছন দিকে চলে। অভিধানকার কাঁকড়ার এই বর্ণনা যথাযথ হইয়াছে কিনা জানিবার জন্য প্রসিদ্ধ প্রাণীতত্ত্ববিৎ কুভিয়ার এর নিকট যান; কুভিয়ার শুনিয়া বলিলেন—চমৎকার হইয়াছে, শুধু এইটুকু তফাৎ কাঁকড়া মাত্রেই ছোট নয়, সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত ইহা লাল নয়। ইহা মাছ নয় এবং আর যে দিকে যাউক ইহা পিছনে চলে না, এই যা প্রভেদ, নচেৎ বর্ণনা একেবারে হুবহু হইয়াছে। কবি বর্ণিত কুমুদিনীর প্রণয়েতিহাসও অনেকটা এইরূপই। চন্দ্র না উঠিলেও কুমুদ ফোটে এবং সূর্য উঠিলেই ইহা মুদিয়া যায় না।

"বেলা গেল সন্ধ্যা হ'ল ফুটল ঝিঙ্গার ফুল" গান শুনিয়া আর এক জাতীয় পুষ্পের বিকাশে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। গঙ্গার ধারে সিসুবেড়িয়ার বাগানে খানিকটা জায়গায় মালী ঝিঙ্গা গাছ দিয়াছিল। সকালের সেই বাগানকে আর অপরাহ্নে যেন চেনাই যায় না। সূর্যের অস্তাচল গমনের সঙ্গে সঙ্গে সদ্য প্রস্ফুটিত ঝিঙ্গাফুল নব রং এ

রঞ্জিত হইয়া এক অপূর্ব শোভা ধারণ করে। এখানেও ফুলগুলি সমস্ত রাত্রি প্রস্ফুটিত থাকিয়া সকালবেলা মুদ্রিত হয়।

উদ্ভিদের নিদ্রা ও জাগরণ সম্বন্ধে গত অর্ধশতাব্দী ধরিয়া বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের অনেকে মনে করেন যে ঘুমান বা জাগা উদ্ভিদের সম্পূর্ণ খেয়াল মাত্র।

কুমুদ রাত্রে ফোটে এবং দিনে বন্ধ হয়—কারণ সে এই রূপই করিয়া থাকে; আর পদ্ম দিনে ফোটে রাত্রে মুদিয়া যায়, কারণ পদ্ম এ বিষয়ে কুমুদের ঠিক উল্টা করে।

একবার এক প্রশ্ন উঠিয়াছিল—

তিলঞ্চ সরিষা চৈব উভয়ে তৈলদায়িকা।
তর্পণে তিল দরকার, সরিষা নাস্তি কি কারণে॥

তাহার উত্তর আসিয়াছিল—

ঢাকঞ্চ ঢোলকঞ্চৈব
উভয়ে বাদ্যদায়িকে।
গাজনে ঢাক দরকার;
ঢোল; নাস্তি যে কারণে॥

কুমুদ ও পদ্মের ফোটা সম্বন্ধে অনেকটা এই রকমের কৈফিয়ৎ মিলিত।

কিন্তু এ সম্বন্ধে এই কি শেষ কথা থাকিবে? কয়েক বৎসর ধরিয়া এখানে এ বিষয়ে অনেকগুলি পরীক্ষা গ্রহণ করা হইয়াছে। সেই সকল পরীক্ষার ফল হইতে কি তথ্যে উপনীত হওয়া যায় দেখা যাউক।

টবসুদ্ধ একটা গাছকে কাৎ করিয়া গাছের ডালটিকে যদি মাটির সহিত শোয়াইয়া রাখা যায় তো দেখা যায় ডালটা বাঁকিয়া মাথা উঁচু করিয়া উঠিতেছে। পৃথিবীর টানের বিরুদ্ধে গাছ এইরূপ করিয়া থাকে। এইরূপ বাঁকিয়া উপরে উঠিবার শক্তি কোন গাছে খুব বেশী, কোথাও বা উহা খুব কম।

মাধ্যাকর্ষনের ক্রিয়া ব্যতীত উদ্ভিদ আলোক স্পর্শে পাতা উঠাইয়া নামাইয়া নানা রকমে সাড়া দিয়া থাকে। কোথাও পাতা বাঁকিয়া আলোকের দিকে অগ্রসর হয়, আবার কোন গাছে উহারা আলোক হইতে দূরে যাইবার জন্য ঘাড় বাঁকাইয়া থাকে। একটি মাদার গাছের পাতার উপর আলো ফেলা হইল, পাতাটি এতক্ষণ অন্ধকারে চুপ করিয়াছিল। আলোক পাইবা মাত্র মন পুলকিত হউক বা যাহাই হউক এক মিনিট দেড় মিনিটের মধ্যেই উপর দিকে বাঁকিতে লাগিল। কিন্তু লজ্জাবতী এইরূপ অবস্থায় যেন লজ্জায় মাথা হেঁট করে।

পৃথিবীর আকর্ষণ ও আলোকজনিত উত্তেজনা, মাত্র এই দুইটি শক্তি যদি উদ্ভিদের উপর কাজ করিত তাহা হইলেও উহাদের সমবেত শক্তি গাছের মধ্যে কত বিভিন্ন প্রকারের পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিত। কোথাও একটি শক্তি অপরটির বিপরীত দিকে কাজ করিতেছে। কোথাও বা তাহারা পরস্পর সহায়তা করিতেছে; এবং প্রত্যেক

শক্তির ক্রিয়ার পরিমাণ কত বিভিন্ন। সুতরাং কোন উদ্ভিদে এই দুইটি ভিন্ন শক্তির সমবেত ফল দেখিয়াই বলা চলে না কোনটা কতটুকু কাজ করিতেছে; তজ্জন্য পৃথক পরীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। কৃপন ১৫ টাকা রোজগার করিয়া তাহার মধ্যে ১০, টাকা জমায়; দাতা ১৫০০, টাকা রোজগার করিয়া আবার মাসের শেষে ধার করে; সুতরাং সঞ্চয়ের পরিমাণ দেখিয়া কোন গৃহস্থের আয় ব্যয়ের অঙ্কের পরিমাণ দেওয়া চলে না; তজ্জন্য তাহার হিসাবের খাতা দেখিতে হইবে।

প্রথমতঃ দেখা যাউক কুমুদের এই পাতা খোলা বা পাতা বন্ধ পৃথিবীর আকর্ষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলে ঘটিতেছে কিনা। একটি অর্ধপ্রস্ফুটিত কুমুদফুল লওয়া হইল; পাপড়িগুলি যদি উপরের দিকে উঠে তো ফুলটি মুদিয়া যাইবে, যদি নীচের দিকে নামে তো উহা আরও খুলিবে; কিন্তু ঠিক বিপরীত হইবে যদি ফুলটিকে মাথা নীচু ও ডালটি উঁচু করিয়া ধরিয়া রাখা যায়; তখন পাপড়িগুলির উপরে উঠার ফলে ফুলটি আরও খুলিয়া যাইবে এবং নীচে নামিলে ফুলটি বন্ধ হইবে। সুতরাং একটি ফুলকে যদি মাথা নীচু করিয়া রাখা যায় তো যখন তাহার ফুটিবার কথা তখন সে বুজিয়া যাইবে। তখন তাহার মুদিবার কথা তখন সে খুলিয়া যাইবে। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে সোজাই দাঁড়াক বা উল্টিয়া থাকুক যখন ফুটিবার কথা তখনই কুমুদ ফোটে তাহার কোন ব্যতিক্রম ঘটে না।

সুতরাং কুমুদ যে মাধ্যাকর্ষণের উত্তেজনায় ফোটে না তাহা দেখা গেল। এইবার আলোর ক্রিয়ার ফল অনুসন্ধান করা যাউক।

একটি সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মিত হইল যাহাতে পরীক্ষাকারীর সাহায্য ব্যতিরেকে তাহার অনুপস্থিতিতেও ফুলের পাপড়ির উঠানামা মিনিটের পর মিনিট ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিনের পর দিন স্বতঃই লিপিবন্ধ হইতে চলিল। দেখা গেল সূর্য উঠিলেই রবিকর স্পর্শে কুমুদিনী মুদ্রিতা হয় না, বেলা ১০/১১ টার পর তাহার পাপড়ি বুজিয়া আসে।

সুতরাং ইহা আলোকের উত্তেজনার ফলেও নয়। ফুলের এই নিজ লিখিত লিপির সাক্ষ্য হইতে একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায় সে উহা সন্ধ্যা ৬ টার সময় পুলিতে আরম্ভ করে, এবং রাত্রি ১০ টার সময় সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া যায়। আর বেলা ১০ টার সময় সম্পূর্ণরূপে বুজিয়া যায়। আরও দেখা যায় সন্ধ্যার সময় হইতে তাপমাত্রাযন্ত্রের পারদ বেশী নামিতে থাকে। কুমুদিনীর দিবানিদ্রা এবং রাত্রিজাগরণ তবে কি বাহিরের উত্তাপ ও শৈত্যের ফলে ?

পূর্বের ঐ যন্ত্রটির গায়ে আর একটি যন্ত্র লাগাইয়া দেওয়া হইল যাহাতে ফুলের ঐ লিপির পাশে পাশে সমস্ত দিবারাত্রির তাও পরিবর্তনের সংবাদ লিপিবন্ধ হইতে লাগিল। দিনের পর দিন এইরূপ লিপিসাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল। পরে মিলাইয়া দেখা গেল যে দুইটি লিপিই সম্পূর্ণ এক, মিশাইলে চেনাই যায় না যে দুইটিতে দুইটি বিভিন্ন বিষয় লিপিবন্ধ হইয়াছে।

সুতরাং দেখা গেল যে কুমুদের ফোটা বা বন্ধ হওয়া একমাত্র বাহিরের তাপের দ্বারাই সংঘটিত হয় ; এবং যে কারণে ফরিদপুরের খেজুর গাছ সন্ধ্যায় মাথা নোয়ায় এবং প্রাতঃকালে সোজা হইয়া দাঁড়ায় সেই একই কারণে সমস্ত পৃথিবীর কুমুদ রাত্রে বিকশিত হইয়া দিবসে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে এবং সেই কারণে গঙ্গার ধারে সিসু-বেড়িয়ার বাগানে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে ঝিঙ্গাফুলের রূপ বৈচিত্র দেখা যায়।

পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে দিনের বেলায় কুমুদের চারিদিকে যদি রাত্রের শৈত্য বজায় রাখা যায় তো দিবসেও রাত্রের ন্যায়ও কুমুদ প্রস্ফুটিত থাকে, পক্ষান্তরে রাত্রে যখন উহার চতুর্দিকে দিনের উত্তাপ সমপরিমাণে রাখিতে পারা যায় তো আকাশে পূর্ণ-চন্দ্রের আবির্ভাব হইলেও কুমুদিনী মুখ তুলিয়া চাহিবে না।

কিন্তু একটা কথা কুমুদিনী যখন বিকশিতা তখন নলিনী মলিনী কেন, আবার কমলিনীর উন্মীলনে কুমুদিনী মুদ্রিতা কেন? বাহিরের উত্তাপ বা শৈত্য কিরূপে দুইটিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থায় লইয়া যাইতেছে ?

একখণ্ড লৌহকে সমলম্ব একখণ্ড তাম্রের সহিত সংলগ্ন করিয়া উভয়কে উত্তাপ দিতে আরম্ভ করা হইল ; তাপে উভয়েই বাড়িবে, কিন্তু সমতাপে তাম্র সমলম্ব লৌহ অপেক্ষা অধিক বাড়ে, অথচ প্রত্যেকটি ধনুকের ন্যায় বাঁকিয়া যাইবে, যেটি বেশী বাড়ে সেইটি থাকিবে বাহিরে' যেটি কম বাড়ে সেইটি থাকিবে ভিতরে। সেইরূপ গাছের একদিকে যদি আর একদিক অপেক্ষা বেশী বাড়ে তবে গাছটি বাঁকিতে থাকিবে, পাতার একদিক আর দিকের অপেক্ষা বাড়িলে পাতাটি ধনুকের মত হইবে।

বাহিরের উত্তাপ বা শৈত্যের সহিত গাছের বৃদ্ধির কোন সম্পর্ক আছে কি না দেখিবার জন্য নবনির্মিত ম্যাগনেটিক ক্রেস্কোগ্রাফ যাহা অত্যধিক শক্তিশালী অণুবীক্ষণের দৃষ্টির অতীত গাছের বৃদ্ধিকে কোটি গুণ পরিবর্ধিত করিয়া চোখের সম্মুখে ধরে। সেই ক্রেস্কোগ্রাফে একটি গাছ বসান হইল ; গাছ তাহার সাধারণ অবস্থায় বাড়িতে লাগিল। ঠাণ্ডা বরফজল চারিদিকে দেওয়া হইল। দেখিতে দেখিতে উহার বৃদ্ধি একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। এইবার বরফজল ফেরিয়া গরম জল দেওয়া হইল। গাছ তাহার সহজ অবস্থা অপেক্ষা অধিকতর দ্রুতবেগে বাড়িতে লাগিল।

বাহিরের উত্তাপে কুমুদের পাপড়িও বাড়িতে থাকিবে, কিন্তু এই পাপড়ির বাহিরের সবুজ দিকটা ভিতরের সাদা দিকটা অপেক্ষা বেশী কমণীয়, সুতরাং বাহিরটা ভিতর অপেক্ষা বেশী বাড়িবে। ফলে সমস্ত পাপড়িটা ধনুকের আকার লইবে—সবুজ দিক্‌টা থাকিবে বাহিরে, সাদা দিকটা থাকিবে ভিতরে, সুতরাং ফুলটি একেবারে মুদিয়া যাইবে। দিনে ফোটে এইরূপ একটি ফুল লওয়া হইল, দেখা গেল পাপড়ির ভিতরটা উহার বাহির অপেক্ষা অধিক কোমল, সুতরাং এক্ষেত্রেও পাপড়িটি বাঁকিবে, তবে এবার উহা উল্টাদিকে বাকিরে। ফলে বাহিরের উত্তাপের প্রভাবে উহা আরও খুলিয়া যাইবে।

সুতরাং, একই উত্তেজনা যে ভিন্ন জাতীয় পুষ্পকে বিভিন্ন রূপ প্রদান করে তাহা কেবলমাত্র তাহাদের আভ্যন্তরিক গঠন বৈচিত্র্যের ফলে।

উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতে নিম্নতম প্রাণীর সাড়া দিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে এ পর্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত ছিল। জীবমাত্রেই বাহিরের যাবতীয় আঘাতে সর্বদাই বিক্ষুব্ধ। কেবল উদ্ভিদকে যে দিকে নাড়াও সে সেই দিকেই নড়িবে, যে দিকে বাড়িবার সে শুধু সেই দিকেই বাড়িবে! বহির্জগতের আমাদের সাড়া দিবার কোন ক্ষমতা তাহার নাই। কেবল লজ্জাবতীর ন্যায় কয়েকটি স্পন্দনকারী উদ্ভিদ ভিন্ন যাবতীয় উদ্ভিদই নীরব নিস্পন্দ এবং এই অস্পন্দনতাই যেন উদ্ভিদের বিশেষ ধর্ম এই কথাই মনে করা হইত। কিন্তু উদ্ভিদকে কত অবস্থা পরম্পরার মধ্যেই না বাড়িতে হইয়াছে। নিয়ত পরিবর্তনশীল আলো ও অন্ধকার, তাপ ও শৈত্য, পৃথিবীর আকর্ষণ ঝঞ্জা কতই না তাহাকে সংক্ষুব্ধ করিয়াছে, কত ভাবেই না সে তাহার অন্তর্নিহিত বেদনা জ্ঞাপন করিয়াছে কিন্তু মানবচক্ষু তাহা দেখিতে পায় নাই। তাই এমন সূক্ষ্মযন্ত্র আবিষ্কার করিবার প্রয়োজন হইল যাহার সাহায্যে উদ্ভিদ আপনি আপনার অদৃশ্য বেদনার কাহিণী নিজ হাতে লিখিয়া দিতে পারে এবং তাহা এমন ভাষায় লিখিবে যাহা আমরা বুঝিতে পারি। কেবলমাত্র তখনই এই এই প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভব হইল যে উদ্ভিদমাত্রেই, না কেবলমাত্র লজ্জাশীলা লতা, বাহিরের আঘাত উত্তেজনায় অভিভূত হয়। আজ সেই লিপির সাক্ষ্যে আমরা বলিতে পারি যে, এই ভূমণ্ডলে শুধু মানবই যে বাহিরের আঘাত উত্তেজনায় আক্রান্ত হইতেছে তাহা নয়, নীরব উদ্ভিদও সমভাবে উহা অনুভব করিতেছে এবং কত কাল কত যুগ ধরিয়া কত অশ্বত্থ বট কত তাল তমাল সেই আঘাত উত্তেজনার ইতিহাস নিজেদের দেহে বহন করিতেছে।*

গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা

('দেশ', ২২শে আগষ্ট ১৯৮১ সংখ্যায় প্রকাশিত দিবাকর সেন ও সত্তম ঘোষ রচিত "আচার্য জগদীশচন্দ্রের অপ্রকাশিত বাংলা রচনা' শীর্ষক প্রবন্ধ]

সম্প্রতি জগদীশচন্দ্রের আরও কিছু পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া গেছে তাঁর ১৮৯৭ সালের পদার্থবিদ্যা বিষয়ক গবেষণার খাতার মধ্যে। লেখাগুলির রচনাকালের কোন উল্লেখ নেই এবং এগুলি অধিকাংশই অসমাপ্ত। কোন কোন জায়গায় তিনি লিখে আবার কেটে দিয়েছেন। এই রচনাগুলি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে কোন সঠিক তথ্য জানা নেই।

খাতাটির প্রথমদিকে রয়েছে সাইকেল-সংক্রান্ত একটি রচনা—কিন্তু কোন নামকরণ নেই। যতদূর জানা যায় কলকাতায় সর্বপ্রথম সাইকেলের প্রচলন হয় ১৮৮৯ সালে।

---

* [চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক সংগৃহীত ও অনুদিত]

আনন্দমোহন বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র হেমেন্দ্রমোহন বসু সে যুগে প্রথম সাইকেলের ব্যবসা শুরু করেন। সাইকেলকে জনপ্রিয় করার জন্য সেই সময়ে কলকাতায় কয়েকটি ক্লাবও চালু হয়। প্রথম ভারতীয় সাইকেল-চালকদের মধ্যে ছিলেন তৎকালীন বাংলার বিখ্যাত তিন স্যার—জগদীশ চন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও নীলরতন সরকার। জানা যায়, হেমেন্দ্রমোহন ও জগদীশ চন্দ্র খুব ভোরে উঠে সাইকেল নিয়ে চলে যেতেন গড়ের মাঠে—রেড রোডের কাছাকাছি সাইকেল চড়া শিখতে। আর এদের উসাহদাতা হিসাবে সঙ্গে থাকতেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র।

সাইকেল সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র লিখেছেন ঃ

"আজকাল শহরের বালক বালিকারা সকলেই বোধ হয় বাইসিকেল দেখিয়াছে, কিন্তু বাইসিকেল এমনি সখের জিনিস যে যদিও কলিকাতার রাস্তাতে এখন অনেক বাইসিকেল চলিতেছে তথাপি লোকের দেখিবার কৌতূহল নিবৃত্তি হয় নাই। যে জিনিসটাকে এক মুহূর্ত খাড়া রাখা যায় না একজন মানুষ তাহার উপর উঠিয়া বায়ুবেগে গমন করিতেছে ইহাতে লোকের কৌতূহল হইবার কথা নয়ত কি? অল্প-দিন হইল এ দেশে বাইসিকেল প্রচলিত হইয়াছে তাহাতেই এত লোকের সখ হইয়াছে। বিলাতে তাহা হইলে ব্যাপারখানা কি তাহা বোঝা কঠিন হইবে না। সে দেশে বাইসাইকেলের এত ব্যবহার যে বিলাতে ও আমেরিকাতে কোটী কোটী টাকার কারবার চলিতেছে। পৃথিবীর মধ্যে আর কোন জিনিসেরই এতবড় কারবার নাই। আমেরিকাতে রেলওয়ে স্টেশনে গাড়ীর মতন বাইসিকেলও ভাড়া পাওয়া যায়। কি বেড়াইতে কি অফিসে যাইতে সকল সময়ই ইহার ব্যবহার হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে যাতায়াত করা যায় বলিয়াই ইহার এত আনন্দ। যে একবার শিখিয়া ফেলে তাহার নেশা না হইয়া যায় না, সমুদয় সখের জিনিসের মধ্যে বাইসিকেলই প্রিয় হইয়া হইয়া উঠে। তাহার পরিচর্যাতে নিযুক্ত হওয়ার কষ্টকে কষ্টই মনে হয় না।——কেবল সখ ছাড়া ইহাতে কাজেরও অনেক সুবিধা হয়। বিলাতে অনেক রকম কাজে বাইসিকেল ব্যবহার হয়।——ডাক-পিয়নেরা বাইসিকেল চড়িয়া চিঠি বিলি করে, দাসীরা বাজার করিয়া আনে। এইরূপ বাইসিকেল লোকের কত সুবিধা করিয়া দিয়াছে। আমাদের দেশেও ——আফিসের লোকেরা বাইসিকেল-এ চড়িয়া তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া আসে।

বাইসিকেল রাখিতে ঘোড়ার মতন খরচ লাগে না, তাই যাহারা ঘোড়া রাখিতে অক্ষম তাহারা স্বচ্ছন্দে বাইসিকেল-এ একবার কিছু টাকা খরচ করিতে পারেন। বাইসিকেল চড়িতে যেমন আনন্দ তেমনি শরীরেরও চালনা হয়। ইহাতে চড়িয়া অতি শীঘ্র প্রকৃতির রাজ্যে বেড়ান যায় সুন্দর সুন্দর পশু পাখী-বৃক্ষ নদী ফল ফুল দেখিয়া বিশুদ্ধ সুখ ভোগ করা যায়। সেকালে রাম পুষ্পক রথে চড়িয়া সীতাকে লইয়া লঙ্কা হইতে অযোধ্যাতে ফিরিবার সময় চতুর্দিকের শোভা দেখাইতেছিলেন। আজকাল বাইসিকেল আমাদের পুষ্পক রথ। বাইসিকেল এর উৎপত্তি ফ্রান্সে, ইংলণ্ডে ইহার উন্নতি হয়।——

এর পরের লেখাটিরও কোন নামাকরন হয়নি। লেখাটি ছোট গল্পের আকারে একটি রচনা শিশুদের জন্য এইটিই সম্ভবত জগদীশচন্দ্রের এককভাবে একমাত্র গল্প রচনা। একটি তুচ্ছ বিষয়ে একটি ছোট মেয়ের মানসিক দ্বন্দ্ব, তার শিশুসুলভ লোভ ও পরে ভালবাসার সাশ্রু উচ্ছ্বাস খুব সরল ভাষায় এই কাহিনীতে ব্যক্ত হয়েছেঃ

"আমাদের সুলেখার বয়স সবে ৭ বৎসর। সে বড় দুর্দান্ত মেয়ে। তাহার ভাইদের যাহা করিতে দেখিত সেও তাহা করিবার কোন উপায় বাহির করিয়া নেয়। ভাইদের সঙ্গে স্যাণ্ডো করা, প্যারালাল বারে চড়া প্রভৃতি সবই তার চলে। ইহার জন্য সে দাদাদের খুব প্রিয় পাত্রী হইয়া উঠিয়াছিল। সে দিদিদের কাছে প্রায়ই দুঃখ করিত—দেখ দাদাদের কেমন পায়ের মাসল—কেন সে ছেলে হয় নাই। যদিও দিদিদের ইহা ভাল লাগিত না তবুও ছোট মেয়ের অসম সাহস ও আকাংখা দেখিয়া কেহ কিছু বলিত না। তাহার ভালবাসা ভরা ছোট হৃদয়টি দেখিয়া কেহ তাহাকে ডাকিতে না ডাকিতে সে আপনা আপনি গা ঘেঁসিয়া বসিয়া আছে। আর আদর পাইলে ত কথাই নাই। সে একেবারে গলিয়া যায়। এমন মেয়েকে কি কিছু বলা যায়?

'সুলেখা কেক খাইতে বড় ভালবাসে। একদিন তাহার মাসী তাহাকে একখানা কেক দিয়াছেন। তখন দুপুরবেলা—সুলেখার ছোড়দিদি তখন স্কুলে। সুলেখার একটি সদ্‌গুণ ছিল যে যাহা খাইতে পাইত তাহা ভাইবোনকে না দিয়া খাইত না। বিশেষ ছোড়দিদিটিকে। কাজেই দুপুরবেলা কেক পাইয়া সে বড় ফাঁপরে পড়িল, কি করে। একদিকে কেকটী খাইবার বড় ইচ্ছা, ওদিকে ছোড়দিদিকে না দিয়া সে খায় বা কি করিয়া। অনেক ভাবিয়া সে কেকটীকে তিন ভাগ করিল। ভাবিল, তিন ভাগ করিয়া সে যদি কেকটী হারাইয়া ফেলে তবে খুব ইচ্ছা হইলেও খুঁজিয়া পাইবে না। এরূপ সে কতবার আবশ্যকীয় পেন্সিল বই হারাইয়াছে, খুঁজিয়া পায় নাই। কেক কি হারাইতে পারিবে না কিন্তু কেকটিকে সে কিছুতেই হারাইতে পারিল না, যেখানেই লুকাইয়া রাখে সেখানটাই মনে জাগিয়া উঠে। কিছুতেই হারাইতে না পারিয়া সে একটুকরা খাইয়া ফেলিল। অবশিষ্ট দুই টুকরা পকেটে রাখিয়া সে ছোড়দিদির অপেক্ষায় রহিল। এদিকে কতক্ষণ চলিয়া গেল, ছোড়দিদির স্কুলের গাড়ী আর আসে না। বেচারা একবার উপর একবার নিচ করিতে লাগিল, গাড়ী আর আসে না। তখন আর এক টুকরা খাইয়া ফেলিল। তারপর বাকী টুকরাটা লুকাইয়া রাখিল, তবু গাড়ীও আসে না, ছোড়দিদিও আসে না। খানিক পরে গিয়া দেখিল পিপড়া ধরিয়াছে, তখন পিপড়ার উপর খুব রাগ হইল। ছোড়দিদিও এল না কাজেই সে আর লোভ ছাড়িতে না পারিয়া নিজেই তাহা খাইয়া ফেলিল—যা। যেই খাইয়াছে, অমনি ছোড়দিদি আসিয়া উপস্থিত—কি করে, ছোড়দিদির গলা জড়াইয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল, "লক্ষ্মীটি ছোড়দিদিমনি, রাগ করো না।" ছোড়দিদিও অবাক, সে ত আর ছোট বোনটির মনের কথা কিছুই জানে না।

সব কথা শুনিয়া তাহার ভালবাসাপূর্ণ মনটির আর একটি চিহ্ন পাইয়া বাড়ীর সবাই সুলেখার সকল দৌরাত্ম সহ্য করিত। তাহার ভালবাসা ও লোভের মধ্যে লোভের জয় হইল দেখিয়া আশ্চর্য হইও না। নিশ্চয় বলিতে পারি আর একবার তাহার ভালবাসারই জয় হইবে।

খাতাটির অন্য একটি পাতায় আছে রঘুনাথ পেরাঞ্জাপের কেমব্রিজে প্রথম স্থান অধিকার করে র‍্যাঙ্গলার হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি লেখা ঃ

"আমাদের দেশীয় একজন সম্প্রতি কেমব্রিজের প্রথম র‍্যাঙ্গলারের স্থান অধিকার করিয়া মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। কেমব্রিজের প্রথম র‍্যাঙ্গলার কি ও তাহার সম্মান ও গৌরব কত তাহা তোমরা এখনও বোধ হয় জান না। যেমন নবদ্বীপ সংস্কৃত শাস্ত্র-চর্চার জন্য বিখ্যাত তেমনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্কশাস্ত্র-চর্চার জন্য বিখ্যাত। অঙ্ক পরীক্ষায় পাস অনেকে হইতে পারেন কিন্তু যে দশজন সকলের উপরে উঠিতে পারেন তাহাদিগকে র‍্যাঙ্গলার বলে। আমাদের বাঙ্গলা দেশে বহুদিন পূর্বে শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু র‍্যাঙ্গলার হইয়া দেশের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাহার পর বৎসর কয়েক পূর্বে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক (যিনি এখন শিক্ষা বিভাগে দক্ষতার সহিত কার্য করিতেছেন) র‍্যাঙ্গলার হইয়াছিলেন। এই বৎসর কিন্তু প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন শ্রীযুক্ত রঘুনাথ পরশুত্তম (পুরুষোত্তম ?) পেরাঞ্জাপে। ইনি বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত রত্নাগিরি ডিষ্ট্রিক্ট ডাপলি গ্রাম নিবাসী মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ। ডাপলি গ্রামে পাঠ সমাপ্ত করিয়া ইনি বোম্বাই মারহাট্টা স্কুলে পাঠ্যাভ্যাস করেন। সেখান হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ফার্গুসান কলেজে অধ্যয়ন করেন। এই কলেজ হইতেই বি. এস. সি প্রভৃতি পরীক্ষা প্রথম শ্রেণীতে পাশ করিয়া ১৮৯৬ সালে সরকারী বৃত্তি লাভ করিয়া ইনি বিলাত গমন করেন। ইনি ইচ্ছা করিলে স্বচ্ছন্দে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়া প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া সুখে থাকিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া কঠিন ব্রত ধারণ করিয়া স্বার্থত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। তিনি আত্মীয় বন্ধুদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্য শিক্ষা সমিতির সভ্য হইলেন। দাক্ষিণাত্যে শিক্ষা বিস্তার করিবার জন্য এই সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সমিতির সভ্যগণ সামান্য বেতন লইয়া সমিতি কর্তৃক স্থাপিত বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষকতা করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। শ্রযুক্ত পেরাঞ্জাপে হাজার হাজার টাকা উপার্জন করিতে পারিতেন কিন্তু তিনি দেশে ফিরিয়া সামান্য বেতনে ফার্গুসান কলেজের শিক্ষকতার কার্য করিবেন, ইহা কি সামান্য ত্যাগস্বীকারের কথা।"

এর পরের পাতার রচনাটির নাম "পুরাতন কথা"। লেখার পর প্রায় সবটাই কেটে দিয়েছেন। তা ছাড়া লেখাটি আকারে খুবই ছোট ও জায়গায় জায়গায় এমন-ভাবে কাটা সে পাঠোদ্ধার প্রায় অসম্ভব।

আজ একটি আশ্চর্য কথা শুনবে। সে অনেক দিনের পুরাতন কথা—এত পুরাতন

কথা সে এখন শুনিলে মনে হয় সত্য না গল্প। অনেক পুরাতন পুঁথি পড়িয়া বিদেশী বই খুঁজিয়া পণ্ডিতরা এই খবর বাহির করিয়াছেন। এই যে আমরা কলিকাতার গঙ্গাতীরে সারি সারি জাহাজ দেখিয়া অবাক হই, মনে মনে পাশ্চাত্য জাতির কল কৌশলের প্রসংসা করি তোমরা কি বিশ্বাস করিবে যে আমাদের অর্থাৎ হিন্দুজাতিও বহুশত বৎসর পূর্বে এইরূপ জাহাজ নির্মাণ করিতে পারিতেন। আর সে দিন নাই——এখন এমন হইয়াছে যে আমরা দেশদেশান্তরে যাইতে বিদেশীদের জাহাজ চড়ি। আমাদের দেশে যে সকল জিনিস উৎপন্ন হয় তাহা বিক্রয় করিবার জন্য বিদেশী জাহাজের আশ্রয় লই—আর এমন একদিন ছিল যখন আমাদের দেশের লোক জাহাজ——।'

এর পরেই রচনাটি অন্য ধরনের। পেন্সিলে লেখা এই রচনাটির নামকরণ করা হয়েছে—'বিজ্ঞানের প্রকৃত লক্ষ্য।' রচনাটি ১৯৩৫ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের প্রতিনিধিদের উদ্দেশে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতার খসড়া। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন শুরু হয় ১৯২৩ সালে। এই সম্মেলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অতুল প্রসাদ সেন। গোরক্ষপুরে সম্মেলনের একাদশ অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে অতুলপ্রসাদ বলেছিলেন, 'প্রবাসী! চলরে দেশে চল।' সম্মেলনের কিছুদিন পরেই অতুলপ্রসাদ পরলোক গমন করেন। অনুমান করা যায়, তাঁর বক্তৃতার মূল সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরের বছর ডাঃ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কলকাতায় দ্বাদশ সম্মেলনের আয়োজন করেন। সারা ভারত থেকে দু'শর বেশী প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগ দেন। এই উপলক্ষ্যে যে অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয় তার মধ্যে ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু, লেডি অবলা বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, নলিনীরঞ্জন সরকার, যামিনী রায়, সত্যচরণ লাহা, নির্মলা সরকার (স্যার নীলরতনের পত্নী), সরলা বসু ও আনন্দ বাজার সম্প্রদায়।

এই সম্মেলন উপলক্ষে রচিত বক্তৃতায় জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানের অপব্যবহার সম্বন্ধে এক বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। সম্ভবতঃ হিটলারের ক্ষমতায় আসার পর জার্মানী ও ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে নতুন সমরাস্ত্র উদ্ভাবনের জন্য গবেষণায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগকে স্মরণ করেই তিনি বিজ্ঞানীদের সাবধান করে দিয়েছিলেন। তার বক্তৃতার বয়ান ছিল এইরূপ ঃ

'প্রবাসী বাঙ্গালী সম্মেলনে যাঁহারা প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছেন তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি।

'প্রবাসী বাঙ্গালীদের সহিত নানা সময়ে আমার সাক্ষাৎ করিবার সুবিধা হইয়াছিল। সে ৪০ বৎসরেরও আগেকার কথা। তখন ভারতবর্ষকে প্রকৃতরূপে জানিবার জন্য বিভিন্ন প্রদেশে এবং ভারতের বাহিরেও ভ্রমণ করিয়াছি। দেখিয়াছি সর্বস্থানেই বাঙ্গালী তাহার মানসিক প্রতিভাবলে বিবিধ প্রদেশের মঙ্গল এবং ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য নিজেকে নিয়োজিত করিতে সমর্থ হইয়াছে।

'এ কথা কাহারও অবিদিত নাই যে এক সময় বিজ্ঞানক্ষেত্রে একান্ত পারগ বলিয়া ভারতের অপযশ দেশ বিদেশে ঘোষিত হইত। সেই দুঃসময় বিজ্ঞানের নূতন তত্ত্ব আবিস্কার এবং তাহার প্রচার দ্বারা ভারত যে জগতে উচ্চ স্থান অধিকার করিবে এই আশা বাঙ্গলাদেশ পোষণ করিয়াছিল।

বাঙ্গালী সাধক বিজ্ঞানের বিবিধ শাখায় আপাতত বৈষম্য দেখিয়াও নিরুৎসাহ হয় নাই। পরন্তু ইহার মধ্যেও মূলগত একত্বের আবিষ্কার করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল এবং সেইজন্য অসীম ধৈর্য সম্বল করিয়া অব্যক্ত জগতের সীমাহীন রহস্য সূক্ষ্ম পরীক্ষা প্রণালী দ্বারা প্রতিষ্ঠা করিতে সাহসী হইয়াছিল।

সমস্ত জগতই যে একতা সূত্রে গ্রথিত এই সত্য জীবন্তভাবে উপলব্ধি করিয়াছিল এবং নানা পথ অবলম্বন করিয়া প্রাণিজগৎ, উদ্ভিদ জগৎ এবং জড়জগৎ যে একই নিয়মে পরিচালিত, ইহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

বিভিন্ন প্রদেশবাসী সধকগণও আজ ৩০ বৎসর যাবৎ তাঁহাদের অত্যাশ্চর্য গবেষনার দ্বারা ভারতের নাম মহীয়ান করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে বাঙ্গলার এবং বাঙ্গলার বাহিরে বাঙ্গালীর প্রচেষ্টা অক্ষুন্ন রহিয়াছে। মাদ্রাজ হইতে ডাক্তার বিমান বিহারী বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার বিবিধ গবেষণার ফলে বাঙ্গালার ও ভারতের গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

'এখন দেখা যাউক বিজ্ঞানের প্রকৃত লক্ষ্য কি। পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান দ্বারা মানুষের শক্তি নানা দিকে বহুলরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। মানবের দুঃখ লাঘব করাই বিজ্ঞানের এক প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু একথা ভুলিয়া কেহ কেহ ইহার অপব্যবহার করিতেছে। ইহারা বিশ্বদ্রোহী। এইসব দুর্মতিগণ বিশ্বে কল্যানের পথ অবরোধ করিয়া নিজের স্বার্থের জন্য জগতের অকল্যাণ করিতেছে।

'অকল্যাণ মোচন করিয়া কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করাই ভারতের চিরকালের আদর্শ। বিশ্বমৈত্রীর বাণী এদেশে চিরকাল প্রচারিত হইয়াছে! সেই হেতু এদেশে নিঃস্বার্থ জ্ঞান আহরণে জীবন উৎসর্গিত হইয়াছে। তাহার আহরণে মানবের কল্যাণহেতু রাজ সম্পদ ত্যাগ করিয়া কেহ কেহ দুঃখ দারিদ্র বরণ করিয়াছে এবং দেশ সেবায় অকাতরে জীবন বিসর্জন করিয়াছে। সেই সব জীবনের বিক্ষিপ্ত শক্তি অন্য জীবন জ্ঞান ও ধর্মে। শৌর্য্য ও বীর্যে পরিপূরিত করিয়াছে। সেই শক্তিতেই মানব দানবত্ব পরিহার করিয়া দেবত্বে উন্নীত হইবে।

'আমাদের সর্বাপেক্ষা আশার কথা এই যে প্রবাসে থাকিয়াও বাঙ্গালী বাঙ্গলার সহিত তাহার হৃদয়ের যোগ জীবন্তরূপে অনুভব করিতেছে। যাহারা বিচ্ছিন্ন তাহাদিগকেই মৃত্যু সর্বদা অনুসরণ করে। কিন্তু যাহারা সুখে সুখে একই হৃদয় স্পন্দন দ্বারা অনুপ্রাণিত, তাহারাই মৃত্যুর বিভীষিকা অতিক্রম করিবে এবং তাহাদের প্রচেষ্টা চিরঞ্জীবী হইবে।' (অসম্পূর্ণ)



J. C. Bose

জীবনপঞ্জী ১৮৫৮-১৯৩৭

১৮৫৮	৩০শে নভেম্বর বাংলা দেশের ময়মনসিংহে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা ভগবান চন্দ্র বসু মাতা বামা সুন্দরী বসু।
১৮৭০	কলকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি হন। পরবর্তী কালো বাংলা দেশের ফরিদপুরে ভর্তি হন।
১৮৭৫	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বৃত্তিসহ প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এবং সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন।
১৮৮০	১৮৭৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আই. এ, ১৮৮০ সালে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করেন।
১৮৮৪	লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এস. সি. এবং কেম্ব্রিজ থেকে স্নাতক (ট্রাইপস)হন।
১৮৮৫	কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন।
১৮৮৭	দুর্গামোহন দাসের কন্যা অবলা দাসকে বিবাহ করেন।
১৮৯৪-৯৫	কলকাতা টাউন হলে জনসাধারণের সামনে প্রথম ভাষণ দেন, এবং বিনা তারে দূরে বার্তা পাঠানো পরীক্ষা করে দেখান।
১৮৯৬-৯৭	লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত হন। সর্ব প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ইয়োরোপ যান। প্রথমে লিভারপুলে বিটিশ অ্যাসোসিয়ান-এ এবং পরে লণ্ডনের রয়্যাল ইনস্টিটিশনে ভাষণ দেন।
১৯০০-১৯০১	দ্বিতীয়বার ইয়োরোপ গমন করেন। প্যারিস, লণ্ডন ও ইয়োরোপের বিভিন্ন বিজ্ঞান সভায় গবেষণাপত্র পাঠ করেন ও ভাষণ দেন।
১৯০২-১৯০৬	তাঁর প্রথম গ্রন্থ Response in the living and now living

প্রকাশিত হয়। ১৯০৩ সালে তিনি C. I. E. উপাধিতে ভূষিত হন।

১৯০৮-০৯ : তিনি তৃতীয়বার আমেরিকা ও ইয়োরোপ সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হন, এবং বিভিন্ন সভা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভাষণ দেন।

১৯১৪-১৫ : চতুর্থবারের ইয়োরোপ ও আমেরিকা সফরে তিনি কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দেন। এই সফরে তিনি অস্ট্রিয়া, জার্মানী ও জাপান ভ্রমণ করেন ও বিভিন্ন বিজ্ঞান সভায় ভাষণ দেন। ১৯১৫ সালে ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিস থেকে অবসর গ্রহণ করে প্রেসিডেন্সী কলেজে 'এমেরিটাস অধ্যাপক' পদে নিযুক্ত হন।

১৯১৭ : তাঁর ঊনষাটতম জন্মদিবসে ১৯১৭ সালের ৩০ নভেম্বর 'বসুবিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯১৯-১৯২৪ : পঞ্চম ও ষষ্ঠবার ইয়োরোপ সফরে যান। কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড, লীডস, প্রাগ, কোপেন হেগেন প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত বিজ্ঞান সভায় ভাষণ দেন।

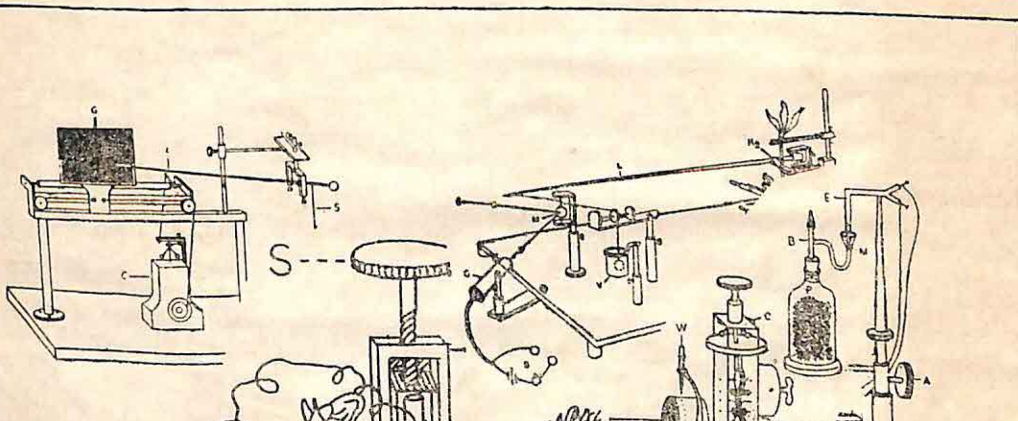
১৯২৬-১৯২৯ : ৭ম, ৮ম, ৯ম বার ইয়োরোপ যান। ১০ম ও শেষবার যান ১৯২৯-এ। বিশ্বের বিভিন্ন বিজ্ঞান-সভায় বিশিষ্ট বিজ্ঞানী সমাবেশে ভাষণ দেন।

১৯৩১ : শ্রীসয়াজীরাও গায়কোয়াড় পুরস্কার অর্পণ করা হয়। মেয়র সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে নাগরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

১৯৩৩-৩৫ : বরোদা ভ্রমণ কালে তাঁর গবেষণা ও আবিষ্কার সম্বন্ধে শ্রেণীবদ্ধ ভাষণ দান করেন। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহাকে ডি. এস-সি উপাধিতে সম্মানিত করা হয়। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁহাকে ডি. এস-সি উপাধিতে সম্মানিত করে।

১৯৩৭ : ২৩ নভেম্বর গিরিডিতে পরলোক গমন করেন।

শ্রীজগদীশ চন্দ্র বসু



বসু বিজ্ঞানমন্দিরের অছিদের পক্ষে দিবাকর সেন জগদীশচন্দ্র বসুর কিশোর রচনাসমগ্র প্রকাশ করে ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। বিষয় অনুসারে বইটি নানা ভাগে ভাগ করা। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, গল্প, প্রবন্ধাবলী ও একটি পরিশিষ্ট। 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে' প্রবন্ধটির কথা অনেকের মনে পড়বে। জগদীশচন্দ্রের সবরকম লেখার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ এই গ্রন্থটিতে পাওয়া যাবে। ভূমিকা-লেখকের সঙ্গে সবাই একমত হবেন— 'আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বাংলা সাহিত্যে একটি স্থায়ী আসন দখল করে নিয়েছেন।'

আনন্দবাজার পত্রিকা
১ অক্টোবর ১৯৮৪

The Recent Publication of Jagadish Chandra Basu's KISHORE RACHANA SAMAGRA marks a major attempt to dispel ignorance about this branch of Bengali literature. Compiled by Dibakar Sen, the anthology draws on Abyakta (1921) and Prabandhabali (1933 written in collaboration with Abala Basu), besides making available many articles and lectures never before collected in a book. Readers in their forties and above will immediately recognize 'Bhagirathir Utsa Sandhane' as one of the set pieces in the School Final Selection. But they will be surprised to learn that Jagadish Chandra also wrote Science fiction like 'Palatak Tufan'. The book with an appendix including excerpts from Jagadish Chandra's letter to Rabindranath whets our appetite for complete works.

The Statesman
April 30, 1984